বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের গল্প

সম্পাদনা

পূরবী বসু

শফি আহমেদ

অনুষ্টুপ

২-ই নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

BANGLADESHER NARI
AANDOLONER GALPA

Purabi Basu & S[illegible] Ahmed

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

মূল্য . পঞ্চাশ টাকা

ISBN. 81-85479-54-2

প্রকাশক : অনিল আচার্য
২/ই নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
শ্যামল সাউ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

জাহানারা ইমাম

অসামান্যা নারী

ভূমিকা

বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের চিত্রটা নিয়ে হয়ত অহংকার করার তেমন কিছু নেই, তবে সলজ্জ হবার কারণ আছে বলেও মনে হয় না। এদেশের নারী-জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া জন্মেছিলেন বিগত শতকের শেষ দিকে, আর আজকের দিনে যেসব নারী লিখছেন তাঁদের ভাবনায়, চেতনায় দিগন্তে একবিংশ শতাব্দী। এই সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশের নারীরা কতটা এগিয়েছেন, অগ্রযাত্রার তীব্র আকাঙ্ক্ষা কিভাবে অবদমিত হয়েছে, সমাজের কোন কোন উপাদানের সুপ্রাচীন অস্তিত্বের ফলে নারীদের আগামী দিন কি কোন শুভ ইঙ্গিত বহন করছে—এসব প্রশ্নের আলোচনার অবকাশ নেই এখানে। কিন্তু সময়ের হিসেবে বেগম রোকেয়া (জন্ম ১৮৮০) থেকে শাহনাজ মুন্নী (জন্ম ১৯৬০) পর্যন্ত বলতে গেলে বিগত প্রায় এক শতকের নারী আন্দোলন ও নারীদের ভাবনার এক সাহিত্যবাচ্য পরিচয় পাওয়া যাবে এই সংকলনের দুই প্রচ্ছদের মধ্যে। আমরা নারীদের লেখা গল্পের একটি সংকলন প্রস্তুত করাব সময় শুধু এই ভাবনাকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করেছি, যাতে নারীরা যে তাদের সমস্যা নিয়ে উৎকণ্ঠিত ও প্রতিবাদী,-তার একটা চিত্র তৈরী হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য বেড়ার মধ্যে বন্দী নারীসমাজ তার মগজটাকেও পুরুষের উপনিবেশ হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সেই অবস্থান থেকে নারী যে সমাজটা দেখতে পায়, তার বিবিধ বিষয় সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে উদ্বুদ্ধ বোধ করে, কেউ কেউ উচ্চকণ্ঠ হয়, অন্যেরা প্রকাশ করে অপেক্ষাকৃত শান্ত ভঙ্গিতে,-এ থেকেই বোঝা যায় নারীরা তাদের—'অবলা' ভূষণটিকে সঘৃণায় প্রত্যাখান করেছে।

বাংলাদেশের বা বিভাগ—পূর্ব পূর্ব বঙ্গীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নারী আন্দোলনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বাধীনতার পূর্বেই গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কার্যক্রম কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের

অন্যান্য জায়গায় অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে, কিন্তু পূর্ব বঙ্গে তেমনটি হয়নি। তেভাগা আন্দোলনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়টিতে একটি ভিন্ন ও তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা সংযোজন করলেও এই ধারা দৃষ্টিগ্রাহ্য-ভাবে অব্যাহত থাকেনি। আবার ৪৭—উত্তর পশ্চিমবঙ্গে নারীরা বিবিধ গণ-আন্দোলনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত ছিলেন এবং অদ্যাবধি আছেন যে নারী আন্দোলনের সংস্থা বৃহত্তর সামাজিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিভাজ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনে বিভিন্ন শহরে ও গ্রাম-গ্রামান্তরে যারা শহীদ হন তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে পঁচিশ জন ছিলেন নারী। নারী আন্দোলনের এমন চরিত্র পরবর্তীকালে আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির যোগাগোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী সংস্থায় নারীর অবস্থা, জীবিকা ও স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে বিশ্বশান্তির বিষয়ও জড়িত হয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা সংগঠন এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েও স্বাধীনতা—উত্তর পশ্চিম-বঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিষয়েই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কাছে এই সমিতি যে স্মারকলিপি পেশ করে তাতে যে সাতটি দাবি আছে তার মধ্যে রেশনিং প্রথা, ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ থেকে হরিণঘাটা দুগ্ধ সরবরাহের কথা আছে। কিন্তু বিশেষভাবে নারীদের কোন দাবির উল্লেখ নেই। [তথ্যসূত্র : নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, কনক মুখোপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃঃ ১৭৫] গণতান্ত্রিক পরিবেশের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতেই আন্দোলন এমন চরিত্র পরিগ্রহণ করে। বাংলাদেশের নারীসমাজ গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে ও সামাজিক পশ্চাদপদতার কারণে, নেতৃত্বের সংকটে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে এমন শক্তি ও চরিত্র অর্জন করতে পারেনি।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের বিষয়টির সূত্রপাত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণকে সনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা বিশেষভাবে জরুরি। বাংলাদেশের সমাজ প্রধানত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের। ইসলাম ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষণশীলতা সুবিদিত, আবার পাকিস্তানী শাসনব্যবস্থায় 'ইসলামিক সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য নির্মাণের যে মিশনারী উৎসাহ গর্বে দর্পে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল তা সমাজ প্রগতির ধারাকে বিশেষভাবে ব্যাহত করেছিল, নারীর অবস্থানকে অধিকতর

খর্ব ও গৌণ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় প্রবাসী ছিল ওই শাসনব্যবস্থা। এই সমাজের মধ্যে বসবাস করেই লিখেছেন আমাদের নারীরা। ইতিবাচক দিক ছিল শুধু এইটুকুই যে, পাকিস্তানী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজ ছিল সরব, ধর্মপ্রাবল্যগন্ধী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকৃতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সমাজে সেই পাকিস্তানের আদি থেকেই প্রতিবাদ প্রতিরোধও ছিল প্রবল। এ দেশের ভাষা আন্দোলন তার সগৌরব সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৪৮-এ প্রতিবাদের সূত্রপাত এবং ১৯৫২-এ তার রক্তাক্ত ও ইতিবাচক সাফল্য। এই আন্দোলনে যারা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মহিলাও ছিলেন। নারীরা সমাজের প্রবণতা থেকে উৎসাহিত বোধ করেছেন, নারী আন্দোলনের নেত্রী কর্মীরা সক্রিয়ভাবে এইসব জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই মূল জাতীয় আন্দোলনের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে নারী আন্দোলনের মধ্যেও, সে যত প্রান্তিকভাবেই হোক। এই সব আন্দোলনের সকল ইতিবাচক, সংগ্রামী ও সফল কর্মসূচির প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েও বলা যায়, সমাজের যে মৌলিক জগদ্দলী অবস্থান নারীকে সর্বদাই নেপথ্যে রাখতে চায়, সে বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ের [পুরুষ] আন্দোলনকারীরা উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না, এ বিষয়ে তাদের বোধ ও ভাবনাও স্বচ্ছ ছিল না, অদ্যাবধি নেই। আমাদের দেশের যে দু'জন অবিসংবাদিত নেত্রী দেশ-সমাজ পরিচালনার উচ্চাসনে, তাঁদের এই আসন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল দু'জন পুরুষ-নেতার জীবনাবসানে। প্রত্যক্ষতা থেকে বিশ্বাসের উৎপত্তির তত্ত্ব এখানে ভ্রান্ত।

মুসলিম-প্রধান সমাজ নারীর অবস্থান নির্বিকল্পভাবে নির্দিষ্ট করে দেয় অন্দরমহলে। কিন্তু গরুর গাড়িকেও নিয়মে চলনশীল থাকতে হয়, তার ধীর-গতিতে সে হয়ত এক দশক পেরিয়ে মিলিত হয় কোন চৌরাস্তায়, মুখোমুখি হয় অজানা অদেখা গতির, তেমনি এই রক্ষণশীল সমাজকে বাস্তবতার নিয়মে ভঙ্গুর হতেই হয়েছে, মেয়েদের স্কুল যাত্রা, কলেজ যাত্রা, বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা, অবশেষে বিদেশ যাত্রা, অফিস যাত্রা মানতেই হয়েছে সমাজকে। এই ঘটনার সামাজিক প্রতিফলন যে কত বহুরূপী ও বহুমুখী তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। অন্দর মহলের নারীরাও লিখতেন, তার কত যে হারিয়ে গেছে পুরুষতন্ত্রের নির্বিচার দাপটে, আবার কত যে প্রকাশের আত্যন্তিক লজ্জায়, তার হিসেব নেই। সেই প্রারম্ভিক বিন্দুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আজ যখন বাংলাদেশের নারীদের রচনার পরিমাণগত, গুণগত ও বৈচিত্র্যগত চিত্রের দিকে তাকাই, তখন

আত্মসন্তুষ্টির পর্যায়ের না হোক, উপহার্য পসরা সাজানোর মত সম্পদ আমাদের হাতের কাছে মেলে।

আমরা নারীদের রচনা থেকে তেমন একটা গল্প-সংকলন করতে প্রয়াসী হয়েছি। প্রীতিলতা ওয়ার্দেদারের এক উত্তরসূরি ছবি-ছবিরুন অস্ত্র চায় তার সম্ভ্রম হননকারী পাকিস্তানী সৈন্যদের খুন করার জন্য ; প্রতিবাদী সালেহা পরম দৃঢ়তায় ও সাহসে মুখোমুখি দাঁড়ায় মৌলবাদপ্রবণ সমাজের সালিশীচক্রের সামনে। এই চিত্র বাংলাদেশের মুসলমান-প্রধান সমাজের। আমরা বিবেচনায় আনার চেষ্টা করেছি সেই গল্পগুচ্ছকে, যেগুলিতে নারীর পৃথক দৃষ্টিকোণ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা যে সকল ক্ষেত্রে তাতে সফল হয়েছি এমন নয়, এমন রচনার সংখ্যাবাহুল্যের ব্যাপার আছে, আবার আমাদের দৃষ্টিতে আসেনি —এমন সীমাবদ্ধতার ব্যাপারও আছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারীপক্ষসহ বিভিন্ন মহিলা সংগঠন বিরতিহীনভাবে পুরুষতন্ত্রের শিকল ছেঁড়ার ও সমাজে সম-অধিকারের যে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন, ধর্ম ও রাজনীতির অপবিত্র সন্ধির বিরোধিতা করে আসছেন, তার একটা সম্যক চিত্র এই সংকলনে পাওয়া যাবে না। সাহিত্য-কর্ম সবদাই রাজনীতির গতির ছন্দটার সাথে তাল মিলিয়ে চলে না। তাই আমাদের নির্বাচিত গল্পসমূহ রীতিনিষ্ঠভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে নারীবাদী নয় হয়ত, কিন্তু নারীর নিজের অবস্থান বিষয়ে তার মনোযোগ, পুরুষের অযৌক্তিক ও নির্মম কর্তৃত্ব, নারীর রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গি ও তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে আবিষ্কার করা যাবে এই সংকলনে,—এই আমাদের বিশ্বাস।

আমরা একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে চিহ্নিত করার জন্যই বেগম রোকেয়ার রচনাকে এই গ্রন্থে স্থান দিয়েছি সর্বাগ্রে। তার জীবিতকালে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সীমার কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সমকালের প্রতিতুলনায় তাঁর কণ্ঠস্বর এত প্রতিবাদী ছিল, যা আজও সকলকে বিস্মিত ও উদ্বুদ্ধ করে। উপরন্তু তিনি রক্ষণশীল একটি মুসলিম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থেকেও যেসব বিষয়ে এবং যে ধরনের ক্ষুরধার ভাষায় লিখেছেন তা অদ্যাবধি বাংলাদেশের নারী-সমাজকে সাহস ও শক্তি যোগায়। বেগম রোকেয়ার নাম উচ্চারিত হয় না, নারী আন্দোলনের এমন কোন সভা-সমিতি-সমাবেশ এদেশে নিতান্ত দুর্লভ। বেগম রোকেয়ার 'বলিগর্ত' কাহিনীতে খানবাহাদুর খটখটের তিন বউ, চতুর্থ বউ-এর জন্য সংরক্ষিত কামরা, সারা

মোটরগাড়ির গায়ে চাদর মুড়ে নারীদের শহর দর্শন এবং সম্ভাব্য পুরুষ দর্শনের প্রায়শ্চিত্ত রূপে তওবা পাঠ, খানবাহাদুরের হিন্দুয়ানীতে ঘোর আপত্তি, আবার বিধবা ভগিনীর বিয়ের প্রস্তাবে অসম্মতি, কারণ, "আমরা যখন হিন্দুর দেশে আছি, তখন তাহাদের আচার নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য", —ইত্যাদির উল্লেখ সমাজের নারীর অবস্থানকে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে।

বেগম সুফিয়া কামাল। বর্তমান বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সর্বাগ্রগণ্য বক্তি। কবি হিসেবেই তাঁর খ্যাতি সমধিক। কিন্তু তিনিও অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের সমাজ-ভাবনাই তাঁর চিত্তপ্রবৃত্তি ও বোধকে গড়ে তুলেছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি সর্বদাই আপোষবিহীন, কিন্তু যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মানসগঠন, তার প্রভাবে তাঁর রচনায় এক ধরনের রোমান্টিক পেলবতা ও কাব্যগন্ধ রয়ে গেছে, যা একটি বিশেষ সময়ের সাহিত্যচর্চার স্বাক্ষর বহন করে। যখন তিনি লেখেন,—"পুরুষের এই পরাজয়ে নারীর তৃপ্তি, সারা নারী জাতির গর্ব ভেবে আর পুরুষ শুধু যাকে পাওয়া না গেল, তাকে চাওযার স্বপ্নসুখে বিভোর। নর ও নারীর এ এক চিরন্তন খেলা··· এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই", ...তখন তিনি নারীর এক রোমান্টিক চিত্রই আঁকেন, তবে তাঁর দেখার মধ্যে নারীর দৃষ্টির বিশিষ্টতাও প্রকাশ পায়। আমাদের সংকলনে লেখকদের চিন্তাচেতনা ও রচনা শৈলীর যে বিভিন্নতা ও উত্তরণ লক্ষ্য করা যাবে তার সূচনাবিন্দুতে বেগম সুফিয়া কামালের অবস্থান এবং অদ্যাবধি তাঁর বিরতিহীন উপস্থিতি সাহিত্যে নারী আন্দোলনের বিষযটিকে সমুজ্জল করে রেখেছে।

সাহিত্যে ও কর্মোদ্যোগে নীলিমা ইব্রাহিম সুফিযা কমালের অনুসারী। গল্পকার হিসেবে তিনি খ্যাতনাম্নী নন, কিন্তু এদেশের নারী আন্দোলন তথা সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তার ভূমিকার কথা আবশ্যিকভাবেই স্মরণযোগ্য। এ কারণেই এই গ্রন্থে তাঁর অন্তর্ভূক্তি অপরিহার্য। তাঁর গল্পের নারী ঢাকায থেকেও ২০ বছরের বিবাহিত জীবনে রমনা পার্কে যান নি, নারীর অন্দর মহলে অবস্থানের অনিবার্যতা কি এতটাই সমাজস্বীকৃত। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে লেখা দিলারা হাশেমের 'দিন-ক্ষণ-মন' রোমান্টিকতায় এবং অপলক-উৎকর্ণ সমাজের কেন্দ্রে নারীর আপোষকামিতার যুগপৎ প্রকাশ। এক সংবেদনশীল, দ্রোহীস্বভাব পুরুষ সংসার-পিঞ্জরাবদ্ধ নারীকে হাতছানিতে নয়,

হাত ধরে আহ্বান করেছিল। কিন্তু নারী যে চৌকাঠ ডিঙাতে পারে নি সে তো পুরুষশাসিত সমাজে নানা করণীয় অনুশীলনের দীর্ঘ চর্চার জন্যই। আবার, রাজিয়া খানের 'জয়-জয়ন্তী'তে হেরে গেছে আমান। তীব্র রোমান্টিকতা ও অতি-চেনা বাঙালি উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের বৃন্তে গড়ে ওঠা এই গল্পের নারী নীলা তার সংসার ও স্বামী ছেড়ে চলে গিয়েছিল ; পুরুষসুলভ কোন অত্যাচার বা সাংসারিক পীড়নে নয়, নিজের শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। আমানও যে আজো তার প্রতি প্রবল আসক্তি অনুভব করে, সে-ও শুধু নারীর প্রতি পুরুষের টানে নয়, ধ্রুপদী সঙ্গীতের অনবদ্য আকর্ষণে। কিন্তু নীলা যে সমাজ অনুশাসন সবিনয়ে মান্য করে নি, তা-ই নারীর প্রতিবাদের দ্যোতক। 'সরোজিনীর ছবি'র মত গল্পে নারীর একেবারে সুনির্দিষ্ট সমস্যা বা অবস্থানের প্রসঙ্গ হয়ত তেমন অর্থবহ নয়। সমাজের কঠিন বৈষম্যের দিকটিও হয়ত প্রধান হয়ে ওঠে না। কিন্তু এই গল্পের নারী জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতাকে বিনা ক্ষোভে গ্রহণ করেছে, একাকী প্রায়-বিষণ্ণ এক জীবনকে মেনে নিয়ে সে কর্মনিষ্ঠার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছে। আমাদের সমজের এমন বিচ্ছিন্ন ও নিয়তিনির্ভর নারীকূলের এক দৃষ্টান্তমূলক প্রতিনিধি — সরোজিনী।

লায়লা সামাদ আমাদের গল্পসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি বাংলা গল্পের তৎকালীন বিবর্তনের ধারাতেই রচনা করেছেন 'অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা'। কিন্তু বোঝা যায়, এই গল্পের লেখক আরও বেশি তাঁর সত্তামনস্ক। এক নারীই তাঁর সন্তানকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আর এক তরুণীর কাছ থেকে। কিন্তু এই গল্পের প্রধান নারীর মধ্যে যে বঞ্চনার লক্ষণ ফুটে উঠেছে তা এদেশের সমাজের সনাতন বোধ ও সংস্কারের অন্তর্নিহিত প্রতিবাদের কোন সাহস বা সমাজভিত্তি তার ছিল না, নিজেকে আড়ালে সরিয়ে নেবার অনুশীলনই সে শিখেছে সমাজ থেকে। আবার রাজিয়া মাহবুবের 'নিরুত্তর'-এর খুশীরও লায়লা সামাদের সৃষ্ট নারীর মত অমূর্ত বাসনা আছে, কিন্তু ঠিক অনুরূপ নয়। এখানে তার অবস্থান আরও করুণ। বাড়ির কাজের মেয়ে। কিন্তু যৌবন ও বয়স তার মধ্যেও তো সাধারণ নারীসুলভ কামনা-বাসনার জন্ম দেয়। কৌতূহল নিবৃত্তির অতি স্বাভাবিক পথে পা বাড়ায় সে। শুধু এই অপরাধে তাকে অপমানিত ও দোষী সাব্যস্ত হতে হয়, কিন্তু "তার এই পঁচিশের যন্ত্রণাময় বয়সটার কথা কেউ ভাবে না"।

আবার, এক যুবতীর জীবনের অন্যবিধ যন্ত্রণা, ধর্ষিতা হবার মর্মান্তিক যন্ত্রণা

যে ক্রোধের জন্ম দেয়, তার এক রক্তাক্ত আভাস পাই জাহানারা ইমামের গল্পে। সম্প্রতিপ্রয়াত জাহানারা ইমাম এক অসামান্য নারী। পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি নিজেই সন্তানকে পরিয়ে দিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধার পরিধেয়। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক বজ্রকণ্ঠ সংগ্রামী। তাঁর বোধ ও বিশ্বাসের এক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে তাঁর গল্পে। তাঁর নারী সম্ভ্রম-হানির যন্ত্রণায় মাথা কোটে না, সে পাকিস্তানী নরপশুদের হত্যা করার জন্য অস্ত্র চায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেক নারীও যে সশস্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এই গল্প।

রাবেয়া খাতুনের 'নাগমোতির হাটে' গল্পে বিধৃত যে সমাজচিত্র ও নারীর অবস্থান তা তর্কাতীতভাবেই পুরুষশাসিত। এই গল্প পড়লে বোঝা যায়,—আমাদের সমাজে নারীর উপর পুরুষের পীড়ন, নারীর অসহায়ত্ব, নারীর দুর্বল অবস্থানের পেছনে দারিদ্রের ভূমিকা,—ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ভাবিত। পিতাও যে তার নিজের ভূমিকা বিস্মৃত হয়ে শুধুই পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে রাবেয়া খাতুন অনায়াসস্বাচ্ছন্দ্যে তা প্রকাশ করেছেন। পুরুষের এই শাসন নির্যাতন-অবিচারের বিরুদ্ধেই বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলন। মকবুলা মনজুরের 'আত্মশক্তি', সেলিনা হোসেনের 'মতিজানের মেয়েরা' নয়ন রহমানের 'বীরপুরুষ', ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থের 'খুশবুদার ভাত ও সোনালী গম', রিজিয়া রহমানের 'হাবিল-কাবিলের জমানা'—এই সব গল্প এই কঠিন সত্যটাকেই প্রকাশ করতে চায়। নারীকে বিয়ে করার পর পরই স্বামী এক নির্বিবোধ দখলীস্বত্ব ভোগ করতে চায়। অত্যাচার, মারধোর, যখন-তখন স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া, স্বেচ্ছাচার ইত্যাদি স্বামীকূলের অবিভাজ্য বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হয়। আনোয়ারা সৈয়দ হকের 'পারুলীর উড্ডয়ন' গল্পে আসন্নপ্রসবা পারুলীকে উদ্দেশ করে আর এক নারী পঞ্চি দাই বলেছিল, "মেয়েরা এরকম দু'চারটে (স্বামীর) লাথি গর্ভবতী অবস্থায় খেয়েই থাকে, ক'জনের বাচ্চা মারা যায়? মেয়েমানসির জান, বিলাই-এর জান রে লাতিন।" কিন্তু পারুলীর পুত্রসন্তান প্রসব হয়। মৃত সন্তান। পঞ্চি দাই-এর বিশ্বাস কন্যাসন্তান হলে গর্ভে পিতার লাথি খেয়েও বাঁচত সে। এমনই পরিস্থিতি পুরুষশাসিত সমাজের। 'আত্মশক্তি'র নারী স্বামীগৃহের অত্যাচারে বাপের বাড়ি চলে এসেছিল। দুশ্চরিত্র স্বামীর উৎপাত তাতেও কমেনি, সে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যায় শ্যালিকাকে, তাকে বিক্রি করে দেয়। সবুরন কোঁচের তীব্র আঘাতে স্বামীকে হত্যা করে। প্রতিবাদের চরম ভাষা।

প্রতিবাদের ভাষা অমন রক্তাক্ত ও অন্তিম না হলেও মতিজান শিখে যায় উপেক্ষার ভাষা, প্রত্যাখ্যানের তীব্র ভাষা। 'বীরপুরুষ' গল্পের তরুণী রাণু স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করে, "সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে উত্তর দ্যায়—বীরপুরুষ আইছে মা, বীরপুরুষ"। জুবাইদা গুলশান আরার 'একটি ইঁদুর ও কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা' গল্পে তরুণী শরবতী শুধু পুরুষ নয়, সামগ্রিক সমাজ-পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, খুন করে অত্যাচারীকে।

যৌতুক এক অভিশপ্ত সামাজিক প্রথা। আজও প্রায় প্রতিদিন বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও নিহত হচ্ছে কোন গৃহবধু শুধু যৌতুকের জন্যই। নির্যাতিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য নারী। মতিজানকে প্রতি দিন নিন্দা আর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে এজন্যে। রিজিয়া রহমানের গল্পের দুশ্চরিত্র পুরুষ পাশবিক লালসায় বিয়ে করে এক তরুণীকে, নির্বিবেক সে হত্যাও করে তাকে; কিন্তু আতরীর মা যে হতদরিদ্র, তার মেয়ের জন্য অন্য পাত্র যোগাড় করতে পারত না, তার কারণ যৌতুক প্রদানের সামর্থ্য তার নেই। 'আত্মশক্তি'র সবুরন। যৌতুক দিতে না পারার ফলে তার ওপর চলত অত্যাচার, স্বামী ও শ্বশুরের, উভয়ের। বাধ্য হয়েই সে পিত্রালয়ে ফিরে এসেছিল। বিয়ের আট দিন পরেই মতিজানের শাশুড়ি বউকে তাগাদা দেয় তার ছেলের যৌতুক এখনো কেন এসে পৌঁছাল না। আবার কিছু দিন পরে শাশুড়ি বলে, "তুমহার বাপ একটা মিথ্যুক, প্রতারক। সাইকেল, ঘড়ি দিতে না পারবে তো কহে ক্যানহে?" যৌতুক দিতে না পারার অপরাধে মতিজানকে একদিন একেবারে অভুক্ত অবস্থায় গলায় দড়ি দিয়ে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে তার শাশুড়ি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। যৌতুক অথবা যে কোন কারণে শাশুড়ি অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে সৎ-মা-কে যে আমরা অত্যাচারীর ভূমিকায় দেখতে পাই, তা কিন্তু কোন ভাবেই নারী কর্তৃক নারী-নির্যাতন বলে চিহ্নিত করা যাবে না। কারণ শাশুড়ি শুধু পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবেই ওই কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। সৎ-মা পিতার বিশেষ দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতেই পুরুষের শক্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে; একাকী সেও প্রায়শই স্বামীর নির্যাতন ভোগ করতে অভ্যস্ত।

আমাদের সমাজে মাতা, জননী হিসেবে নারী পূজিতা, শক্তিরূপিণী হিসেবে সমাদৃতা, কিন্তু তা তো শুধু সমাজবাস্তবতাবিবর্জিত ভক্তির ব্যাপার, আনুষ্ঠানিক সংস্কারের বিষয়। নারী মাতা হয়ে সমাজে শুধু ভাবসর্বস্ব উচ্ছাসনের অধিকারী

এবং তা নারীমুক্তির আন্দোলনের এক বাস্তব ও আদর্শিক প্রতিবন্ধক হয়েই দাঁড়িয়েছে। মাতৃত্ব নারীর জীবনের এক অমোঘ সত্য। সন্তান ধারণের মত এত বড একটা ক্ষমতা এককভাবে নারীর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এই অসামান্য অদ্বিতীয় ক্ষমতা তাকে শক্তিমযী করে তোলে না সমাজের কাছে। পক্ষান্তরে তাকে পরিবাবের কাছে, নির্যাতনপ্রবণ সংসারের কাছে আরও দায়বদ্ধ, আরও বন্ধনশীল করে তুলেছে। সন্তানের মাতা হবার দায় তাকে সংসারের অত্যাচারের প্রতি নির্বিবাদী হতে প্ররোচিত করে। সবুরন, কুসুম, রাণু মাতৃত্বের নাগপাশে বন্দী। সন্তান ধারণের ক্ষমতা ও মাতৃত্ব তাদের পায়ে ও মগজে পরাভবের বেডি পরিযে দেয। আবার সন্তান ধাবণের অক্ষমতা অথবা জীবিত সন্তান প্রসবের অপারগতা, তা নারীর নিজেব শারীরিক বা মানসিক বৈকল্যপ্রসূত না হলেও, তাকে সমাজে প্রতিনিযত ধিকৃত ও অবহেলিত করে তোলে। তসলিমা নাসরিনেব গল্পের নারীকে সহ্য করতে হয পীডন, মতিজান পুত্র সন্তান প্রসব করে না বলে ধিকৃত। কিন্তু আবার 'নাগমোতির হাটে'র মা প্রবল ধিক্কারে সংসাব ত্যাগ করেছিল। চন্দ্রমুখী লম্পট স্বামীর ঔরসে জাত মৃত সন্তান প্রসব করে চলে যায অন্যত্র। কিন্তু নারী আজ তার মাতৃত্বেব এই বিশেষ ক্ষমতায পরম আস্থাশীল ও সচেতন ও স্বমহিম হযে উঠেছে। নারীর এ এক তীব্র প্রতিবাদ ও বিজয ঘোষণা। তার এই সচেতনতার সবচেযে বড প্রকাশ সন্তানের সঙ্গে মা হিসেবে তার স্বামীনিরপেক্ষ ও আত্মিক যোগসূত্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বা স্পর্ধা। অত্যাচারী স্বামীর ভূমিকা বা উপস্থিতি অস্বীকার করতে দ্বিধা করে না সে। অবদমিত, লাঞ্ছিত মতিজান যখন দুই কন্যাকে বুকে চেপে আশে-পাশেব বাডির লোকজনের সামনে শাশুডির প্রতি তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে "বংশের বাত্তি। হুঃ। আপনার ছাওযালেয আশায় থাকলে হামি এই মাইযা দুইডাও পেত্যাম না"; তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সন্তানধারণ বা মাতৃত্ববোধ সমাজ-স্বীকৃত শর্তসর্বস্ব বৈধতার ওপর নির্ভরশীল নয। 'পারুলীর উড্ডয়নে'র নারী মনে করে "স্বামী যেই হোক. বাচ্চা দরকাব পারুলীর। শরফু যদি আজ গঞ্জে গিয়ে মুখে রক্ত উঠে মরে যায, বাচ্চা কি হবে না পারুলীর? হ্যাঁ, হবে শরফু বেঁচে না থাকলেও বাচ্চা হবে। শরফুর বাচ্চা যদি পেটে না ধরতো অন্য কারো পেটে ধরতো পারুলী। ধরতোই। জননী হবার জন্য ভেতর থেকে বড় তাড়া আছে পারুলীর।" পারুলীর জননীসত্তা যে কি অদম্য, এই সত্তা যে তার একক, ওই আনন্দ ও সার্থকতা যে কেবল একজন নারীর, স্বামীর অবদান সেখানে গৌণ

বা শূন্যও হতে পারে,—এ নারীর এক অজেয় বোধকেই প্রকাশ করে।

সমাজের প্রকৃতিই এমন যে নারী রুখে দাঁড়াতে পারে না। সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক তসলিমা নাসরিনের গল্পের নারী প্রতিবাদে ঘৃণায় মুখের একদলা থুতু স্বামীর দিকে ছুঁড়তে গিয়ে ব্যর্থ হয়। অক্ষম স্বামী আর শাশুড়ির আবদারে সন্তান প্রাপ্তির জন্য স্ত্রীকে যেতে হয় পীরসাহেবের কাছে। পীরসাহেবের ঔরসেই তার সন্তান লাভের সম্ভাবনার সংকেত পাওয়া যায়। তসলিমা পুরুষশাসিত সমাজ, মানুষের যুক্তিহীন ধর্মভক্তি ও পীরসাহেবের ভণ্ডামিকে একত্রে তাঁর সমালোচনার বিষয় করে তুলেছেন। 'নারীবাদী' গল্পের চন্দ্রমুখীর জন্যও পীরসাহেব আসে, সে জানায়, নারীর দুই জাতের কথা—সুজাত ও কুজাত, সুজাত নারীর বর্ণনায় এক স্বর্গীয় উদ্ভাস আর কুজাত নারী ডাইনীর বংশধর। পীরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী পরবর্তীকালে প্রমাণিত হল চন্দ্রমুখী কুজাত। কিন্তু তাকে দাসী করে রাখার হিতোপদেশ পাওয়া গেল। আবার স্বামী তার শরীরের ওপর দখলটা ঠিকই কায়েম করতে চায়। সবশেষে চন্দ্রমুখী গৃহত্যাগ করে চলে যায় অপেরা দিদির কাছে। এও নারীর এক প্রতিবাদ। প্রতিবাদ করতে পারে সবুরন, উপেক্ষা করতে পারে রাণু, পরবর্তী প্রতিবাদে অত্যাচারীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

১৯৯২ সালের ৮ মার্চ বিশ্বনারী দিবসের ঢাকার সমাবেশে এক প্রথাবিরুদ্ধ সাহসিক শ্লোগান দেখা গিয়েছিল অসংখ্য ফেস্টুনে—'আমার শরীর আমার কাছে, অন্যের কি বলার আছে।' নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক চমকে দেয়া শ্লোগান। তীব্র আত্মবিশ্বাসে, নিজের শরীর অন্যের খেয়াল খুশির অধিকারে ছেড়ে না দিতে, তার নিজস্ব ইচ্ছার নিসংকোচ ও প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণায় নারী সে কথাই উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছে 'সালেহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা' গল্পে। পুরুষশাসিত সমাজের মাথা ঘুরে যায়। উপেক্ষার ভঙ্গিতে নিজের শরীরের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে পারে মতিজান, কিন্তু ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থের কুসুম তো তা পারে না, সে নিহত রিক্সাওয়ালার বিধবা স্ত্রী, তাকে অনিবার্য-ভাবে ধরা দিতে হয় আর এক পুরুষের কাছে, কী অকাতরে হারিয়ে যায় 'নাগমোতির হাটে'র সারা, 'আত্মশক্তি'র সখিনা।

নারীদের লেখা গল্পে একটি বিষয় পাঠকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে। গল্পের বিষয় ছাড়াও গল্পের রচনাশৈলীর ব্যাপারেও গল্পকারবৃন্দ অনেক মনোযোগী হয়ে উঠছেন। আনোয়ারা সৈয়দ হক মৃত সন্তান প্রসবিনী পারুলীর

উড্ডয়নের মাধ্যমে যে এক ধরনের যাদুবাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তা আমাদের গল্পে অত্যন্ত দুর্লভ। মৃত সন্তানকে রেখে নির্ভার নিরাবরণ পারুলী উড়ে যায় শূন্যে। মাতা বাজপাখির এক অসাধারণ প্রতীক সৃষ্টি করেছেন গল্পকার। উড়তে উড়তে সন্তানহারা মা, এই সমাজ কর্তৃক আজন্ম নির্যাতিত পারুলী দেখতে পায় সে নির্যাতনের চিহ্নসমূহ,—রহিম মোল্লার ধানক্ষেত, আরব আলীর মাইলজোড়া ভূট্টার ক্ষেত, ডিপ টিউবওয়েল ইত্যাদি পার হয়ে যাচ্ছে। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণে 'সালেহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা'য় লক্ষ্য করা যাবে এক ভিন্নমাত্রার নির্মিতি। বিশেষত তরুণতর লেখকরা। নাসরীন জাহান ও শাহনাজ মুন্নীর গল্পের মধ্যে কাহিনীর উত্তরণ ঘটেছে প্রতীকী বিন্যাসে। চন্দ্রমুখীর স্বপ্ন ও জীবনকথা এক পরাবাস্তব মাত্রা অর্জন করে এবং তাতে অন্যতর গভীর অর্থময়তা সৃষ্টি হয়। শাহনাজ মুন্নীর 'রূপমযীর ছযটি হাত' এক অনবদ্য আধুনিক রূপকথা। নারী শক্তির কেন্দ্রে দাঁড়িয়েও এই সমাজের পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা পায না। ধীরে ধীরে স্তরপরম্পরায তার অসহাযত্ব ও শক্তিহীনতা প্রকাশিত হয। আমাদের ছোটগল্পের জন্য রচনাশৈলীর এই বৈচিত্র্য ও নিরীক্ষা খুবই অর্থবহ।

আরও কিছু ভাল গল্প এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হলে আমরা অত্যন্ত খুশি হতাম। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হল না। আমাদের নির্বাচন কোনভাবেই অন্যান্য গল্পকারদের রচনার মান সম্পর্কে সংশয়ের প্রতিফলন নয়। স্থানাভাবই একমাত্র সংকট। যাঁদের গল্প নিতে পারিনি, এঁদের মধ্যে অনেকেই ভাল গল্প লিখেছেন, লিখছেন। কিন্তু সংকলনটিকে একটি সীমার মধ্যে বেঁধে রাখার বাধ্যবাধকতায আমাদের ইচ্ছাকেও সীমিত রাখতে হয়েছে। এই বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় লেখক ও পাঠককুল আমাদের বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন, এই কামনা।

দীর্ঘ সময় ধৃত হয়েছে এই সংকলনে। সম্পাদনার ক্ষেত্রে একটি অনিবার্য সমস্যা,—বানান। পুরোনো লেখকরা যে বানানে লিখেছেন, বিশেষত ই-কার ঈ-কার এর ক্ষেত্রে, তা দেখতে আজকের পাঠকের চোখ অভ্যস্ত নয। কিন্তু রচনার প্রসাদগুণ অক্ষত রাখতে এবং সেই কালের ঈষৎ ভিন্ন স্বাদ অবিকৃত রাখতে লেখকের বানানকেই রেখে দিযেছি আমরা। যে কোন সংকলনেরই সীমাবদ্ধতা থাকে, কোন্ লেখককে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হল, কোন্টি বাদ গেল, এই ভিন্নমত ও অভিযোগ থেকে কোন সংকলনই মুক্ত নয়। লেখকের নারীবাদী

প্রবণতাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য, আর একটি অবশ্যবিবেচ্য হল গ্রন্থের কলেবর। আমরা সাধ্যমত সুবিচার করাব চেষ্টা করেছি। অনুষ্টুপ প্রকাশনীর অনিল আচার্য এই গ্রন্থ প্রকাশে সম্মত হযে আমাদের কৃতজ্ঞতাবদ্ধ করেছেন।

পূরবী বসু

শফি আহমেদ

সূচীপত্র

বলিগর্ত্ত

বেগম রোকেয়া

(নির্জ্জলা সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

কলেজ বন্ধ হইয়াছে। গরমের ছুটি। বারান্দায় বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি—কমলা দিদি হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আসিলেন। কমলা দেবী কংগ্রেস সেবিকা, চরকা ও খদ্দর প্রচার তাঁহার ব্রত। তাঁহার সঙ্গে জাহেদা বিবি নাম্নী একজন মুসলিম মহিলাও আসিয়াছেন। কমলা একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়াই বলিলেন,—"সব দেশ জয় করিয়াছি, এখন চল বলিগর্ত্তে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে আবার কোথায় ?"

জাহেদা উত্তর দিলেন, "সে আমার মামার বাড়ী, মামা নেই, এখন মামাতো ভাইদের রাজত্ব।"

আমি। বেশ ত, খুব সহজেই চরকার প্রচলন করিতে পারিবেন।

কমলা। ওহো। তুমি যত সহজ মনে করিয়াছ, তাহা নয়। সে গ্রাম অত্যন্ত দুর্গম, তাহার উপর সেখানে জাহেদার প্রবেশ নিষেধ।

আমি। তার অপরাধ ?

কমলা। আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, একটু লেখাপড়া জানে, খদ্দর পরে, নিরামিষ খায়।

আমি। তা হ'লে নাই বা গেলে বলিগর্ত্তে। বিশেষতঃ যাঁর মামাতো ভাই-এর বাড়ী, তাঁরই যখন প্রবেশ নিষেধ।

কমলা। তা কি হয় ? আমি যে কমলা—সর্বত্র আমার অবারিত দ্বার। বিশেষতঃ ঐ প্রবেশ নিষেধ বলিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে। আর তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।

আমি। না ভাই ! তোমরাই যাও।

কমলা। আ রে ! তুমি না গেলে আমাদের আমোদ ভাল জমিবে না।

চরকা চালাইতে পারিলে মিসিস্ খট্‌খটেদের হাতের তৈরী সূতায় প্রস্তুত প্রথম খদ্দরখানা তোমাকে দিব। বলিগর্তের জমীদার খাঁ বাহাদুর কশাই-উদ্দীন খট্‌-খটের দেওয়ান মিস্টার জাহেরদার ফর্‌ফরে এখন কলিকাতায় আছেন। চল, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সব ঠিকঠাক করিয়া আসি। ওঠ বীণা! লক্ষ্মীটি! চল শিগ্‌গির।

অগত্যা আমি তাঁহাদের সঙ্গে মিস্টার ফর্‌ফরের বাসায় গেলাম। তাঁহার আর দুইটি ভাইও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত আদর আপ্যায়নে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আমি মনে মনে আশ্চর্য হইলাম যে, এত আদর-যত্ন পাইয়াও কেন জাহেদা বিবি বলেন যে, মামাতো ভাই-এর বাড়ীতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ। হাঁ, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এই দেওয়ান মিস্টার জাহেরদার ফর্‌ফরে জমীদারের সহোদর এবং অপর দুই ভদ্রলোক তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই। ইহারা কেহই জমীদারীর অংশ পান নাই, মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

জাহেদা বলিগর্তে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র মিঃ ফর্‌ফরে প্রাণ খুলিয়া বলিলেন,—"হাঁ বুবু! চল। তোমার মামার বাড়ী, তুমি আমাদের নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখ? তুমি যখন বলিবে, আমি স্বয়ং আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব, আমি নিজে না আসিতে পারিলে ইহাদের (ভাইদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) দুই জনের একজনকে পাঠাইয়া দিব। তুমি কখন যাইবে, বল? তুমি যে মুহূর্তে সংবাদ দিবে, তখনই ইহাদের কেহ আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে।

জাহেদা।—ভাই! আমি ত একা যাইব না; এই কমলা দিদি এবং বীণাপাণি দেবীও আমার সঙ্গে যাইবেন। আমাদের সকলের পাথেয়....

মিঃ ফর্‌ফরে।—কোন চিন্তা নাই, বুবু! তুমি দ্বিধা-সঙ্কোচ করিও না। চলুন সকলে, আমাদের মাথায় থাকিবেন। আপনাদের দেখিলে ভাইসাহেব অত্যন্ত সুখী হইবেন।

অতঃপর আমরা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে মিঃ ফর্‌ফরে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। তিনি গুপ্তপুর জেলার টাউনে থাকেন। গুপ্তপুর হইতে বলিগর্ত চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে। বলিগর্তে মিঃ খট্‌খটেকে এখনও আমাদের বিষয় জানান হয় নাই; জাহেদা মিঃ ফর্‌ফরের সঙ্গেই পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। যাইবার তারিখ ঠিক করিয়া জাহেদা বিবি মিঃ

করফরেকে কোন ভাইকে পাঠাইতে লেখায় তিনি উত্তর দিলেন যে, তাহারা উভয়ে বলিগর্তে চলিয়া গিয়াছে, বকর-ঈদের পূর্বে ফিরিবে না; বিশেষতঃ এ সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় আছে। তাই খাঁ বাহাদুর খটখটে কাহাকেও ঘরের বাহির হইতে দিবেন না। জাহেদা যদি অপর কাহারও সহিত গুপ্তপুর যান, তবে তিনি তথা হইতে সহজেই তাঁহাদিগকে বলিগর্তে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। তাঁহারা গেলে খটখটে ভাইসাহেব বড়ই সুখী হইবেন।......

পরে জাহেদা লিখিলেন যে, পাথেয় পাইলে তাঁহারা রওয়ানা হইতে পারেন। উত্তর আসিল যে, তাঁহার ন্যায় দরিদ্র লোক অত টাকা কোথায় পাইবেন?

তবে খাঁ বাহাদুর খটখটে ইচ্ছা করিলে ৫০০ টাকাও দিতে পারেন। যাহা হউক, জাহেদা ভাবিলেন, বলিগর্তে পৌঁছিলে আর টাকার অভাব হইবে না।

যথাসময়ে আমরা যাত্রা করিলাম। গুপ্তপুর যাইবার পূর্বে পথে বিষ্ণুগঞ্জে এক বন্ধুর বাড়িতে এক সপ্তাহের জন্য অতিথি হইলাম। বিষ্ণুগঞ্জ হইতে গুপ্তপুর মাত্র ৮-১০ মাইলের পথ। লোকে দৈনিক দুই তিনবার যাতায়াত করে। বিষ্ণুগঞ্জে অবস্থিতিকালে আমরা জানিতে পারিলাম, মিঃ ফরফরে নিজেকে বড়ই বিপন্ন মনে করিতেছেন, আর আমরা যাহাতে বলিগর্তে যাইতে না পারি, তজ্জন্য প্রাণপণে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লজ্জায় জাহেদা বিবির মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু কমলা বলিলেন,—"কিছুতেই ছাড়িব না – বলিগর্তে নিশ্চয়ই যাইব, যাই আগে গুপ্তপুরে। মিঃ ফরফরে তাঁহার ভ্রাতার এত প্রশংসা করিয়াছেন – এহেন ধার্মিক সাধক মহাপুরুষকে একবার দেখিতেই হইবে।"

অতঃপর আমরা গুপ্তপুরে গেলাম। কিন্তু জাহেদা বিবি আমাদের লইয়া অন্যত্র গেলেন – মিঃ ফরফরের বাড়ী যাইতে দিলেন না। দুই তিন দিন পরে ভদ্রতার অনুরোধে মিঃ ফরফরে আমাদের বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া দুই দিনের জন্য লইয়া গেলেন। তথায় মিঃ ফরফরে এবং তাঁহার স্ত্রী ডালিমকড়া আমাদিগকে বলিগর্ত সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা এই –

এখন বলিগর্তে যাইবার কোন পথ নাই – খানা, ডোবা ইত্যাদি কাদায় পূর্ণ। জল প্রচুর নহে বলিয়া নৌকা চলিতে পারে না। পথ শুষ্ক এবং সমতল নহে বলিয়া পাল্কী ও মোটর চলিতে পারে না। পথের কোন স্থান আবার পাহাড়ের মত উচ্চ। লোকে গৌরীশঙ্কর আরোহণের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এখন কেহই বলিগর্তে অবতরণের চেষ্টা করিতে সাহস পায় না। সে অনেক কষ্ট—অনেক

কষ্টে জেলে ডিঙ্গি বা অপর কোন বাহনে বলিগর্তের পত্রাদি শহরে আইসে। আপনারা পথের কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিবেন না। আর যদি বহু কষ্ট করিয়া যান, তবে থাকিবেন কোথায়?

খাঁ বাহাদুর খট্‌খটের বিশাল প্রাসাদে ছাগল, গরু, ভেড়া, মুরগি ইত্যাদি থাকে। অঙ্গনে দিনেদুপুরে সর্প-বৃশ্চিক কিলবিল করে। সন্ধ্যার পরে এক জাতি পতঙ্গ উড়ে—তাহারা এমন দংশন করে—উঃ! হাত পা ফুলিয়া যায় আর চুলকাইতে চুলকাইতে প্রাণ যায়। খাঁ বাহাদুর মশারির ভিতর বসিয়া ভাত খান—এই ত অবস্থা। আর তিনি স্বয়ং দোতলায় থাকেন। দোতলায় বেশী কামরা নাই যে, আপনাদের স্থান দিতে পারিবেন। তাঁহার তিন জন স্ত্রী তিন স্যুট ঘর দখল করিয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই দোতলায় একরূপ বন্দী অবস্থায় থাকেন। মিঃ খট্‌খটেকে একটা চেয়ারে বসাইয়া বহির্বাটিতে লইয়া যাওয়া হয়। চাকরেরা তাঁহাকে চেয়ারে বহিয়াই ইতস্ততঃ লইয়া বেড়ায়— তিনি স্বয়ং কখনও মাটিতে পা রাখেন না। পাছে সাপে কামড়ায়। মিঃ খট্‌খটে পরম ধার্মিক—দিবানিশি কোরআন, হাদীস, তফসীর এবং তস্‌বীহ্‌, লইয়া থাকেন—জমিদারী না দেখিলেই নয়, তাই অতটুকু সাংসারিক কাজ করেন। মুসলমান ধর্মীয় শাস্ত্রে সুদ প্রদান করা এবং গ্রহণ করা উভয়ই সমান পাপ। দরিদ্র প্রজাবৃন্দ অন্যত্র টাকা ধার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধার করে। তিনি অতি উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করেন; কারণ শাস্ত্রে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং ধর্ম বিনিময়ে সুদ লইতে হয়; ধর্ম কি এমন সস্তা যে, তাহা অল্প মূল্যে বিক্রয় করা যায়? তাঁহার বাড়ীর সকলেই—বাঁদি, গোলাম পর্যন্ত অতি নিষ্ঠাবান ধার্মিক। তাহারা হাদীসের অতি অস্পষ্ট কিংবদন্তীও নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন। কবে কোন্‌ কাফের জিহ্বা চাঁচিয়া কুল্লি করিয়াছিল, সেইজন্য সে বাড়ির কেহ মুখ ধুইবার সময় জিব-ছোলা দ্বারা জিব পরিষ্কার করেন না।

জেহাদের পুণ্য অর্জনের নিমিত্ত তাঁহারা বাড়ীর দাসী এবং প্রজাদের ধরিয়া আনিয়া নির্মমভাবে প্রহার করেন। পাঠিকা শুনিয়া আশ্চর্য হইতে পারেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলেও বহু দেশে "দাসী" আছে। ঐ সব দাসী প্রকাশ্য হাটে বাজারে ক্রীতা হয় নাই; ইহারা দরিদ্র প্রজার ঘর হইতে ছলে-বলে কৌশলে ধরিয়া আনা দাসী। এইরূপে বাড়ীর বিবিগণ বাঁদী মারিয়া এবং খাঁ বাহাদুর প্রজা ঠেঙ্গাইয়া জেহাদের পুণ্য অর্জন করিয়া থাকেন। কালেভদ্রে যদি কোন দাসী কোন প্রকারে পায়খানার নর্দমা গলাইয়া পলায়ন করে, তবে

তাহাতে খাঁ বাহাদুর বাঁদী "আজাদ" (অর্থাৎ মুক্তিদান) করার পুণ্য লাভ করেন।

পুণ্যশ্লোক খাঁ বাহাদুর অবরোধ প্রথারও ঘোর পক্ষপাতী। একবার চিকিৎসার নিমিত্ত তিনি গুপ্তপুরে সপরিবারে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার কিশোরী বিধবা ভগিনী এবং কতিপয় ভাগিনেয়ী আবদার করিল যে, তাহাদিগকে একবার বাড়ীর মোটর গাড়ীতে করিয়া গুপ্তপুর শহরটা দেখাইয়া আনিতে হইবে। অগত্যা মোটর গাড়ীটা মোটা বোম্বাই চাদরে সম্পূর্ণ জড়াইয়া তাহার ভিতর বিবিদের বসাইয়া সমস্ত শহর ঘুরাইয়া আনা হইল। বেচারীগণ আবছায়ার মত সামান্য সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় নাই। তথাপি মিঃ খটখটে তাহাদিগকে বলিলেন, "দেখ তোমরা মোটরে বেড়াইতে গিয়া অসংখ্য পুরুষের মুখ দেখিয়াছ সে জন্য এখনই আমার সম্মুখে 'তওবা' (অনুতাপ) কর এবং প্রতিজ্ঞা কর জীবনে আর কখনও মোটরে উঠিতে চাহিবে না।"

মিঃ জাহেরদার ফর্‌ফরে খাঁ বাহাদুর খট্‌খটের সহোদর ভাই কিনা, তাই তিনিও পরম ধার্মিক। শরীয়তের অতি তুচ্ছ কিংবদন্তীও তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। তাঁহার মতে মানুষের ফটো তোলা ভয়ানক পাপকার্য। তিনি গুপ্তপুরের একটি অনাথ আশ্রমের সেক্রেটারী হইয়া বহু পুণ্য (ছোট লোকে বলে বহু টাকা) অর্জন করিতেছেন। আমরা পরম্পরে শুনিতে পাইলাম, একদা তিনি উক্ত অনাথ আশ্রমে বঙ্গের লাট বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লাট বাহাদুর বিদায় হইলে পর তাঁহার কতিপয় বন্ধু লাট সাহেবের সহিত তাঁহাদের একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করায় মিঃ ফর্‌ফরে বলিলেন, "তাই ত ভাই, এমন প্রয়োজনীয় কথাটা আমাকে একটু পূর্বে স্মরণ করাইয়া দিলে না। সমস্ত কার্যই হইয়া গেল, শুধু এই অত্যাবশ্যক কাজটি বাদ পড়িল। আজ এই মস্ত ভুলটার জন্য আমার কিরূপ অক্ষেপ হইতেছে, তাহা আমি কথায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না।" তাঁহার এই উক্তি শ্রবণে জনৈক দুষ্টবুদ্ধি লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপস্থিত সমস্ত ভদ্রলোককে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "এতদিন আমরা জানিতাম যে, আমাদের বন্ধুবর মিঃ ফর্‌ফরের মতে মানুষের ফটো তোলা বেজায় অমার্জনীয় পাপ। কিন্তু আমাদের সে বন্ধুবরের মতেই দেখিতেছি যে, লাট সাহেবের ফটো তোলায় কোন পাপ নাই, বরং উহাতে পুণ্যার্জনই হয়।" (সকলের হাস্য।) নিমন্ত্রণের দিন লাট সাহেব

মিঃ ফব্‌ফরের কাজের প্রশংসা করিয়া দু'ছত্র লিখিয়া গেলেন। মিঃ ফব্‌ফরে সেই দু'ছত্রের দম্ভে ফুলিয়া প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেলেন। তিনি শুধু ফুলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; বরং তিনি সেই দু'ছত্র লেখা অবলম্বনে একখানি ৮-১০ পেজী বই ছাপাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। অতঃপর সেই বই প্রত্যেকের দ্বারে বিতরণ করিতে তাঁহার দুই দিন অফিস কামাই হইল। তিনি সকলের নিকট বলিতে লাগিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেট?...সে ত একজন petty officer! কমিশনর?...সে ত একজন নগণ্য চাকর। আমি কি উহাদিগকে 'কেয়ার' করি? বরঞ্চ তাহারাই আমায় সম্মান করিতে বাধ্য, কারণ আজকাল আমার পত্র-ব্যবহার (communication) স্বয়ং লাট বাহাদুরের সঙ্গে হয়।" ইত্যাদি।

মিঃ খট্‌খটে পুরুষের জন্য চারি বিবাহ করা অতি প্রয়োজনীয় "সুন্নত" মনে করেন; আর হিন্দুয়ানী সকল প্রথাকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু নিজের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বিধবা ভগিনীর বিবাহের প্রস্তাবে এই বলিয়া আপত্তি করিবেন যে, "আমরা যখন হিন্দুর দেশে আছি, তখন তাহাদের আচার নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য। কোন সম্রান্ত বংশীয়া বিধবার বিবাহ হয় না।" ইত্যাদি।

খাঁ বাহাদুর স্বয়ং তিন স্ত্রীর ভার বহন করিতেছেন; চতুর্থ স্ত্রীর স্থান রিজার্ভ করা ছিল একটি অসামান্য রূপসী জমীদার-কন্যার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত কোন কোনও দিন তিনি সুরার মত্ততায় বোতল হস্তে গুপ্তপুরের পথে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকেরা সেই কথাটুকু উপরোক্ত জমিদার গৃহিণীকে বলিয়া দেয়। ফলে সে বিবাহ ফস্‌কাইয়া গেল। আজ পর্যন্ত তাঁহার চতুর্থ স্ত্রীর পদটা শূন্যই আছে; যেহেতু এখন (তিনি ব্যাধি-ভোগে চলচ্ছক্তিহীন হওয়ায়) আর কোন 'চোক খাগী' তাঁহাকে কন্যা দানে সম্মত নয়।

খাঁ বাহাদুর খট্‌খটে ভূরি ভূরি গুণের মধ্যে একতম গুণ এই যে, তিনি অত্যন্ত বন্দোবস্তী লোক। বর্ষার সময় চাল, ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বাজারে সহজপ্রাপ্য নয় বলিয়া তিনি পূর্বেই সমস্ত জিনিস পর্যাপ্ত ক্রয় করিয়া রাখেন। ধান এত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে যে, পরে ধানের গাছ গজাইয়া গো গোলাটাই ধানের ক্ষেত হইয়া যায়! পেঁয়াজ ও নারিকেল গাছে দালানের প্রায় প্রত্যেক কামরাই পরিপূর্ণ। আলুর গাছগুলি ক্রমশঃ লতাইয়া মিঃ খট্‌খটের দোতালা পর্যন্ত উঠিয়াছে।

বলিগর্ত্তের "ডব্লিউ সি" (পায়খানা) সম্বন্ধে ভগিনী ডালিমকড়া (মিসিস্ ফর্‌ফরা) যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা নিতান্ত রুচি-বিরুদ্ধ বলিয়া তৎসম্বন্ধে আমরা মসি কাগজ নষ্ট করিলাম না।

মিঃ খট্‌খটে সম্প্রতি আজরাইল নামক জনৈক হাকীমের চিকিৎসাধীন আছেন। হাকীম সাহেব প্রতি সপ্তাহে ২০০ টাকা দর্শনী পাইয়া থাকেন। শুনিযাছি, এই চিকিৎসার ফলে খাঁ বাহাদুর অতি দ্রুতগতি 'মোকাম মাহমুদা' (স্বর্গের সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠের) দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার দ্রুত আরোগ্য কামনা করিয়া মিষ্টার ও মিসিস্ ফর্‌ফরার নিকট বিদায় লইযা আসিলাম।

গাড়িতে উঠিতে কমলা দিদি বলিলেন, "আচ্ছা দাদা। অপেক্ষা করুন। বলিগর্ত্তে যাইবার পথ যদি ধরাধামে না পাই, তবে কিছুকাল পরে আমরা এরোপ্লেন-যোগে আসিয়া একেবারে খাঁ বাহাদুর মিস্টার কশাই-উদ্দিন খট্‌খটের দোতলায় ছাদের উপর নামিব।'

কেয়ার কাঁটা

বেগম সুফিয়া কামাল

বহুদিন পরে দেশে ফিরে এসেছি। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পর। পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তন হয়েছে—কত জায়গায় কতরকম, কত অভিনবভাবে। যাকে গেছলাম রেখে সলজ্জা কুণ্ঠিতা কিশোরী, তাকে এসে পেয়েছি—সৌভাগ্যগর্বে গর্বিতা, তন্বী, সুন্দরী রাণীর মতো মহিমময়ীরূপে। ও যেন আমার দুঃখের দুয়ারে সান্ত্বনা। প্রবাসের জটিল পথ-রেখা আমায় কত রূপে পথভ্রান্ত করতে চেয়েছে, কিন্তু ও কাজল আঁখির কোমল দৃষ্টির আলোক চকিতে আমায় সাবধান করে দিয়েছে, ধ্রুবতারার উজ্জ্বল আলো দিয়ে। জীবনে যত জিনিস পেয়েছি তার মধ্যে ওকে পাওয়াই আমার চরম চাওয়ার চরম পাওয়া। ও যেন ঝর্ণা। দুঃখ ওকে কাতর করে নি, বেদনা ওর কাছে সুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছে, আঘাত ওর পরশে অলঙ্কার হয়ে বেজেছে। ও যেন পথ ভোলা কোন এক ছায়াপথের নীহারিকা। এত কাছে পেয়েও ওকে দু'বছরে চিনি নি! তার পরে বিলেত গেলুম—ওকে রেখে গেলুম মামাতো বোনের কাছে।

দেশে ফিরে আত্মীয়-অনাত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের আপ্যায়নে এতটুকু সময় ছিল না, ওকে একটুখানি নিরালা কাছে পাওয়ার!

পাঁচ সাত দিন পরে সন্ধ্যার আগে ও বললে 'চল, তোমায় 'লেক' দেখিয়ে আনি, তুমি তো দেখে যাওনি। বন্ধু-বান্ধব সন্ধ্যার পরই আসতে শুরু করবে, চল এই বেলাই পালান চলে।' কথামতো দু-জনায় মিলে বেরিয়ে পড়লুম।

ধূলি-ধূসর ইট-কাঠের কারা-আবরণ ঘুচিয়ে এই 'লেক' দেখে মনটা সত্যি হাঁফ, ছেড়ে বাঁচল—খুব খুশি হলুম। ও বললে 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চল ওই মসজিদে—নামাজ পড়ব!' বহুদিন পরে দু-জনায় এক সাথে নামাজ পড়লুম।

শেষ 'রাকাত' শেষ করে ওর পানে চাইতেই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে বুকটা আমার ভরে উঠল। দেখি, ওর সুপুষ্ট গণ্ড বেয়ে অশ্রু-মুক্তা ঝর্ ঝর্ করে পড়ছে। 'মোনাজাত' করতে হাত দু-খানি তখনও তার মুখের কাছে তুলে ধরা। দেশ-বিদেশে কত কত ম্যাডোনা, কত ভেনাস, কত মেরীর, কত রূপের, কত উপাসনার বাস্তব-অবাস্তব ছবি দেখেছি, কিন্তু এ যেন কোন্ হারানো যুগের বিস্মৃত-প্রায় স্বপ্ন-মূর্তি। মোনাজাত শেষ করে ও উঠে দাঁড়াল, ওকে বুকে টেনে নিয়ে ভাবলুম—আমি বুঝি রাজার চেয়েও সৌভাগ্যবান।

পুল পার হয়ে চলে এলুম। নব-নারীর ভীড় কাটিয়ে নিরালা একটা জায়গা বেছে বসে পড়লুম। ব্যাগ থেকে পানের ডিবে বের করে একটা আমার মুখে দিয়ে, আর একটা নিজে খেয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, 'তোমার শেষ চিঠিতে লিখেছিলে, আমার কাছে কী অপরাধের বোঝা নামিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইবার আছে।' মুহূর্তে আমার মনের স্বপ্ন ডুবে গেল। তার তাপসীর মতো মুখের দিকে চেয়ে আমার অপরাধের বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠল। তন্বী কোমলা এক নারী—তার কাছে আমার পৌরুষ যে ধূলায় মিশে যেতে চাইল। কিন্তু ওর দৃষ্টির কাছে যেন কিছুই লুকানো যায় না! আমার মনের ভাব যেন মুখে ধরে ফেলে। ও বললে, 'তোমার অপরাধ আমার কাছে সহজ করতে পারছ না, এতে কি আমাদের মধ্যে ব্যবধানেরই সৃষ্টি করছ না? যা তোমার অহেতুক ভীতির সৃষ্টি করছে, আমাকে বলে তার গুরুত্ব কমিয়ে ফেলাই ভাল।' শিশুর মতো অসহায় হয়ে আমি তার এলায়িত দেহের উপর নত হয়ে বললাম 'সব শুনে যদি তুমি আমায় ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দাও?' দু-হাতে আমার মুখ তুলে ধরে সে বললে, 'পাপকে হয়ত ঘৃণা করবো, কিন্তু পাপীকে নয়।' বলেই হাসল। গাছের ফাঁকে এক টুকরো জ্যোৎস্না ওর মুখের এক অংশে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ছে, তার আলোয় ওর হাসি দেখলুম আমি—সে এক অদ্ভুত হাসি। নারীর প্রাণের অনন্ত রহস্যের আভাস যেন এতে ঈষৎ ধরা পড়ে। মুগ্ধ আমি, আমার প্রাণের দু-কূল ছাপিয়ে ওর হাসির শোভা প্লাবিত করে গেল। কিন্তু অভয় পেয়ে আমি আমার ক্ষণিকের ভুলের কথা বলে গেলুম:

ওখানে গিয়ে তোমার মুখ আমার মনে পড়ত সর্বদাই। তোমাকে আমি ভুলি নি, এ তুমি বিশ্বাস কর। প্রথম প্রায় বছরখানেক আমি শুধুই ভেবেছি, তুমি আমার সঙ্গে অহর্নিশ রয়েছ, আমার পদস্খলন হতে পারে না! নিয়ম-

মতো পড়াশুনা ও তোমার চিঠির আশা এবং চিঠি পেয়ে তার উত্তর দেওয়া—এতেই আমার জীবনের পরিপূর্ণতা মনে হত। তারপর এক ছুটিতে গেলুম এক বন্ধুর বাড়ি। দরিদ্র গৃহস্থ। তাদের অনাড়ম্বর সহজ জীবনযাত্রা-প্রণালী আমায় তোমার কথাই মনে করিয়ে দিত। তার এক বোন ছিল—লুসী। তাকেও আমি দেখ্‌তাম সহজ শ্রদ্ধা সম্মানের চোখে! ছুটি ফুরালে আমি আবার আমার জায়গায় ফিরে এলাম। তবুও বন্ধুর মায়ের সাদর আহ্বান আসত আমার কাছে প্রতি রবিবারে। আমিও যেতাম। দূর প্রবাসে মাতৃস্নেহের আভাস আমার মনকে লুব্ধ করত সন্দেহ নেই। এক রবিবার তাদের সবাইকে নিয়ে আমি গেলুম সিনেমায়। এক কুমারী-হৃদয়ের করুণ কাহিনী আমাদের বুকে মধুর বেদনা দিল। দেখলুম—সবারই চোখ সহানুভূতির বেদনায় সজল। লুসীর দিকে চেয়ে দেখলুম—সে যেন চিত্রে প্রদর্শিত কুমারীর শেষ দৃশ্যের মতোই ব্যথাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে, আর বেদনা গলে গলে অশ্রু-রূপে ঝরে পড়ছে তার গাল বেয়ে। কী এক বেদনায় আমার মন ভরে গেল, আমি তাকে স্পর্শ করে কিছু অসুস্থতা বোধ করছে নাকি জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম। সে যেন অচেতন অবস্থা থেকে সচেতন হয়ে উঠল। তার শুভ্র কপোল উত্তেজনায় রক্তিমাভ হয়ে উঠল, থর থর কেঁপে সে বল্‌লে, 'একটু বাইরে যাব—মনটা বড় অস্থির।' আমি ধীরে ধীরে তাকে ভিড় কাটিয়ে বাইরে নিয়ে এলুম। খালি একটা বেঞ্চ ছিল, তাতে বসিয়ে আমি তার পাশে বস্‌লুম। আমার ভয় হচ্ছিল, পাছে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। এইটুকু বলে আমি ওর মুখের পানে চাইলুম! দেখলুম—কালো চোখে তার করুণা ঘনিয়ে উঠেছে।

আমি আবার বল্‌তে লাগলুম 'তারপর লুসীর মা-ভাই বের হয়ে এসে ব্যস্তভাবে বললে, ওর ওইরকম মাঝে মাঝে হয়, ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে। আমি উঠে একটা মোটর ডেকে লুসীকে বাড়িতে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। একটু পরে ওডিকলোন সিক্ত রুমালে মাথা-মুখ মুছিয়ে দিতে ও সুস্থ বোধ করল। পরে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলুম। সারা পথ ও সারা রাত লুসীর ওই ভাব আমায় কাতর করে রেখেছিল। সাথে সাথে তোমার কথাও আমার মনে পড়েছিল।'

'পরের দিন সন্ধ্যায় আমার একবার মনে হল, যাই লুসীর খবরটা নিয়ে আসি। গিয়ে দেখলুম, ওরা কেউ বাড়ি নেই, লুসী বারান্দায় একাকী বসে কী যেন ভাবছে। আমি কাছে যেতে ও এমনভাবে আমার দিকে চাইল যে, আমার মনে হল যেন ও আমারই প্রতীক্ষা করছিল! আমি বল্‌লুম 'কেমন আছ?'

সাদরে আমার হাতখানা ধরে ও বল্‌লে 'ভালই – তবে একটু দুর্বল লাগছে'। 'ও কিছুই নয়। কাল তুমি সেরে উঠবে' – বলে আমি একখানা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লুম। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। কিন্তু এ নীরবতা নিতান্ত অশোভন ভেবে কী জানি আমি কেন বললাম 'কাল তোমার হঠাৎ ও-রকম হল কেন লুসী'? সে ধীরে মুখ তুলে আমার পানে চেয়ে আবার মাথা নত করলে। তার গাল লাল হয়ে উঠল। সে কিছুই না বলে শুধু চক্ষের জল ফেলতে লাগল। গোধূলির স্তিমিত আলোকে সজলনয়না এই তরুণীকে দেখে করুণায় আমার মন ভরে উঠল। তার হাতখানা চেপে ঈষৎ কম্পিত স্বরে আমি বললাম 'কী তোমার দুঃখ, আমাকে বন্ধু ভেবে বল্‌তে পারো না লুসী?' সে আমার হাতখানা দু-হাতে মুখের উপর চেপে আরো কেঁদে ফেললে – অস্ফুট স্বরে বললে, 'সত্যি-সত্যি তুমি এই হতভাগিনী নারীকে একটু দয়া করে ভালোবাস –। বল, সত্যি বল – ভুল হলেও বল – আমার জীবন মুহূর্তের ভুলে সার্থক সুন্দর হয়ে উঠুক।'

'বিশ্বাস কর তুমি ভানু! সেই মুহূর্তটি শুধু তোমায় ভুললুম, আমি সব ভুললুম, শুধু রইলুম আমি আর এক বঞ্চিত ব্যথাতুরা আমার ভালবাসা-ভিখারিণী নারী! আমি নত হয়ে তার তৃষিত অধরে আমার মুখ রেখে তাকে বললুম, 'হাঁ লুসি, তোমায় দিলুম আমাকে ভালবাসবার অধিকার।' সে বালিকার মতো উল্লসিত হযে আমার বুকে মাথা রেখে তৃপ্তির হাসি হাসলে।

এইটুকু বলে ভানুর মুখের দিকে চাইলুম। দেখলুম তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শরতের নির্মল আকাশে চাঁদের হাসির মতো ওর মুখচোখ এক অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে জ্বল জ্বল করছে। ও বললে, 'চুপ করলে কেন, বল।' আমি বললুম 'কিন্তু এরপরও শুন্‌বে তুমি'? দৃঢ় কণ্ঠে ও বললে 'হাঁ, বল তুমি'। আমি বললুম, এরপর আমার কাছে ও সহজ হযে গেল। প্রতি শনিবারে রবিবারে ওদের ওখানে যেতুমই; কিন্তু ওর অনুরোধে আমায় তাদের বাড়িতেই স্থায়ীভাবে থাকতে হল। আমিও ভাবলুম, এক গরীব গৃহস্থের দু-পয়সা আয় হবে—আর আমার মনও টানছিল। এইভাবে ওদের সংসারে আমার পয়সায় এটা-ওটা কিনে দিয়ে আমিও অনেকটা অনুগ্রহের দায় এড়ালাম ভেবে তৃপ্তি পেতাম।

'তোমার চিঠি যখন যেত, তখন আমার মনে হত আমি যেন এ পাবার অধিকারী নই। কুণ্ঠিত লজ্জিত অন্তরে তোমার চিঠিগুলি গোপন সম্পদ ভেবে আমার নিজস্ব থাকত। ওরা জিজ্ঞাসা করত 'কার চিঠি?' আমি বলতুম 'আমার বোনের!' এইভাবে প্রায় আরো এক বছর কেটে গেল। লুসী একদিন

আমায় বলল, 'আমরা গরিব, কিন্তু আমাদের সম্মান আছে'—যদি আমার আপত্তি না থাকে সে তা হলে চিরজীবনের তরে আমায় সাথী বলে গ্রহণ করতে রাজি আছে। আমি চমকে উঠলুম! এক সঙ্গে আমি দুজনকে ঠকিয়েছি। আমি ভণ্ড প্রতারক, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।'

'সারারাত ও সারাদিন আমি লুসীকে এড়িয়ে এড়িয়ে চললুম। পরের দিন আনোয়ারের প্রেরিত পার্শেলে তোমার লেখা সবগুলি কবিতা-গল্প পেলুম। অনুশোচনায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হল—কিন্তু আমায় তা হতে রক্ষা করল তোমার লেখাগুলি। তুমি একটা গল্পে লিখেছিলে, 'পৃথিবীর দুঃখ হতে বাঁচতে আত্মহত্যা করে যে, সে কাপুরুষ।' আমি ভাবলুম হয়ত অপরাধের ক্ষমা তোমার কাছে পাব। তারপর সারারাত আমার মন আমায় উদভ্রান্ত করে তুললে। প্রবঞ্চনা আর নয়। সেইদিনই আমি লুসীকে চিঠি লিখলাম। তোমার কথা লিখলাম, তার কাছেও ক্ষমা চাইলাম। উত্তরে সে নিজেই এল ধীর শান্ত মুখে। আমায় ডেকে নিয়ে এক পার্কে নিয়ে বসাল। খুঁটে খুঁটে আমার কাছে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করল। সব শুনে সে বললে 'তোমার স্ত্রী কবি, সে নিজে সুন্দরী, সে সৃষ্টি করে সৌন্দর্য। তাকে তুমি অপমান করেছ, আমার এ অপমান তার তুলনায় তো কিছু নয়।' আমি যেন তীব্র কশাঘাতে চেতনা লাভ করলুম! বললুম 'তুমি আমায় ক্ষমা কর।' সে বললে 'আমি নিজে যেচে তোমায় ভালবেসেছিলাম, কিন্তু তুমি বিবাহিত এ কথা কেন গোপন করলে? আজ তবে বিদায়। তোমায় ক্ষমা করব সেদিন যেদিন তোমায় ভুলব। পারি ত চিঠি লিখে জানাব।'—সে চলে গেল। আমি সে পাড়া ছেড়ে অন্য জায়গায় এসে পড়াশুনা শুরু করলুম! এখন আমার বলা শেষ হল, তোমার ক্ষমা পাব কি না বল?'

ভানু শান্ত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'আমি হয়ত ক্ষমা করলুম। কিন্তু যাকে, যে নারীকে তুমি অপমান করে এলে, তার ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত তুমি সারা নারী-জাতির যে অপমান করেছ, তার ক্ষমা আমার কাছে নেই।' সে উঠে দাঁড়াল। তার মাথার কাপড় তখন খসে গেছে। আমি প্রত্যাশাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলুম। তার শিথিল কবরীর ফাঁক থেকে কেয়ার রেণু আমার চোখে-মুখে এসে পড়ল। আমি বললুম 'তুমি আমায় দণ্ড দাও ভানু।' ভানু বললে 'তুমি ভালবাসার অপমান করেছ, তার বেদনা ভুলতে আমায় দাও।' তারপর বললে, 'ক-টা বেজেছে?' ঘড়ি দেখে বললুম, 'সাড়ে

আটটা।' সে বললে, 'সাড়ে ন-টা পর্যন্ত থাকলে কোনও রকমেই আপা রাগ করবেন না। আমি বলি একটা রূপকথা—তুমি শোন। তোমরা পুরুষ—তোমরা চাও বিস্মরণী। কিন্তু নারী চায় অতীতের মাধুর্য দিয়ে রচতে নব নব সৃষ্টি। তাই এক বিজয়িনীর কাহিনী তোমায় শোনাব, তারপর হবে নর ও নারীর অপরাধের বিচার। তোমাদের পুরুষদের বড় বড় কবিরা যা কল্পনায় পান নি, নারী তার ক্ষুদ্র গণ্ডি-ঘেরা ঘরের সীমায় বসে রচনা করে সে কবিদের কল্পনার চেয়ে বেশি।' ও বলতে লাগল, আমি শুনতে লাগলুম। চাঁদ তখন ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের সর্ব দেহে, মনেও বুঝি তার প্লাবন লেগেছে।

'এ কালের এক বাদশাজাদা রাজত্ব হারিয়ে চলেছিল উন্মনা উদাসী হয়ে যে কোন একদিক পানে। তার চোখের আগে পড়ল এক গরবিনী গেঁয়ো মেয়ে। লোকের কাছে শুনত, তার রূপ আছে, গুণও আছে; তবু তার উপযুক্ত স্বামী মিলছে না। কিন্তু বাদশাজাদা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ভাবলে, নাই-বা আমার রাজ্য রইল, হীরা মুক্তার যা দাম আছে, তাই নিয়ে আমি ঘর বেঁধে একে নিয়ে সুখের নীড় রচনা করব। সে যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ সে গেঁয়ো-মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেল নিজের দূর আত্মীয়েরগৃহে। আগেকার বাদশাজাদারা মৃগযায় যেতেন, দিগ্‌বিজয়ে যেতেন, কিন্তু এ কালের শাহজাদা গেলেন কর্মজীবনে এক দিগ্‌বিজয় করতে। গরবিনী গেঁয়ো-মেয়ের হঠাৎ—শাজাদার রঙিন স্বপন তখনো কাটে নি। ভীতা কুণ্ঠিতা নবোঢ়া সে স্বামীর এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সাহস করল না। বরং সে মনে করল দশ জনের একজন হয়ে শাজাদা যখন ফিরে আসবে—সে হবে তার বুকের গর্ব, মনের তৃপ্তি। কুণ্ঠিতা সে বিদায়ের অশ্রু বুকে চেপে হাসিমুখে তাকে বিদায় দিল। অশ্রু-সিক্ত অনুক্ত কথা তার বুকের মাঝে সংগোপনে সুখের আশার রঙে রঙিন হয়ে উঠতে লাগল।'

'কত দিন কেটে গেল। আধুনিক শাজাদার খবর দূত মুখে না এসে লিপি-বাহকের হাতে কথার গুচ্ছরূপে আসতেই ছিল তিথিতে তিথিতে! আর সে ছিল তারই আনন্দে মশ্‌গুল হয়ে। সহসা এল শাজাদার শৈশবের সাথী দুর্দিনের বন্ধু—তার পরমাত্মীয় এক তরুণ। সে ছিল নারী-বিদ্বেষী! নারীর অপমান ছাড়া, নারীর প্রতি অহেতুক কঠোরতা ভিন্ন তার আর কোনই যেন সার্থকতা ছিল না। সে এসে ঠাঁই নিল শাজাদীর আশ্রয়গৃহেই। বলা বাহুল্য, এ কালের বাদশাদের সাত-মহলা প্রাসাদ নেই, সাততলা হলে হতে পারত;.

কিন্তু তা-ও নেই। তবুও চক মিলানো প্রকাণ্ড বাড়ির এক কোণে কথার মালা গাঁথা ও দ্রুত দশায় সংসারের কাজ সারা করে শাজাদী আপন মনে থাকে। পল্লীমায়ের দুলালী, পিঁজ্‌রার পাখির মতো সে থাকে না। তার কল-কাকলীতে গৃহ-পরিজন তাকে আদরই করে। রুদ্ধ গৃহকোণে আনন্দের প্রস্রবণ। তার দিন আনন্দেই কাটে, শুধু প্রিয়তমের বিরহে বেদনা জাগে—মনের কোণে অতি সংগোপনে।

আধুনিক এই শাজাদীর পায়ে পাওজেব নেই, কণ্ঠে মণিমাণিক্যের সাতনরী হার নেই, হাতে বাজুতে মণি-কঙ্কণন, মতির বাজুবন্দ নেই। কালো চুলে শুভ্র সিঁথিতে টীকা নেই। তবু সে সুন্দরী। তবু তার রূপের খবর যেয়ে পৌঁছে সেই নারী-বিদ্বেষী তরুণের কানে। গৃহ-স্বামিনী তার নিকট-আত্মীয়া, তার কথা তবু ভাল লাগে। কিন্তু হঠাৎ আসা এই তরুণীর কথায় তার সারাচিত্ত বিরূপ হয়ে ওঠে। সারা গৃহ যার প্রশংসায় মুখর, কী এমন এক তুচ্ছ নারী সে! অহেতুক আক্রোশে তার সারা দেহমন ভরে উঠে। কিন্তু তার এই রুদ্ধ রোষের শুধু নিজেই মনে মনে জ্বলে উঠা ছাড়া প্রকাশের পথ ছিল না। বলা বাহুল্য, একালের এই শাজাদীর রাণীগিরি ফলানোর উপাদান দাসী বাঁদী বান্দা নফর কিছুই ছিল না। অনটনের সংসারে সে তার নিজের হাতেই বাট্‌না বাটে, কুটনা কোটে'।

'ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড়কাচা, রান্নাবান্না সবই করতে হ'ত। এসে অবধি নিজের অনভ্যস্ত সকল কাজ তার হাতে নিয়ে গৃহস্বামিনী হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। ওর অভ্যস্ত হাতের কর্মপটুতায় সবার তৃপ্তি হল বলে ওর ওপর কারও কোন বিদ্বেষ ছিল না। বরং সহজ প্রীতির আবরণ তাকে আরো মাধুর্য দিয়েছিল।'

'যাক সে কথা। আপন রোষে আপনি ক্ষুব্ধ সেই তরুণটি একদিন বললে, তার ঘর গোছানোর অছিলায় যে সে এসে আরো বিশৃঙ্খল করে দেয় এটা তার পছন্দ নয়। হুকুম হবার সাথে সাথে সে ঘরে যাওয়া বন্ধ হল; কিন্তু বিদ্রোহের এই আভাসে—যে শাজাদী এসেছিল দখিন হাওয়ার মতো নিঃশব্দে আপন মাধুর্য ঢালার খেয়ালে, এখন হল সে কালবৈশাখীর ঝড়ো-হাওয়া। যখন তখন সে বিদ্রোহীকে আপন অস্তিত্ব জানাবার জেদে চঞ্চলা হয়ে উঠল। এরই মধ্যে এক শ্রাবণ রাতের নিবিড় বারিধারার তালে তালে নীরব গৃহে সে আপন অন্তরের সংগোপন বিরহের সুরটা ব্যক্ত করছিল আপনাকে নিরালা ভেবে।

কিন্তু মৃগনাভি হলে যেমন মৃগ আপনাকে উন্মাদ করে, অন্যকেও উন্মাদ করে আপনার অগোচরে, তেমনি হয়ত আপনার অজানিতেই সেই বিদ্রোহীকে উন্মাদ করে দিলে কেমন করে, তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু সে কথা পরে বুঝেছিল সকলেই।'

হঠাৎ একদিন এসে বিদ্রোহী বললে, তোমরা কেউ আমার ঘরটার দিকে দেখ না, এমনি আস্তাবলের অবস্থা সেটার হয়েছে যে, আমার থাকা অসহ্য। অন্তরালে শাজাদীর কণ্ঠে সশব্দ হাসির কলরোল উচ্ছ্বাস উঠল। গৃহস্বামিনীর অধরে মৃদু হাসির আভাস উঠেই মিলিয়ে গেল। অপ্রতিভ হয়ে যে বলেছিল, সে চলে গেল। কিন্তু এইটুকুতেই এক নারী-মনের কাছে ধরা পড়ে গেল— পুরুষের পৌরুষ বজায় রাখার অথচ ছলনাময় পরাজয়ের আত্মসমর্পণ। এর পর এল দেখেও না-দেখার ভাণ করা আর ক্ষণিকের আসা-যাওয়া দেখার এক মধুর তৃপ্তি। তাই নিয়ে চলল নিজের মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করা। পুরুষের এই পরাজয়ে নারীর তৃপ্তি সারা নারী জাতির গর্ব ভেবে আর পুরুষ শুধু যাকে না পাওয়া গেল, তাকে চাওয়ার স্বপ্নসুখে বিভোর। নর ও নারীর এ এক চিরন্তন খেলা – এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।'

এইটুকু বলে ভানু আমাকে বললো, 'শুন্‌ছ তুমি। বিরক্তি লাগছে না তো? আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম তার কথা, কিন্তু অর্থ একটুও বুঝলাম না। ওর বলার ভঙ্গিমাটি এমন সুন্দর যে অর্থ না বুঝলেও আমার ভালই লাগছিল। আমি শুধু দেখছিলুম, ওর মুখের ভাবটুকু কী সুন্দর, রহস্যময়। ও কবি, তাই ওর কথাও সুন্দর। আমি বললুম, 'হাঁ, বল, বিরক্ত লাগছে না মোটেই'। ও আর একটি পান মুখে দিয়ে পরম আরামে খেতে খেতে আবার শুরু করল :

'আর বেশি ভূমিকা না করে বলে ফেলি, রাতও হচ্ছে। হাঁ, তারপর এল এক মধুময়ী বাসন্তী নিশি, যা শুধু আকাঙ্ক্ষাটিকেই তীব্র করে তোলে। যাকে পেয়েছি, তাকেও যেন পাইনি পূর্ণতরভাবে, এই ভাব আসে অনেকেরই। কিন্তু যারা পূর্ণ করে নিতে জানে তারা এই সময়টিতে বিরহকেও মধুর করে বুক ভরিয়ে তুলে নিতে পারে। কী করে পারে, তা বুঝবে না তুমি, কারণ তুমি কাব্যকলার ধার ধারো না।' বাধা দিয়ে আমি বললুম 'এ তোমার অন্যায় ভানু!' ও বললে, 'চুপ! তারপর শোন। এমনি এক নিশীথে নারী তার সুদূর প্রিয়তমের বিরহ বেদনা কল্পনার আল্‌পনায় সুন্দর করে এঁকে আপন মনে নিবিড় করে পেতে চেয়েছিল। এমন সময় এল তার কাছে এক মুগ্ধ পরাজিত প্রেমপ্রার্থীর

নিবেদন, আমি তোমায় ভালবাসি। এই নিবেদন কি করে এল, তা না হয় নাই বললাম, তুমি বল এ অবস্থায় তার কী করা উচিত ?'

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, 'তা আমি জানি না ভানু। আমি ত কবি নই।'

ভানু শান্ত হাসি হেসে বললে, 'এ কবিতার কথা নয়, এ বাস্তব ! তা যাক্, তুমি হয়ত বুঝতে পারবে না—নারী শুনলে, তার দ্বারে নবীন অতিথি মনে প্রাণে ভিতরে বাইরে বসন্তের রঙীন হিন্দোল হিল্লোল। কিন্তু প্রাণের পেয়ালা যার ভরা আছে, তার উপর আর এক ফোঁটা পড়লে গড়িয়ে পড়া ছাড়া সে বিন্দুটির আর কি গতি ! তবু গড়িয়ে পড়বে বলে ও ফোঁটা ফেলা ত দোষের নয়, তাই অনলস স্রষ্টা এই বিন্দুপাত করতে কার্পণ্য করলেন না। ভাবো একবার, এক নারী তার জীবনের প্রথম যৌবনের এক বসন্তে ব্যর্থ বিরহ-নিশি যাপন করছে, আর তারই পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে এক তরুণ তার প্রাণের পেয়ালায় প্রীতি সুধারস অধরের আগে এনে নিবেদন করছে। তোমরা পুরুষেরা হলে কি করতে আমি জানি না, কিন্তু নারী সে নরকে নিরাশ করলে না, প্রতিদানও দিলে না ; তাকে দিলে আপন জয়ের গরবে বন্ধুর পদ। নারীর পুরুষ-বন্ধু শুনে অনেক নীতিবিদেরা চঞ্চল হয়ে উঠবেন জানি, কিন্তু সে নারী সত্যই বন্ধু-পদে বরণ করে এক অন্ধ দিগ্‌ভোলা নরের প্রাণ বাঁচালো। যে সুরা সে হাতে এনেছিল, অবহেলায় সে সুরা তার কণ্ঠে বিষ হয়ে তার বুক অবধি দগ্ধ করে দিত। নারীর হাতের স্পর্শে সে রস অমৃত হয়ে তাকে স্নিগ্ধ করে দিল।'

'বিদ্রোহী বিদ্বেষী সে নরের যে অর্ঘ্য এসেছিল সাজানো সুখের সাক্ষী রূপে, তা থেকে সে বিজয়িনী নিলে অদিনে—দুর্লভ এক গুচ্ছ কেয়ার কলি। সার্থক হাসি হেসে পরাজয় স্বীকার করে সে বিদ্রোহী বন্ধু হয়ে ফিরে গেল, পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে। রাতের পরশ লাগা সে কেয়ার কলি ভোরে যখন তার কাছে ফিরে গেল, বন্ধুত্বের নিদর্শন মনে করে সে তা মাথায় রাখল।'

আমি চমকিত হয়ে ভানুর চুলে জড়ানো কেয়ার দিকে চাইলুম। সে মৃদু হেসে বললে, 'কি দেখছ ? এটা নয়—এ যে একেবারে টাট্‌কা।' বলে আবার শুরু করলে 'তারপর এল এমনি এক শারদ নিশীথিনী। বনের বুক তখন কেয়ার রেণুতে ছেয়ে গেছে। গন্ধে বিভোর জ্যোৎস্নারাতে সে বেদনা-সৌরভে কুন্ঠিত পল্লীবালার বুক তখন কাব্যের সুষমায় ভরে উঠেছে। সে তখন কবি। দূর

দেশ থেকে তার প্রিয়তম অভিনন্দন পাঠিয়েছে—আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরা লিপিতে। তরুণীর বুক তখন পূর্ণ। সে কবি, তার অভাব নেই কোথাও; অপ্রতুলতা নেই কিছুতেই। নিজের মনের সম্রাজ্ঞী সে, কল্পনার কাননে আত্মসমাহিতা। তার যশের সৌরভে কত মুগ্ধ প্রাণের প্রীতি তাকে স্নিগ্ধ করে দিল। প্রবাসী প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে তার প্রাণের সবটুকু সুধারস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে; সে আপন মনে বললে, 'ওগো আমার প্রিয়তম, বিরহ-বেদনায় আমার প্রাণে যে কাব্য-কুসুম ফুটিয়ে গন্ধ ছড়ালে সে ত তোমারই দান প্রিয়।' কথিত-অকথিত বাণী তার প্রাণের পরে লেখা রইল প্রেমের রঙিন রঙে রংরেজ হয়ে। 'নিরালা মনে সে রচনা করছিল কথার পর কথার মালা। এমন সময় তার কাছে এল এক লিপি। লেখক লিখেছে, 'বিজয়িনী বান্ধবী, আজকে তোমার প্রীতির জন্যে দিতে চাই তোমার প্রিয়তর একগুচ্ছ কেয়ার কলি; অন্তরাল হতে শুধু হাতখানি তুমি বাড়িয়ে দাও। তোমার হাতের উপর আমার দীন অর্ঘ্য যে সার্থক হয়ে উঠবে, তারই তৃপ্তিটুকু আমায় পেতে দাও। কবি সে, এই ফুলের প্রীতি ফিরিয়ে দিতে পারল না। যে নারী বিজয়িনী, তার ভয় নেই কিছুতেই। তাই সে সেই পরাজিত বন্ধুর দ্বারে গিয়ে হাত বাড়াল। তার হাতে ফুলের গুচ্ছ ধরে দিয়ে সন্তর্পণে সেই হাতখানি সে মাথায় ঠেকাল। এ শুধু মুগ্ধ পূজারীর ভক্তিভরা পূজার পবিত্রতা। এতে কি কোন দোষ আছে, বল ত তুমি?' ভানু আমার মুখের পানে চাইলে। আমি বললুম, 'কাব্য-কল্পনা কখনও দোষের হতে পারে না।' ভানু অধীর হয়ে বললে, 'না, না, এ কল্পনা শুধু নিছক কাব্য নয়, এ বাস্তব। যত কবিতা, কাব্য বল, বাস্তবের স্পর্শ ছাড়া তার পূর্ণতা কোথায়? এ তুমি বিশ্বাস কর।' আমি বললুম, 'নায়িকার মনের ভাব আমি জানি নে, তা বলতে পারি নে। কিন্তু নায়ক যা করলে এ ঠিকই করেছে, এতে দোষ নেই কিছুই।' ভানু বললে 'হাঁ, আমি জানি দোষ নেই কিছুই। কিন্তু লোকের চক্ষে দোষ বলে ধরা হল এ কথা। ফুলের সুবাসের স্মৃতি মলিন করে লোকে কাঁটার কঠোরতা দিয়ে তাকে ঢাকল। পবিত্রতার কালিমা দিয়ে কলঙ্ক রটাল। যে গৃহ-স্বামিনী ছিল পরম বন্ধু, সে হল চরম বিদ্বেষিনী। কিন্তু এ শুধু নারীরই উপর সবার বিষদৃষ্টি-দোষারোপ—আর যা কিছু সব। পুরুষের পবিত্রতা তাতে আরও বেড়ে গেল। কারণ হাতে পেয়ে নারীকে সে শুধু প্রেম জানিয়েই নিষ্কৃতি দিলে। এতে ত তারই শুধু সচ্চরিত্রতা প্রমাণ হয়ে গেল। নারী হল লালসাময়ী-ছলনাময়ী, নরকে প্রলুব্ধ করতে

দুঃসাহসিকা।'

'বিজয়িনী এসব শুনে অন্তরালে আপন খেয়ালের খুশিতে শুধু একটু হাসলে। তখন তার প্রিয়তমের আগমন ঘনিয়ে এসেছে। সে ছিল তারই খেয়ালে মশগুল, তার প্রিয় এলে কী দিয়ে তার তুষ্টি সাধন করবে এই খেয়ালে! তার প্রিয়তম সব শেষে এল, কিন্তু সে এসে যে কথা তাকে শোনালে তাতে তার কি করা উচিত, তুমিই বল। যাকে সে শুধু 'আমারই, বলে ভেবেছে, সে যদি অন্যের পূজারী হয়ে ফিরে আসে, কি তখন তার মনের অবস্থা হয় বলতে পার? আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম 'সে কি করে এসেছে বললেই ত পার ভানু?' ভানু শান্ত স্বরে বললে 'তুমি যা করে এসেছ। এক নারীকে অপমান করে অন্য নারীকে বুকে নিয়েছিলে, কিন্তু দু-দিনের খেয়ালখেলা মিটতেই আবার অপরাধীর মতো ফিরে এলে এই নারীরই কাছে?'

কী সকরুণ মর্মন্তুদ কাহিনী। আমি অধীর হয়ে বললাম, 'এ সঙ্কট হতে আমায় বাঁচাও ভানু। বলো, তোমার কাহিনীর মানে কি?' ধীর-শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে উত্তর দিলে, 'কাহিনী যা বললাম তার একবর্ণও মিথ্যা নয়—নায়িকা বল অথবা যা ইচ্ছা তাই বল, বর্ণিতা নারী আমিই। আমার প্রতি তোমার মনের এ মুহূর্তে যা ভাব, তা ব্যক্ত করতে পার কি? জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল হাসি আমার আঁখির আগে নিভে এলো মুহূর্তের তরে। পরক্ষণেই মনে হল, আমি অপরাধী, আর ও বিজয়িনী! আমি আগ্রহে ওর হাতখানি ধরে বললাম 'আমার অপরাধ তুমি ভুলে যাও ভানু। আর তোমাকে যে অপমান করেছিল, তার নাম বল।' ভানু বললে 'না, আমি তো অপমানিত হতে পারি নি; সে আমাকে অপমান করতে চেয়ে পরাজিত হয়ে গেছে। তাকে আমি ক্ষমা করে বন্ধু বলেছি—তার সঙ্গে আমার শুধু বন্ধুত্ব। তোমারও বন্ধুত্বই তার প্রার্থনীয়। আর তার নাম? তা নাই বা শুনলে! শুনে তুমি সহ্য করতে পারবে না কারণ তুমি যে পুরুষ, তুমি যে স্বামী—আমি তোমার স্ত্রী! তোমার প্রতি হবে তার ভয় এবং তার প্রতি হবে তোমার ঈর্ষা—এ নিশ্চয়ই হবে। তার নাম শুনে আর কাজ নেই।' বলেই ভানু উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আর নয়, চল রাত হয়ে গেছে, আপা নিশ্চয় বকবেন।' আমি বাধা দিতে গিয়েও পারলুম না। সত্যিই তার তখনকার ভঙ্গীটুকু রাণীর চেয়েও যেন গৌরবময়, পদক্ষেপও যেন সে রাণীর মতোই গরবিনী, দেবীর মতো মহিমময়ী! ওর পিছনে চলতে চলতে আমার মন যেন কী এক সুখে ও দুঃখে ভরে উঠেছিল। কতদূর

এসে গাড়ী ডেকে বাড়ি এলুম। আপা কৌতুকভরে বললেন, 'ছুটিতে যাবে বলে আগে থাকতেই জোট করে সকালে রাঁধাবাড়া সেরে কাউকে না বলেই বেরিয়ে গেছে! ভয়—বুঝি আমরা কেউ পাছে সাথ নিই—নয়?' ভানু একটু হাসলে—সেই নারীর লজ্জায় মাধুর্যে রাঙা সলজ্জ হাসি। ওখান থেকে এসে এক বিজয়িনী নারী এক্ষণে গৃহস্থ—ঘরের লজ্জিতা বধূ! আমি মূক হয়ে গেলুম। আপা বললেন, 'খাবে এস, আমার ঘরে সবাই বসে আছে।'

খেতে গেলুম আমি, আনোয়ার ও দুলাভাই। আনোয়ার দুলা ভাই-এর ভাই, আমার বন্ধু। আপা খাওয়াতে এলেন। ভানু দরজার কাছ থেকে সব এগিয়ে দিচ্ছিল, দেখলুম। বললুম 'আপনি কেন কষ্ট করছেন, আপা? ওকেই দিতে বলেন না কেন?' আপা বললেন 'ও কি যায় নাকি আনোয়ারের সামনে?' আমি বললাম—'ওকে লুকাবার কোনই দরকার নেই ভানু?' উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে নীরবে চেয়ে জানাল, সে রাজী নয়। আর ভানু! আনোয়ারও চঞ্চল হয়ে বললে 'না, না, আমার সামনে আসবার কোন দরকার নেই, অহেতুক ওকে কেন বিরক্ত করছ!' কিন্তু দুলাভাই উল্লসিত হয়ে বললেন 'বটে' তুমি লুকিয়ে বেড়াবে ভানু-বিবি, আমাকে তুমি জ্বালিয়ে মার, এবারে দেখব দু-ভাইর সঙ্গে কি করে পার।' বলে পলায়মানা ভানুর হাত ধরে তিনি টেনে আনতে আনতে ভানুর ঘোমটা সরে গেল। রাহু-মুক্ত চাঁদের মতো তার শরম রঞ্জিত মুখে তখন ঈষৎ হাসির আভাস। আনোয়ারও চঞ্চল হয়ে উঠেছে! দেখলুম, ভানু আমার দিকে চেয়ে আনোয়ারকে স্মিতমুখে সালাম জানালে। নিঃশব্দে প্রত্যাভিবাদন করে আনোয়ার খাওয়ায় মন দিলে। দুলাভাই বললেন, 'কী বিবিসাহেবা, তোমার মুখ যে এখন একেবারে এঁটে গেল। বলছ না যে কিছুই।' ভ্রুভঙ্গি করে দীপ্ত গ্রীবা তুলে ভানু বললে 'ইনি আমার বন্ধু—বন্ধুকে কী বলব! আপনি আমায় জ্বালিয়ে খান, আমিও আপনাকে পুড়িয়ে তুলি!' খচ করে আমার বুকে বিঁধল ভানুর কথার সেই কেয়ার কাঁটা। আমি নতমুখে খেয়ে উঠে গেলুম। সারা রাত আমার বুকে বিঁধল—ওই কেয়ার কাঁটা! শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখলুম—ভানু দাঁড়িয়ে, হাতে একখানা চিঠি। সে বললে 'নিশ্চয় লুসীর চিঠি'। খুলে দেখলুম সত্যিই সে লিখেছে, তোমায় ভুলতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু ক্ষমা করতে পেরেছি। তোমার স্ত্রীকে সব বল, সে ক্ষমা করলে তার ক্ষমায় আমারও ক্ষমা তুমি পাবে। দেশে ফিরে গেছ অতীত পশ্চাতে ফেলে! তোমরা পুরুষ, চাও

বিস্মরণী ; আমরা নারী, চাই অতীতকে নিয়ে স্মৃতির বেদনায় তাকে মাধুর্য দিয়ে নব-নব কল্পনায় আনন্দ পেতে'।

আশ্চর্য হলুম ! দু-জন নারীরই মুখে একই কথা। আমি ভানুকে চিঠি দেখালুম। রাতের কেয়ার কাঁটা বেঁধার ব্যথা ক্ষমার প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে গেছে। ভানু নত হয়ে আমার বিশৃঙ্খল চুলের উপর তার স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে বলল 'তোমার দণ্ড লঘু হয়ে উঠল আমার কাছে। এবার বল, আমার বেলায় তুমি কি করবে ?' আমার মনে তখন কোথাও যেন গ্লানির যোগ ছিল না এতটুকুও। তাই বললাম 'তোমার ত অপরাধ নেই কিছুই, তুমি কবি — তুমি বিজয়িনী, তোমার একটা হয়ত খেয়াল, একটা ক্ষণিকের কল্পনাকে আরো রঙ দিয়ে আমার কাছে ব্যক্ত করেছ, এর বিচার আমি কী করব।' নিমেষের তরে ভানু একটু অন্যমনস্ক হল। পরে বললে 'তুমি স্বামী, জীবনের শ্রেষ্ঠ সাথী, তাই বলা প্রয়োজন মনে করেই আমি বলেছি। আজ যদি তুমি এটা সহজ ভাবে না নিয়ে অন্যভাবে বুঝতে, ঠিক আমিও উল্টোভাবে এর ব্যবহার করতুম। কিন্তু এখন আমরা দু-জনেই দু-জনের কাছে সহজ অ-ভিন্ন হয়ে হয়ে গেলুম, নয় কি ?' আমি বললাম 'হাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু লুসীর সঙ্গে যদি তোমার দেখা হত; কী করতে তুমি ?'

ভানু বললে, 'তার প্রতি ত আমার বিরাগ বা বিদ্বেষ নেই; বরঞ্চ আছে শুধু সহানুভূতি। সে-ও-তো মেয়ে-মানুষ। ও তোমাকে ক্ষমা করতে হয়তো পেরেছে, কিন্তু ভুলতে যে পারে নি, এটা যে আমায়ও বেদনা দিচ্ছে।' আমি বললাম 'ও দেশের মেয়েরা অনায়াসে ভুলে যাবে।' সিংহীর মতো গ্রীবা তুলে ভানু বললে, 'ও কথা কি করে বলো তুমি ! ওতে নারীর অপমান করা হয়, জান ? ওকে তুমি যে বেদনা দিয়ে এসেছ; তার সে বেদনা হয়তো জুড়াবে; কিন্তু ঘা সারবে না কোনোদিন ! ওর চিঠিটা কী করুণ; তুমি বুঝতে পার নি ?' আমি অনুতপ্ত হয়ে বললাম, 'আমি কী করতে পারি বল তুমি।' ও বললে 'কিছুই নয়; লুসীও করতে পারবে না কিছু ; আর তোমাকে ভুলবে না কোনদিনই, একদিন যে আনন্দের আঘাত ওকে বিকশিত করেছে, তারই [illegible] বেদনায় ও তোমাকে স্মরণ করবে চিরদিন। ওর চিঠিখানি তোমাকে [illegible] দিয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন —

[illegible] একদিন ফুল দিয়েছিল হায়,
[illegible] বিঁধে গেছে তার,

তবু সুন্দর, হাসিয়া তোমায়
করিনু নমস্কার !'

এ হচ্ছে নারীর চিরন্তনী কথা ! নিজের বেদনায় অপরকে নারী ম্লান করে না। লুসীর জন্য তোমার চিন্তা নেই; ও ঠিক থাক্‌বে বেঁচে ! তবে কখনও দেখা হলে তার সঙ্গে ভদ্রতা কি শিষ্টাচার দেখাতে চেয়ো না; ওর কাছে সহজ হয়ো, ও তোমাকে স্নিগ্ধ করবে।'

বিস্ময়ে ভানুর দিকে চাইলুম ! দেখলুম নারী-হৃদয়ের অজানা রহস্য তার শান্ত মুখে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

অস্ত্র

জাহানারা ইমাম

একপেট খিদে নিয়ে খুব দ্রুত পায়ে হাঁটছিল মফিজ, পেছনে ও পাশে তিনজ সহযোদ্ধা তাল রাখতে পারছিল না। রশীদ বলল, 'অত ঘোড়া ছুটাইছিস ক্যান ? একটু আস্তে হাঁট না।'

মনির সায় দিল, 'সারা দিন না-খাওয়া, তার উপর অমন ছুট, পা য্যান আর চলবার চায় না।'

মফিজ খেঁকিয়ে উঠল, 'হেই জইন্যই তো তরাতরি বাড়ি পৌছন দরকার একবার থামলে আর চলবার পারবি না। কোনমতে বাড়ি গিয়াই বারিন্দায় ধপাস—তারপর আর চিন্তা নাই। গরম গরম ভাত, ডাইল, ছোড মাছের চচ্চড়ি। না হয় আলু-বেগুনের তরকারি—'

মফিজকে শেষ করতে না দিয়েই আশেক হেসে বলে উঠল, 'মফিজটার খালি খাওনের চিন্তা।'

'ক্যান চিন্তা হইব না বল ? ইঞ্জিনে কয়লা সোমায়মত না দিলে ইঞ্জিন চলব ?'

এইসব কথাবার্তা, ঠাট্টা-তামাসার মধ্যেই ওরা বাড়ি পৌছে গেল। কিন্তু একি ? বাড়ি এমন অন্ধকার কেন ? সদর দরজা হাট করে খোলা, বাতি যেমন নেই ; কোথাও কোন শব্দও নেই। চারজনেরই বুক কেঁপে উঠল। মফিজ ভাঙা গলায় 'হায় হায় কি হইল ? বইন ভি বাঁইচা আছে তো ?' বলে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল। মনির তার জামা টেনে ধ'রে বলল, 'থাম, ভিতরে কেউ অ্যামবুশ করার জইন্য রইছে কি না, কে জানে। পজিশান ল।'

চারজনেই রাইফেল তাক ক'রে দাঁড়াল। মনির প্রথমে একটা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল। কোন সাড়াশব্দ নেই। মিনিট খানেক চুপ করে অপেক্ষা করার পর মফিজ চিৎকার করে ডাকল, 'ছবি, ছবিরণ, কালার মা—তোমরা গেলা কই ?'

তবু কোন সাড়াশব্দ নেই। তখন আশেক আর রশীদ রাইফেল তাক করা অবস্থাতেই সাবধানে পা টিপে টিপে বাড়ির দুই পাশ দিয়ে গেল, মফিজ সদর দরজার দিকে এগোল, মনির তার পেছনে কভার দেবার ভঙ্গিতে রাইফেল তুলে পা ফেলল। না নেই, বাড়িতে কোথাও কেউ নেই। না অ্যামবুশ-পাতা কোন শত্রু, না গরম ভাতের অন্নপূর্ণা ছবিরণ। ওরা চারজনে বাড়ির ভেতর ঢুকে উঠোনে দাঁড়িয়ে একে একে ছবিরণ আর কালার মার নাম ধ'রে ডেকে যেতে লাগল। বেশ খানিকক্ষণ পরে বাড়ির পেছনের দিকে কি রকম একটা শব্দ পাওয়া গেল। পা ফেলার আওয়াজের শব্দে কেমন একটা শপ শপ শব্দ। মফিজ আবার ডেকে উঠল, 'ছবি, কালার মা, কই গেছ তোমরা সব।' এবারে ছবির গলা শোনা গেল, 'ভাইজান, এই যে আমরা। রান্দাঘরে কুপি আছে ধরাও দিহি।'

মফিজ রান্নাঘরে গিয়ে প্রথমে পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালল, কুপিটা কোথায়, দেখে নেবার জন্য। দেখে কি, লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। হাঁড়ি পাতিল সব ছত্রখান। কুপি যে কোথায়, খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সে বেরিয়ে এসে আরেকটা কাঠি জ্বেলে বলল, 'কি রে, বাড়িতে মইষ সান্ধাইছিল নিহি? কুপি পাই না। তুই আইয়া খোঁজ।'

ভিজে কাপড়টায় গা মাথা আরো ভালো করে ঢেকে মাথা নিচু করে ছবিরণ উঠোন পেরিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। এতক্ষণে শপ শপ শব্দটার হদিস পাওয়া গেল। বাড়িতে তাহলে কেউ এসেছিল, হয় মিলিটারি নয় রাজাকার— এরা দু'জন ভয়ে পেছনের পুকুরে এতক্ষণ ধরে আত্মগোপন করেছিল, ওদের গলার স্বর পেয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু এ গ্রামে তো মিলিটারি রাজাকার নেই। তাহলে?

ছবিরণ কুপি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত মফিজ একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে যেতে লাগল। কুপি ধরিয়ে ছবিরণ বলল, 'কাপড়টা পাল্টাইয়া লই। তোমরা হাতমুখ ধুইয়া আসতে আসতে আমি চাইলে-ডালে খিচুড়ি নামাইয়া ফেলুম। খাওনের পরে সব শুইনো।'

রান্নাঘরটা ছবির শোবার ঘরও বটে। বেশ বড় ঘরটা। একপাশে রান্নার ব্যবস্থা। অন্য পাশে চৌকি, চৌকির ওপর চাটাই, বালিশ, দেয়ালে দড়িতে কয়েকটা কাপড়-জামা। কোণায় কয়েকটা নতুন মাটির হাঁড়ি বিড়ের ওপর বসানো, তার মধ্যে ওর যা কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

মফিজ বেরিয়ে গেল। ছবি ঘরের কোণায় গিয়ে ভিজে কাপড় পাল্টে ডাক-দিল, 'কালার মা, ও কালার মা।'

কালার মার ঘর ওদের বাড়ির ঠিক পেছনেই। হাঁক দিলে শোনা যায়। সেও ইতোমধ্যে ভিজে কাপড বদলে নিয়েছে। সে এখন রান্নাঘরে ঢুকে বলল, 'রান্ধনের কি অইব ?'

'তুমি তাড়াতাড়ি কয়টা আলু আর পিঁয়াজ কুটো। আমি চাইলে-ডাইলে খিচুড়ি বসাযা দিই। দুইডা ডিম আছে না ? ঐ ডিম আর আলু পিঁয়াজ খিচুড়ির মইধ্যে দিয়া দিমু। তরাতরি খাওন দরকার। ভাইজানের তো আবার রাক্ষসের লাহান খিদা ! বলে হেসে ফেলল ছবি।

খাওয়ার পর সব শুনল মফিজরা। বিকেলে গা ধোয়ার জন্য পেছনের পুকুরে গিয়েছিল ছবি আর কালার মা, এমন সময় শোনে তাদের বাড়ির মধ্যে অচেনা গলার হাঁকডাক। ওরা বুঝে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে পানিতে নেমে উল্টোদিকের পাড়ে, যেখানে গাছ-গাছলির ডালপাতা ঘন হয়ে পানির ওপর ঝুলে থাকে, সেইখানে ঢুকে মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে কোনমতে নাক উঁচিয়ে লুকিয়েছিল।

রশীদ জিজ্ঞেস করল, 'কারা অইছিল, বুজবার পারছিলা ?'

'না, আমরা তো দেখি নাই, গলা শুইন্যাই পানির মধ্যে সান্ধাইছি। তয় উর্দু কথাও হুনছি। দুইটা গুলির শব্দ হুনছি।'

আশেক চিন্তিত গলায় বলল, 'ঠিক বুজা যাইতাছে না। এই গেরামে তো কুনো রেজাকার নাই, মেলেটিরিও আইয়ে নাই। তাইলে ?'

'মতি ভাইয়ের কাছে যাই, উনি নিশ্চয় কুনো হদিশ দেবার পারবেন।'

মতিউর রহমান ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। তাঁর বাড়িটাই বলতে গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। এ গ্রামে এখনো কোন মিলিটারির হামলা হয়নি, কোন রাজাকারও নেই, মুক্তিযোদ্ধারা স্বচ্ছন্দে রাইফেল, গ্রেনেড প্রকাশ্যে হাতে ঝুলিয়ে দূরে অপারেশান করতে বেরিয়ে যায়।

মতিউর রহমান দহলিজঘরেই বসে ছিলেন, তাঁর চারপাশে অনেক লোক। মফিজরা চারজনে যেতেই তিনি বললেন, 'ও মফিজ মিয়া, এই গেরামে থাইকা আর অপারেশনে যাওন চলব না। বেতলডিহির ব্রিজের কাছে মিলিটারি আইয়া ক্যাম্প করছে। গেল মাসে তোমরা যে ব্রিজটার ওই পাশে খানিকটা ধসাইছিলা, হেইডা তারা মেরামতের কামে নামছে। বাঙ্কারও বানাইব। এইসব কামের জন্য কামলা দরকার। তল্লাটের সব চ্যারম্যানের কাছে তলব

আইসা গেছে নিজের নিজের ইউনিয়ন থেইকা কামলা পাঠাইতে হইব ব্যাগার দেওনের জইন্ত। আমার ইউনিয়নে নয়টা গেরাম একেক গেরাম থেইকা দশজন কইরা লোক বাইছা পাঠাইতে অইব। দেখ দিহি কি মুসিবত!'

'বেতলডিহি তো এহান থাইকা পাঁচ মাইল দূরে। অদ্দুর থাইকা মেলেটারি নাকি আইজ গেরামে আইছিল?'

'হ' ঐ তলব লইয়া। একজন কেপ্টেন আর দশজন সইন্য, সঙ্গে বেতল-ডিহিরই কয়েকজন রেজাকার। আর আমার আপিসে আইসা কামলা পাঠানের সব কথা কইয়া ফিরত গেছে গা।'

'না মতি ভাই অরা সোজা ফিরত যায় নাই। আমাদের বাড়ির ভিতর ঢুকছিল।'

মতিউর রহমান অবাক হলেন 'এল কি? কই শুনি নাই তো। খুইলা বল দিহি পুরা ঘটনাডা।'

মফিজ ছবিরণের মুখে যা যা শুনেছিল, সব বলল। মতিউর রহমান চুপ করে থেকে বললেন, অরা তাইলে আবার আইব। তোমাদের অখন কাম হইব সগ্‌গল মুক্তিযুদ্ধারা এ গেরাম ছাইডা অন্যখানে গিয়া নতুন ক্যাম্প কর। এই হানে থাকা আর নিরাপদ না তোমাগোর জইন্য।'

এইসব কথাবার্তার সময় আরো দু'চারজন গ্রামবাসী এসে খবর দিল মিলিটারিদের দলটা ফেরত যাবার পথে তাদের কয়েক জনের বাড়িতে ঢুকেছিল, সব বাড়ি থেকেই মুরগী, গাছের লাউ, বেগুন, কলা—এসব নিয়ে গেছে।

মতিউর রহমান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, 'তোমাগো সগ্‌গল বাড়ির মাইয়াদেরকে খুব পর্দা পুশিদার মইদ্দে রাইখো। অগোর খাসলত বড় খারাপ। কতো যে শুনছি—আল্লা না করুন আমাগোর গেরামে হেই রকম কিছু হউক।'

বাড়ি ফিরে মফিজ ছবিরণ আর কালার মাকে সব কথা জানাল।

মফিজরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে শুনে ছবিরণ কাঁদতে শুরু করল। মফিজ বিব্রত হয়ে বলতে লাগল, 'আরে, আরে, কান্দনের কি আছে? বেশি দূর তো যামু না, এই তো দুই তিনটা গেরাম পরেই। কালার মা তর ঘরে রাইতে শুইব, কালা বারিন্দায় শুইব। ডরের কিছু নাই।'

'না ভাইজান, আমারে তোমাগো সঙ্গে লইয়া যাও।'

'কি যে কস্। তুই মাইয়ামানুষ, তরে সঙ্গে লইয়া কই যামু?'

'ক্যান, তোমরা যেহানে থাকবা,সেই হানে। আমি তোমাগোর ভাত

রান্দবো, কাপড় ধুয়া দিব, ঘর সাফা করব।'

'হা রে পাগলি, আমাগোর থাকনের কি কোন ঠিক আছে? ঘরে থাকব না গাছতলায় থাকব তা আমরাও জানি না। শুন, তর কুনো ভয় নাই। গেরামে আর মানুষ নাই? আমি মতি ভাই, বাসেত চাচা আরো ক'জনারে কয়া যামু। তর খোঁজখবর নিব! বাজার সদাই কালা কইরা দিব। তারপর একটু হেসে রসিকতা করে বলে, 'আমরা গ্যালে তরই তো সুবিদা। তরে আর রান্দাঘরে শুইতে হইব না। নিজের ঘরেই আরামে থাকতে পারবি।'

এত কথার পরও ছবিরণের ফোঁপানি থামে না। শেষে সে বলল, 'তয় আমারে একখানা অস্ত্র দিয়া যান।'

দারুণভাবে চমকে যায় মফিজ, 'অস্ত্র! অস্ত্র দিয়া তুই কি করবি?'

'ক্যান, মেলেটারি আইলে মারুম অগোরে?'

দুঃখের হাসি হেসে মফিজ বলে, 'হায়রে আমার বেবুঝ বইনডি! এইরকম একখানা মান্ধাতা আমলের পুরানা রাইফেল দিয়া তুই পাকিস্তানী মিলিটারি মারবি! তুই জানস, স্টেনগানের একটা ব্রাশফায়ারে এক মিনিটে বিশ-তিরিশজন লোক মাইরা ফালাইতে পারে অরা? ওইসব পাগলামি ছাড, চুপ-চাপ থাকবি, বেশি বাইরাবি না। নামাজ-দোয়া-দরুদ পডবি—দেখবি কুনো বালা মুসিবত আইব না। আমি মাঝে মইধ্যে রাইতের বেলা আইসা দেইখা যামু।'

দুই

'অস্ত্র! একখান অস্ত্র আমার চাই-ই। ভাইজান, তোমারে মুখ ফুইটা কইতে পারি নাই, মেলেটারি মারণের জইন্য অস্ত্র চাই নাই, মেলেটারিগ হাত থনে নিজের ইজ্জত বাঁচাইবার জইন্য অস্ত্র চাইছিলাম। অগোর হাতে পডনের আগে নিজের জানটা তো লইতে পারতাম রাইফেল দিয়া! অহন আমি কি করি? আমার ইজ্জত গেল, কিন্তু পরানডা তো যাইতেছে না। অরা আমারে নষ্ট করছে, আমি এখন কি দিয়া এই শরীলডা নষ্ট করি!'

পুকুরে পানিতে ঘুরে ঘুরে ছবিরণ সাঁতার কাটছিল আর বিড় বিড় করে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছিল। কালার মা খুঁজতে খুঁজতে পুকুরপাড়ে এসে গালে হাত দিলে, 'অমা, কি হইবে গো! জ্বর গায়ে পানির মইধ্যে? মরবার

চাও নিহি ?'

পানি থেকে উঠে এল ছবিরণ, অস্বাভাবিক গলায় বলল, 'মা গো কালার মা, ঐ মেলেটারিগ না মাইরা আমি কিছুতেই মরব না।'

তার লাল চোখের দিকে তাকিয়ে কালার মা মনে মনে প্রমাদ গুনলো। গত পরশু রাতে তিনজন পাকিস্তানী সৈন্য একজন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে এসে মেয়েটাকে যা নয়-তাই করে গেছে। সেই থেকে একেবারে পাগল-পারা হয়ে রয়েছে ছবিরণ। দিনের মধ্যে সাত-আটবার পুকুরে নেমে গোসল করতে করতে গতকাল তার জ্বর উঠে গেছে। তবু তাকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না। গত পরশুর এই ঘটনার পর কালার মা ছবিরণ আর কালাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ছবিরণকে নড়ানো যায় নি। সে পালাতে পারে। কিন্তু আজও যে আসবে না, তার নিশ্চয়তা কি? পালাবে না, সে ঐ পাকিস্তানী সৈন্য কয়টাকে মারবে, তারপর নিজে মরবে। কালার মা এগুলোকে পাগলের প্রলাপ বলেই ধরে নিয়েছে। এমন ঘটনার পর এমন কোন মেয়ে আছে যে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে না? গতকাল দিনের বেলা কালার মা চেয়ারম্যান সাহেবকে গিয়ে সব বলেছে। তিনি ছবিরণকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছিলেন, ছবিরণ তাও যাবে না। কালার মা তাকে এই অবস্থায় ফেলে যেতে পারছে না, আবার এ বাড়িতে থাকতেও ভয় পাচ্ছে। তার কপাল ভালো, গত পরশু সন্ধ্যার মুখে ওই সময়টা সে খানিকক্ষণের জন্য নিজের বাড়িতে গিয়েছিল, তাই রক্ষা পেয়ে গেছে। নইলে ছবিরণের সঙ্গে থাকলে, তারও রেহাই মিলত না।

গতরাত্রে শয়তানগুলো আসেনি, তাও কালার মা সারারাতই জেগেছিল, ওদের সাড়া পেলেই যাতে পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে পারে। কিন্তু আজও যে আসবে না, তার নিশ্চয়তা কি? বরঞ্চ, আজ রাতে আসার সম্ভাবনাই বেশি। পরশু তিনজন এসেছিল, আজ কতোজনকে নিয়ে আসবে, কে জানে!

ছবিরণের কথার জবাবে কালার মা বলল; 'কি যে বল আর না বল তার দিশাভিশা নাই। তুমি অগোরে মারবা কি দিয়া? তুমার কাছে কী অস্ত্র আছে?'

'আছে, আছে, বড় ধারাল অস্ত্র আছে আমার কাছে। আগে দেখি নাই, আগে বুঝি নাই, এখন দেখতাছি কি জব্বর ধারাল অস্ত্র! আগোর অনেক কয়টারে খতম করতে পারুম! আহো, কালার মা বাড়িত আহো,

তোমারে অহনই মেলা করণ লাগব।'

'কালার মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কই মেলা করুম ?'

'ভাইজানরা যেহানে আছে হেই গেরামে ! তুমি গিয়া কবা — তারা আট-দশজন য্যান পরশু রাইতে এই গেরামে আসে। পরশু রাতে আমার বাড়িতে জেয়াফত খাইতে আইব কয়েকজনা পাকিস্তানী সইন্য আর কয়েকজনা রেজাকার। সেই সময় ভাইজানরা য্যান আইয়া অই কুত্তাগুলানরে মারে।'

কালার মা কিছুই বুঝতে পারছে না. সে ভাবল ছবিরণের মাথাটা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে। সে ছবিরণকে ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে এল। ভিজে কাপড় বদলে একটা শুকনো শাড়ি পরিয়ে চৌকিতে বসিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, বইনডি, একটু সুস্থির হও। কপালে এই ছিল, কি আর করবা। আল্লার কাছে কান্দাকাটি কর, দোয়াকালাম পড়, আল্লাই তোমার মনে শান্তি দিব।'

ছবিরণ এক ঝটকায় মাথা সরিয়ে নিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, আবোল তাবোল কথা কইয়ো না কালার মা। আমার ভাইরা যেহানে না খায়া, না-ঘুমায়া যুদ্ধ করতাছে, আমি ক্যান সেখানে নিকম্মা বইসা বইসা কান্দাকাটি করুম ? আমি এখন হাতে অস্ত্র পাইয়া গেছি। ভাইরা রাইফেল, গেরনেড দিয়া যুদ্ধ কইরা খানসেনা মারতাছে, আমিও আমার অস্ত্র দিয়া যুদ্ধ কইরা ঐ হারামীগো মারুম। তুমি অক্ষণি মেলা কর কালার মা। সময় বেশি নাই। দেরি করলে যুদ্ধ ভণ্ডুল হইয়া যাইব।

রমনা পার্কে

নীলিমা ইব্রাহিম

অবকাশের মুহূর্ত জীবনে কমই আসে, বিশেষ ক'রে নাগরিক জীবনে। আজকের দিনের সংসারে কি ছেলে, কি মেয়ে সবাই যেন একটা বিরাট যন্ত্রের অংশ বিশেষ। সকাল থেকে তাই ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরবার বিরাম নেই। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, বন্ধু-বান্ধবের সুখে দুঃখে আনন্দ প্রকাশ ও সহানুভূতির প্রয়োজন আছে। আর ক'রবার মত কিছু না থাকলে সমাজসেবা আর সাহিত্যসভায় যোগদান ক'রবার তো আর বাধা নেই। 'তাই কর্মব্যস্ততারও সীমা নেই।

এমনিই একঘেয়ে যান্ত্রিক পরিবেশে একদিন সুযোগ এলো বেড়াতে যাবার। বিবাহিত জীবনের কুড়ি বছর পেরিয়ে যাবার পর যদি স্বামী এসে বলেন, ওগো চলো, আজ তোমাকে নিয়ে একটু পার্কে বেড়িয়ে আসি, তাহ'লে? তাহ'লে অবশ্য এ অনুভূতির কথা এখনকার ছেলে-মেয়েরা বুঝবে না। কারণ এ প্রেমের আবেগ ও তার তরঙ্গাঘাতে হৃদয়ের উত্থান-পতনের উদ্দামতা একমাত্র কুড়ি বছরের বিবাহিতা স্ত্রীই জানেন। দেরি করতে আর মন চাইলো না কারণ যদি মতামত ঘুরে যায়। বড় মেয়েকে আলমারির চাবি দিয়ে আর বাবুর্চিকে যথারীতি উপদেশ ও বারকয়েক তার পুনরাবৃত্তি করিয়ে কোনোমতে একখানা টাঙ্গাইল শাড়ি জড়িয়ে গাড়িতে উঠলাম। ইচ্ছে ছিলো একটু স্নো-পাউডার মাখি কিন্তু মেয়েগুলো কিছুতেই পেছন ছাড়লো না। স্বামী কুড়ি বছর আগের তাঁর কুমারদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন— ওগো, একি শাড়ি পরলে? লোকে দেখলে বলবে কি বলতো? ভাববে, আমি তোমায় কাপড়-চোপড় কিনে দিই না? স্বামীসোহাগে গলে গিয়ে বললাম—কি যে বলো, তুমি আমাকে কি দাও আর না দাও তা সবাই জানে। মনে মনে ভাবলাম, ভালো শাড়ি একটা পরতে চেয়েছিলাম কিন্তু মেজ মেয়েটা প্রশ্ন করলে—

মা, যাচ্ছ কোথায় ? ওকে বললাম—'ডাক্তারের বাড়ি চোখ দেখাতে।' এরপর ভালো শাড়ি পরি কোন মুখে ? তাছাড়া মন মাঝেমাঝে চাইলেও কেমন যেন একটু লজ্জা লজ্জাও করে।

গাড়ীতে বসেছি। গাড়ি সবে স্টার্ট নিয়ে একটু এগিয়েছে হঠাৎ স্বামী বলেন—'ড্রাইভার রোখো রোখো, গাড়ী ঘোরাও।' মুখ শুকিয়ে ব'ললাম 'যাবে না' ? হেসে হাতখানা আমার পিঠে রেখে বলেন, 'নিশ্চয়ই যাবো,একটা জিনিস ফেলে এসেছি।' বাড়ীর কাছে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন —'iron safe এর চাবিটা বাইরেই পড়ে আছে।' চাবি নিয়ে ফিরে এসে বসলেন। কুমারী মেয়ের মত গাল একটু ফুলে উঠতে চাইলো—আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার মুখেও iron safe-এর চাবির চিন্তা ? দূরদর্শী ব্যাপারটা বুঝলেন। হেসে বললেন—আরে আমার কি ? তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই তো আমার সব প্রচেষ্টা, সব শ্রম, সব সার্থকতা।'

যাক্ শেষ পর্যন্ত রমনা পার্কে এলাম তাহ'লে। সন্ধ্যের রোদ তখন গাছের আগায় উঠে সেখানে সোনা ছড়াচ্ছে। যেন আমার মনেরই প্রতিচ্ছবি। দেহের দিন গত হ'তে চলেছে কিন্তু মনে তবুও এমনি ক'রে কে যেন মাঝে মাঝে সোনা ছড়িয়ে দিয়ে হৃদয়টাকে চঞ্চল ক'রে তোলে। খুশীতে মনটা ভরে গেল। নিজেকে যেন ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম পায়ের বাতের ব্যথাটার কথা। দ্রুত এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। অপূর্ব ফুলের সমারোহে চারিদিকে যেন যৌবনের মহোৎসব। ওদিকে কয়েকটা পাখি ও পশুকে কেন্দ্র ক'রে ছেলে-মেয়ের ঝাঁক যেন পায়রার ঝাঁকের মত বকবকম শুরু করেছে। আত্মগোপন করা হ'ল না। ওখানেই বাচ্চাকাচ্চাসহ চোখে পড়লো আমাদের ছোটবেলার মীনা আপাকে। দুলাহ্‌ভাইকে নিয়ে নাতি-নাতনীসহ বেড়াতে এসেছেন, কুশল প্রশ্ন হ'ল। আপার পাতলা শাড়ীটার নীচ দিয়ে দেখলাম মাথায় একটা বড় রক্তগোলাপ গোঁজা। হেসে মুখটা ফিরিয়ে নিলাম। না, দিন তাহ'লে একেবারে ফুরিয়ে যায় নি। ইচ্ছে ক'রেই পাশ কাটালাম। আজকে আর ওদের মাঝখানে হাইফেনের মত দাঁড়াতে ইচ্ছে ক'রলো না। তাছাড়া আজকের সন্ধ্যেটা কোনমতেই যেন ফুরিয়ে যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ চোখে পড়লো একটি ছেলে ক্যামেরা নিয়ে ফটো তুলছে দু'টি মেয়ের। মেয়ে দু'টি ফুলের ঝোপে নানাভাবে মুখভঙ্গি করে ছবি তুলছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেশ ও সমাজ এমন এগিয়েছে তা তো জানি না ! কারণ আমার মত আরো

অনেকে, আমার চেয়ে ছোট ও বড় সবাই হাঁ করে ওখানে ভিড় জমিয়েছে। কি নির্লজ্জ রে বাবা। ইডেন গার্ডেনের অর্ধনগ্ন অ্যাংলোকেও লজ্জা দিচ্ছে! ফটো তুলবার আর জায়গা পেলে না। ভিড় থেকে গুঞ্জন শুনলাম—এরা সিনেমার নায়িকা প্রার্থিনী হয়ে ছবি পাঠাবেন, তাই বিভিন্ন ভঙ্গীতে ছবি তুলছেন কোম্পানীকে পাঠাবার জন্তে। মনে মনে ভাবলাম এরাই আবার ফিল্‌মে কেউ হবেন শ্রীদুর্গা, আবার কেউবা পল্লীবধূ হ'য়ে কলসীকাঁখে পুকুরে যাবেন পানি আনতে। দ্রুত পায়ে জায়গাটুকু পার হ'লাম। একটি বাচ্চা ছেলে ওর বাবার জামা ধরে টানছে চীনেবাদাম খাবে। ভদ্রলোক দিতে নারাজ, তাই বললেন—ও খেলে অসুখ ক'রবে। ভদ্রলোক যত জোরে হেঁটে চলেছেন ছেলেকে নিয়ে, বাদামওয়ালা তার চেয়েও জোরে ছুটছে আর হাঁকছে—'গরম চীনাবাদাম, টাটকা ভাজা, গরম ভাজা চী—না বাদাম।'

দু'জনে প্রাণপণে একটু নির্জনতা চাইছিলাম। কিন্তু এ যেন ডেমরার হাট, তিলমাত্র জায়গা খালি নেই, অন্ততঃ বসবার উপযোগী। বললুম—লোকে এখানে আসে কেন? ম্লান হেসে নিরুৎসাহ সাথী বলেন—কে জানে, কেন আসে। এতোক্ষণে পায়ের ব্যথাটা টের পাচ্ছি। ব'ললাম—চলো যেখানেই হোক বসে পড়ি। পডলামও; কারণ মন প্রগতি ও অগ্রগতি চাইলেও পদযুগল সনাতন পন্থী হ'যে শিকড গাডতে চাইছে।

বসে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। দূরে বসে আছে এক দম্পতি। পুরুষের বয়স কমপক্ষে তিরিশ আর মেয়েটির বয়স খুব বেশি হ'লে ষোল। তেল জবজবে মাথায় ঘোমটাটা তৈলসিক্ত, পরণে একখানা পাটের সিল্কের শাড়ী। নাকের বড ওপেল পাথরের নাকছাবিটা সবার আগে চোখে পড়ে। স্বামী বেশ জোরে জোরেই বোধ হয় আমাদের শুনিয়েই সান্ত্বনা দিচ্ছে—'তুই খামাকা কান্দাকাটা করছ্‌। কয়ডা দিন গ্যালেই তহন বুঝবি শহর বাজারে কত মজার জিনিস আছে। আইজ তুই রমনা বাগিচা দেখলি কালই তরে বাইসকোপ দেহামু'। তাকিয়ে দেখলাম নববধূর মুখে আষাঢ়ের মেঘ এবং শহর বাজারের এই মজার প্রতি একটা চরম তাচ্ছিল্যের ভাবই ফুটে উঠেছে। অকস্মাৎ অস্ফুটে উচ্চারণ করলাম 'বাঙ্গাল কোথাকার'। সঙ্গী আহত হ'লেন কারণ আমার মুখে যখন তখন উচ্চারিত 'বাঙ্গাল' শব্দে তিনি ব্যথা পান। লজ্জা পেয়ে বললাম—এবারে অন্য কোথাও গিয়ে বসি চলো। হেসে বললেন সেখানেও তো বাঙ্গাল সাথে যাবে। বললাম 'তা যায় যাক, এ বাঙ্গাল

ধোপায় ধোওয়া।' লেকটা ঘুরে গিয়ে ওদিকের নির্জন বেঞ্চে বসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নিরিবিলি বসে একটু গল্প করবো, কিন্তু মনের দুর্বলতার খবর পেয়ে বাদামওয়ালা পাগল করে তুললো। হাত বাড়িয়ে দু'আনার বাদাম কিনল। বললাম 'এ বাদামগুলো কি হবে'? উত্তর এলো 'না কিনলে ও পেছন ছাড়বে না।' বাদাম খেতে খেতে গল্প শুরু করলাম। আলাপ চললো। হঠাৎ খেয়াল হ'ল সন্ধ্যা কেটে রাত হয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় লেকের জল ঝিকমিক করছে। বুকে তার ফুটে আছে অসংখ্য কুমুদী। দয়িতকে কাছে পেয়ে এতক্ষণে পূর্ণতা পেয়েছে ওরা। মনটা ভরে গেল। ভাবলাম এবার থেকে প্রায়ই এখানে আসবো আমরা। মনের ভাবালুতায় আলাপের খেই কেটে যায়। হঠাৎ অভিমান-হত কণ্ঠ কানে আসে—'কই, তুমি তো কথা বলছো না'। হেসে হাত বাড়িয়ে ওর হাত খানা স্পর্শ করি। আবেগভরে হাত খানা টেনে নিয়ে বললেন—'ঠিক তাহ'লে চার হন্দরেই হবে কি বলো? আর যদি টান পড়ে, পরে আনিয়ে নেবো কেমন?' ওর হাতের ভেতর হাতখানা আমার ঘামতে থাকে, হয়ত বা কেঁপেও উঠে। বলেন—'বড্ড দুর্বল হয়ে গেছো। চলো বাড়ি ফিরে আজ blood pressure-টাও একটু দেখে দেবো। একটা nerve tonic-ও খেতে হবে কিছুদিন। পেছনে গাছতলায় চোখ পড়ে আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় এক যুবকের মুখ তার সঙ্গিনীর ওষ্ঠ স্পর্শ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওর দৃষ্টিও আমাকে অনুসরণ ক'রলো। চলো এখান থেকে উঠি, বললেন—'না বেশ লাগছে। বোস আর একটু। রোজ রোজ তো আর বেরুবার অবকাশ হয় না। তাছাড়া ওসব দেখে বিরক্ত হচ্ছ কেন? বটানিক্যাল গার্ডেন আর ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গাপাড়ের মুহূর্তগুলো কি ভুলে গেলে?' দেহের রক্ত দ্রুত সঞ্চারিত হয়। কাছে একটু সরে যাই, তিনিও কাছে এগিয়ে আসেন। বলেন—'মনে পড়ে না তোমার সেদিনের কথা'? মাথা নেড়ে বলি—'পড়ে বৈকি। আচ্ছা ঐ দিনগুলো যদি ফুরিয়ে না যেতো তাহলে কি ভালই হতো না'? পিঠে হাত রেখে বলেন 'তাই কি হয়? শরীর পুলকিত হয়ে উঠে। এ যেন সেই কুমারী দেহে প্রথম পুরুষ স্পর্শের অনুভূতি।

চেঁচামেচিতে পেছনে তাকাই। প্রেমের অভিনয় এবার অভিনয় ছেড়ে বাস্তবে রূপায়িত হবার পথ ধরেছে। উঠে এলাম দু'জনে। আবার এপারে ফিরে এলাম কলকোলাহলের মধ্যে। একটি ছেলে মাকে বলছে—বাড়ি চলো না মা। খিদে পেয়েছে। আমি ঘুমুবো। দ্রুত পা চালিয়ে বললাম, বাড়ি

চলো. বাবলু বোধ হয় নীচের ঘরেই ঘুমিয়ে গেছে, এখন না ফিরলে বুলবুলের আজ খাওয়াই হবে না'। বললেন—'থাক না, একদিন না হয় অনিয়ম হ'লই'। আমার মন কিন্তু ওদের কথা মনে পড়ায় অস্থির হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি পার্কের বাইরে যাবার পথ ধরলাম। দূর থেকে দেখলাম প্যারাম্বুলেটারের সামনে বসে আছে এক কৃষ্ণাঙ্গী নারী আর তার মাথায় একটা সিজন ফ্লাওয়ার পরিয়ে দিচ্ছে আমার দেহাতী ড্রাইভার। ওর শার্টটা টেনে ধরলাম, বললাম, 'দাঁডাও ওর ফুল পরানোটা হয়ে যাক।' কিন্তু ড্রাইভারের দৃষ্টি তো! আমাদের দেখে দৌড়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ালো। গড়িয়ে পড়া ফুলটা আয়া তুলে নিয়ে বাচ্চাটার হাতে দিলো। তারপর আর জানি না। গাড়িতে উঠে দেখলাম উনি পকেটে হাত দিচ্ছেন। বললাম, কি হলো? হেসে বললেন—না, চাবিটা ঠিকই আছে।

নাগমোতির হাটে

রাবেয়া খাতুন

লালে নীলে ছোপ ছোপ শেষ বেলার লঞ্চটা বড়ো নদী থেকে যখনি খালে ঢোকে, ঠিক টের পায় সারা। মাঝে একটা নতুন 'ওঠা কোণচে জমি—সাপের চর। কে জানে কেন এমন নাম। গাঁও-গেরামে মানুষ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সাপও। দিনে অন্তত দু'বার ওদের সঙ্গে দেখা হয় সবার। মজা পুকুরে নাইতে গিযে। বৈরাগীর ভিটার শাক তুলতে গিয়ে। একবার তো বুঝতে না পেরে একটার গায়ে হাতই দিয়ে ফেলেছিল। কি জানি কেন দুধবরণ সরীসৃপটা ফণা তুলে রুখে দাঁড়াল না। এঁকেবেঁকে চলে গেলো আরও নিবিড় ঝোপের দিকে। আচ্ছা ওরা কি মানুষের দুঃখ বোঝে? বুঝতে পেরেছিলো খারকন পাতা না সংগ্রহ করতে পারলে ভাত খেতে হতো শুধু নুন মরিচ দিয়ে।

মজা পুকুরে কবে মুক্তা পাওযা যেতো কে জানে! ছোটো ভাই-বোনদের সঙ্গে সারা অনেক সকাল দুপুর কাটিয়েছে মুক্তা খুঁজে। দু'চারটা ঝিনুক জুটেছে বড়োজোর। তবে হাঁ শোল-গজারের পোনা উঠেছে গামছায। লালচে ছোটো ছোটো মাছগুলো কি যে সোয়াদের। ঝাঁক ধরে চলা পোনাদের সঙ্গে যেমন ওদের মা থাকে তেমনি পিছে পিছে ঘোরে জলজ সাপেরা। ওরাও কখনো কিছু করে নি সারাকে। গরিবের দুঃখ হয়তো বোঝে। কিন্তু পাড়া-পড়শি মানুষেরা যেন কেমন। সে সন্ধ্যায় হাট থেকে বাবা চাল নিয়ে ফিরতে পারে না, নির্জলা উপোসে কাটাতে হয়। শরিকরাও খোঁজ নিতে আসে না চারটি নাবালক সন্তান নিয়ে কি খেলো পল্টু মৃধা। অবিশ্যি তাদেরও সব সময় দোষ দিতে পারে না সারা। ভীষণ আলসে আর বদমেজাজী তার বাবা। গোটা বছর যার ঘরে অভাব, কে তাকে রোজ দেখবে। গ্রামের লোক তো দূরের কথা, মা-ই-তো টিকতে পারলো না শেষ পর্যন্ত।

বাবা নাকি কবে পল্টনে নাম লিখিয়েছিল। লম্বা চওড়া সেই যুবক বাবাকে তার মনে নেই কিন্তু আবছা মনে আছে সচ্ছল দিনের কথা। বাড়িতে গোরু না থাকলেও বাজার থেকে এক লোটা দুধ আসত। হাটের সন্ধ্যায় বড়ো মাছ। কুপির আলোয় মা সঙ্গে সঙ্গে বসত মাছ ভাজতে। কম কম তেলে, বেশি বেশি মশলায় ভাজা সেই ঘ্রাণ এখনো সে অনুভব করতে পারে। মা যেমন চটপটে বাবা তেমনি অলস। পল্টনের পরিশ্রম সইল না। পৈতৃক জমি-জমায় খাটাখাটনি করলে অন্তত মোটা ভাত কাপড়ের টান হতো না। বাবা সেদিকে উদাসীন, একটার পর একটা ক্ষেত বেহাত দিয়ে, পাড়ার বাংলা ঘরে তাস খেলে, আশেপাশের গ্রামের যাত্রা, জারী, কবিগান দেখেই কাটিয়ে দিলো কয়েকটা বছর। এর ভেতর মা'র কোলে এলো দু'হালি সন্তান। চারটা মরে বাকি চারটাও যখন রোগে, অনাহারে মরো মরো মা তখন ঘোমটার আঁচল কোমরে বেঁধে ঝগড়া শুরু করল। বাবার সেই দশাসই শরীর ভেঙে দ-এর মতো। চোখ বসা। গলার স্বর কর্কশ ভাঙা। অতি মাত্রায় রাত জাগার ফল। দিনটা তো মানুষের কাজের সময়। বাবা তখন হাঁ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। রাগে দুঃখে মা যখন ওদের এক সঙ্গে পাট খড়ি দিয়ে পিটায়, চারজন কাঁদে দিগ্-দিগন্ত ফাটিয়ে, তখনো বাবা জাগে না। যদি বা জাগে অশান্তি বাড়ে দ্বিগুণ। হাতের কাছে যাই পায় মার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রূপকথার রাক্ষসের মতো বিকট মুখ করে চেঁচায়—অয় মাগী আর যুদি চিল্লাস, হাড্ডি মাংস এক কইরা ছাইড়া দিমু কলম। থাকতে হইলে মাটি কামড়াযা থাকবি, নাইলে যাবিগা যেখানে মর্জি।

—যামুইগা।

—যাবিই তো। তুই কি সতী না ভালো নারী।

—যার সোয়ামী ভালো না সে ভালো হইবো কেমুন কইরা। ভাত কাপুর যুদি চাইলেই খারাপ হয়, তয় আমি তো খরাপই। কিন্তু অসতীক কইওনা।

—একশ বার কমু। সাপের চরের হান্নানাইনা ক্যান আসে বারে বারে? তুই মনে করস আমি দুধের পেদা কিছু বুঝি না। বাবড়ি চুলে পাকন ধরলো কি বাতাসে। সব বুঝি। তর গাও গতর অখনো টাট্‌কা। অভাবের কামুড় খাযাও টাট্‌কা।

কি জানি কি রহস্য কিংবা শক্ত কামড় থাকতো বাবার এই সব কথায়। কোমরে বাঁধা আঁচল শিথিল হযে চোখে উঠত। নাঁকী নাঁকী গলায়

কাঁদত আর কথা বলত, আমি ভালাই আছিলামগো। ভেজাল ছাড়া দুধের মতন খাঁটিই আছিলাম। তুমি সোয়ামী আমারে খাইবা বুঝবার পারতাছি। বুঝবার পারতাছি এইটাই আমার কপালের লিখন।

এর কয়েক দিন পরই মা যেন সত্যি সত্যি কোথায় চলে গেলো। নানা বাড়ি না, খালার বাড়ি না। কেউ বললে, 'স্লিপ কাটা' ব্যবসায়ী সাপের চরের হান্নানের ঘরে গিয়ে উঠেছে। কেউ বললে, লঞ্চে চড়ে গেছে ষোল মাইল দূরের ঢাকা শহরে। ওখানে নাকি পয়সার অভাব নেই। কাজের অভাব নেই। তাই যদি হয় তবে মা কখনো না কখনো নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। বাবার অমানুষিক আশ্রয় থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে তাদের চার ভাই-বোনকে।

গাজীর খাল দিয়ে রোজ কম করে হলেও ঢাকা থেকে লঞ্চ আসে আট দশটা। সকাল থেকে বিকেল অবধি সারার ঘরে নানা কাজের বোঝা। খুদ-জাউ যাই হোক কিছু একটা নামাতে হয় 'আখা' থেকে। যেদিন তাও জোটে না নানারকম শাক পাতা দিয়ে শুধু একটা ঘাঁটা করে। পাতে পাতে সেই পদার্থ বেড়ে দিলে ভীষণ রাগে বাবা চিৎকার করে। ভাইবোন-গুলো ফোঁপাতে ফোঁপাতেও খায় পেটের জ্বালায়।

ভোর ভোর রান্না সেরে বেরুতে হয় শাপলা-শালুক, মেটে আলুর খোঁজে। পিঠাপিঠি বোন সানার ঘাড়ে থাকে শুকনো ডালপালা সংগ্রহের দায়িত্ব। পরেরটা ঘরদোর পরিষ্কার রাখে। দুটো হাঁস, তিনটে মুরগির দেখাশোনা করে। একেবারে ছোট সোনা, বাবা ওকেই একমাত্র আদর করে কাছে নিয়ে শোয়, পাত থেকে এটা ওটা দেয়। পাঁচ বছরের ছেলেটার এখন থেকে ধারণা হয়ে হয়ে গেছে সে পুরুষমানুষ, ঘরের কোনও কাজে তার হাত দিতে নেই। অহংকারী আদুরে ভঙ্গিতে হয় বাবার ভাঙা চৌকিতে বসে থাকবে, নয় হুকুম চালাবে বোনেদের ওপর।

সংসারের যাবতীয় কাজ সারতে সারতে বেলা নেমে আসে। পড়ন্ত সময়ে খেয়ে রাতে খাবার পাট থাকে না বলে বিকেলটা অবসরের। তেলহীন ফ্যাসফ্যাসে লালচে চুলে মার ফেলে যাওয়া কবেকার আধক্ষয়া চিরুনি চালাতে চালাতে কানে যায় টিপ, টিপ, টিপ, টিপ, শব্দটা। এটাই শেষ লঞ্চ। বাঁশের আড়া থেকে রং-চটা ওড়নাটা তুলে নিয়ে সারা ছোটে। ঢালিদের জাম্বুরা, বাতাবি লেবুর বাগান, শিকদারদের বিশাল বাঁশঝাড় ছাড়িয়ে খানিকটা নিচু জমি। তারপরই হাটখোলার বটে-পাকুড়ে জড়াজড়ি করে

থাকা লঞ্চ ঘাট। নাগমোতির হাট। একটা জাঁদরেল শিমুলগাছের তলায় পাশাপাশি হযেছে চারটা চায়ের দোকান। বাইরে পাতা তক্তার বেঞ্চটায় এক দিন বসতে গেছিলো। দোকানী তুলে দিয়েছে খদ্দের নয় বলে। আজকাল সবে-গোঁফ-ওঠা সেই ছেলেটাই তাকায় কেমন তেরছা চোখে। কখনো এদিক সেদিক সাবধানে নজর করে চাপা চাপা গলায় ডাকে, ঐ সারা টুলে বস। সুবাসী তুলা তুলা নরম মোহন বিস্কুট আইছে নতুন নতুন। বইসা টেস্টো কইরা ছাখ একখান।

সারা যায় না। জবাব দেয় না। কিন্তু ভাঙা আয়নায় ঘরে ফিরে চেহারা দেখে। বয়স হলো বারো। মাজা রং ফর্সা হয়েছে কবে। এতো অভাবের মধ্যেও গোলালো হাত পায়ের গোছা। মুখটা যে ওর মায়ের মতো সুন্দর, ছোটকাল থেকেই শুনে আসছে। ইদানীং লক্ষ্য করছে চায়ের দোকানের ঐ ছেলেটা, মুন্সি বাড়ির তোতলা রমজান যেমন তাকায়, বাবাও তেমনি তাকায়। ঠিক এক রকম না হলেও কোথায় যেন ওদের চোখের সঙ্গে বাবার একটু লালাভ চোখের মিল রয়েছে।

আজ লঞ্চঘাটে যাবার পথে বাজারের দিকে দেখলে অনেক লোকজন। প্রতি শীতের আগে মেলা বসে। চড়ক গাছের সঙ্গে কতো রকমের শখের জিনিসের দোকানপাট। মিষ্টি আর ছড়িভাজার মন-পাগল-করা সুবাস। এবার শোনা যাচ্ছে যাত্রাদল আসবে। দু'রাত থাকবে। হ্যাজাক বাতি নয়, ওরা নাকি আসরে জ্বালাবে লাল সবুজ বিজলির আলো। তো যে আলোই জ্বলুক কখনো ওখানে পৌঁছুতে পারবে না সারা, নবুরা। তিন বোনের আক্ষেপ দারুণ।

লম্বা শ্বাস নিয়ে দাঁড়াল সেই হাটতলার সাইনবোর্ডটার আড়ালে, যাতে লেখা আছে এ গ্রামের নাম। শেষ লঞ্চটার টিপটিপ শব্দের সঙ্গে মিশে থাকে নিজের বুকের স্পন্দন। লঞ্চ ভেড়ে। সিঁড়ি লাগে ঘাটের সঙ্গে। দলে দলে মানুষ নামে। স্ত্রী-পুরুষ, বুড়ো-বাচ্চা। রকমারি পোশাকে রকমারি ঢং-এর। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে সবার দিকে চোখের সন্ধানী আলো ফেলে রাখে সারা।

মা গেছে তিন বছর আগে। মুখ যে খুব স্পষ্ট তাও নয়। তবু ওর কেমন বিশ্বাস দেখলেই চিনতে পারবে। রক্তের টান নাকি জব্বর টান। দুনিয়া তো দুনিয়া হাশরের ময়দানেও নাকি মা সন্তানকে চিনবে, সন্তান মাকে।

যতক্ষণ লঞ্চ থাকে, ভেঁপু বাজে। সারা ওর সামান্য অক্ষর-জ্ঞানে পড়তে চেষ্টা

করে নাম। এখন যেটা এলো, ওর কেবিনের কপালের ওপর জ্বল জ্বল করছে সাদা জমিনের ওপর ঘন কমলা রঙে লেখা 'লীমা এক্সপ্রেস'। আহা এই মেয়েটা কি ভাগ্যবতী। ওর নামে লঞ্চ চলে। চলে হাজার হাজার টাকার কাজ কারবার। এই মেয়েটা নিশ্চয় পরীর মতো। ওর ডানে বাঁয়ে থাকে অনেক দাসি-বাঁদি। স্কুলে যায় হয়তো হাওয়া-গাড়িতে চড়ে।

বুকের ভেতরে মোচড় টের পায়। এখানকার একদার জমিদার সাহেবদের দোমহলা টকটকে লাল ইটের আলিশান বাড়িটায় সম্প্রতি মেয়েদের স্কুল হয়েছে। ছাত্রীরা সকালে পড়বে। দুপুরে ছেলেরা। কতো দূরের গ্রাম থেকে মেয়েরা আসে বই খাতার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে। অথচ ওদের বাড়িটা বারো-চোদ্দ হাতের মধ্যে স্কুল-সীমানা থেকে। সানা এই সুযোগে এর ওর গাছ থেকে কামরাঙা কয়েত বেল চুরি করে টিফিনের সময়ে ছাত্রীদের কাছে বিক্রি করা ধরেছে। কাজটা ঠিক নয়, বলে লাভ হয় নি। দশ বছরের সানা উল্টে সারার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। গোপনে বাপকে আট আনা, এক টাকা দিয়ে খুশি করে একটু আধটু আদরও খাচ্ছে জন্মদাতার।

—অয় গেদী আনাম বাইত পার করবি নিকি তর ঘর পলানী রঙ্গিলা মাওর আশায়। এ্যাঁ!

চাখানার চান্দু। তাইতো কখন ঘাট ছেড়েছে লীমা এক্সপ্রেস। লোকজন কেউ খেয়ায় চড়ে নদী পার হয়ে গ্যাছে। কেউ পায়ে হাঁটা দিয়েছে খেতের আল বা শুকনো বিলের পথহীন পথে। সেই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। কার আশায়? ঘর পালানো মায়ের। এখানকার সবাই জেনে গেছে তার দুরাশার খবর। তাই টিটকিরি। আরও কতো কি। হজম না করে উপায় নেই। 'দাদা তাল গাছ বোনে নাতি ফল খায়' গ্রামীণ প্রবাদের মতো মায়ের সুকর্ম কুকর্মের ভাগীদার তার কন্যা-সন্তান এই তিক্ত বাস্তব মেনে নিয়েই রোজ ঘাটে আসা।

এখন চারদিকের জমকালো অন্ধকার দেখে ভয় পেল। হারিকেনের আলো-সম্বল দোকানগুলোতে এবার ঝাঁপ পড়বে। আকাশ থেকে, খাল থেকে ফাঁকা জমিন থেকে, উঠে আসবে চাক চাক আঁধার। সেই সঙ্গে বুঝি জ্বলে উঠবে চান্দুর কতুকুতে দু'চোখের তারা। হাতে-পায়ে ও যদিও দোকান বন্ধের কাজে ব্যস্ত। কিন্তু চোখের দৃষ্টি পাহারা দিচ্ছে নিঃসঙ্গ অসহায় সারাকে। বয়সন্ধিক্ষণের স্বাভাবিক অনুভূতি দিয়ে সারা সেটা যত টের পায়, তত

বুকের মধ্যে কাঁপন ধরে। এই জমকালো অন্ধকারে বাঁশঝোপের তলা দিয়ে গেলে নির্ঘাৎ 'কন্ধকাটা' 'সকসোর' পাল্লায় পড়বে। ভূতটা নাকি কচি কুমারী মেয়েদের রক্ত জব্বর পছন্দ করে।

এদিকে হাটতলা একেবারে নীরব হয়ে আসছে। চিন্তাই করা যায় না হপ্তায় একটা দিন এই জায়গাটা কেমন গমগম করে বিকিকিনির গরমে। বাকি ছ'দিন লঞ্চের সকাল সন্ধ্যার যাওয়া আসায়। এখন প্রেতপুরী। জীবন্ত প্রেত চান্দু এবার কি তার দিকে এগুবে ?

— কেডা ? এমুন গহিন সাঁজে ঐখানে কেউগারে খাডায়া ?

মান্নার চাচার গলা না ? দোকানের হারিকেনের আলোয় বোঝা গেলো পুবহাটির মান্নান চাচাই। রাজনগরের হাট থেকে ফিরছেন। গর্দানে নুন, গুড়ের ধামা। হাতে কেরোসিন তেলের বোতল। কাছে এসে একটু ধমকালেও, দুঃখটা বুঝলেন। কোমল ব্যবহারে, তা বুঝতে অসুবিধা হলো না সারার। তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে বলল, আপনে এই সময় না আইলে আইজ দাঁত-কপাটি লাইগা আমি ঠাইট মইরা যাইতাম গো চাচা।

— মরণ কি অতো সোজা রে মাও। এই ষাইট বছরের বেমারী বুড়া আমি অখনো হাট কইরা খাই। ঐদিকে শুনি আমার পোলা দুইটা নাকি শহর গঞ্জে ভালা ব্যবসায়, ভালা রোজগার করতাছে। এদিইকে বুড়া বুড়ি আমরা খাইটা মরি।

— যাননা ক্যান শহরে। ঘেঁটি ধরেন না ক্যান বেআক্কল পোলাগোরে।

— লাভ কিছু নাই। দেখছি চ্যাষ্টা কইরা। তারা কয় তাগোই নাকি চলে না। আমাগো দেখব কেমুন কইরা। যাউগগা আমরাও বাপমাওর দাবি ছাইড়া দিছি। যা পারি নিজেরাই কইরা খাই। অরা তাও সুখে থাকুক।

বৈরাগীর ভিটা থেকে দু'জনের পথ দুদিকে। সারার আর ডর নেই। ঐ তো দেখা যাচ্ছে মোল্লাবাড়ির লণ্ঠন। বাড়ির কাছাকাছি দয়াল ফকিরের মাজারের আলো। আঙ্গিনার সীমায় ঢোকার আগে একবার মাজারের সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়। দোয়া চায়। একই দোয়া। মা যেন ফিরে এসে তাদের নিয়ে যায় তার কাছে।

এমন সময় বাবা সাধারণত ঘরে থাকে না। তাস পিটে এশার নামাজের পর ফেরে। তোলা পানিতে পা ধুয়ে উঠে বসে খেজুর পাতার চাটাইতে। এ

ঘরে কেরোসিন আসে না বহুদিন। খুব দরকার হলে জ্বলে রেড়ির তেলের মিটমিটে পিদিম। বাবা আজ মাজারের মোম থেকে একটা বিড়ি ধরিয়ে চালায় ঢুকে, বিড়ির আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি দেখে কে জানে। তবে হাঁকটা দেয় বাজখাঁই গলায়, ঐ সারা, সানা, সবুরা, সোনা ঠিক ঠিক আছ তো সব কয়টা।

—না থাইকা উপায় কি যমে কি ছ্যাখে আমগোরে।

একদিম খিদের কামড় সইতে না পেরে কথাটা বলে ভীষণ মার খেয়েছিল আট বছরের সবুরা। সেই থেকে সব চুপ করে থাকে। ঘুম না এলেও ভাণ করে ঘুমের।

আজ বাবা ফিরলো ফর্সা শার্ট প্যাণ্ট পরা একটি লোক সঙ্গে করে। হাতে জ্বলন্ত দেশলাই এর কাঠি। দাওয়ায় উঠেই হাঁক দিলো, কৈরে ?

কথাটা কানে গেলো তিন বোনেরই। তিনজনই ঠেলতে লাগল প্রত্যেককে। বাবা যতোক্ষণ সবুরার চুলের ঝুঁটি ধরে না তুলল ততোক্ষণ কেউ উঠল না। পল্টু মৃধা বলল, সবুরা তুই পিদিম জ্বালা। সারা মুড়িটুড়ি কিছু থাকলে ব্যাপারী সাবরে খাইবার দে! আর সারা আয় পিদিমের সামনে।

সারা যখন প্রদীপের কাছে এলো তখন বাবা সেই লোকটাকে প্রশ্ন করছে, তো মিয়াসাব পায়েল অপেরায় আপনের কি কাম ?

লোকটা বলল সাজ, সাজের কাম।

—তার মাইনে আর্টিস। নট নটীগো সাজান-গোজান। না নিজেই সাজেন রাজা বাদশা, উজির নাজির।

—আপনে মিয়া জব্বর বেশি কথা কন। ঐ হগল ছাইড়া আসল কারবারে আসেন। মাইয়ারে কন বইতে। অ-পলটু মিয়া—

—খাড়ান খাড়ান। আগে একখান ভুল ভাঙ্গাই। পল্টনে আছিলাম বইলা মাইনসে কয় পল্টু, নাইলে আমার আকিকার নাম রহমত আলী মৃধা।

—ঐ হইলো। রহম-বেরহম যাই হন কমু কামের কথা। আলতু ফালতু সমায় যাত্রার মাইনেষেগো হাতে থাকে না।

—আমারেও হেজিপেজি লোক ভাইবেন না। আইজ অবস্থা পইড়া গ্যাছে, নাইলে, তা আছিলাম জাইত সাপের বাচ্চাই—নামডাকওয়ালা মৃধা খান্দানের আওলাদ।

—গসিপউসিব কালায়া থোন। অখন তফাতে আসেন। মাইয়ারে যা

দেখনের দেখছি। পাকা কথা হইয়া যাউক।

—হোউক।

পল্টু মৃধা অচেনা লোকটির সঙ্গে সুপারী বাগানের ফিকে অন্ধকারের দিকে চলে যেতে সানা ফিসফিস করে বলল রকম সকম জুইতের লাগতাছে নারে বুজি। যে মানুষটা আইলো তারেও সুবিধার ঠেকলো না।

সারা বলল, তর তো খালি সন্দ আর সন্দ। প্যাটে অতো জিলাপীর প্যাচ রাখলে খালি দুঃখখু বাড়ে কইছে মবন্নাফ চাচায়। নে ঘুমা।

সারার চোখ বুজে আসছিলো, হৈ হৈ করতে করতে ঘরে ঢুকলো পল্টু মৃধা। হাঁক-ডাকে উঠে বসালো সবাইকে। বাবার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি। পিদিমের এক চিমটি আলোয় জ্বলজ্বল করছে ইয়া বড়ো বড়ো লালমোহন। একসঙ্গে পাঁচটি প্রাণী হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

এক সময় পল্টু মৃধা সবাইকে ডানার ঝাপটায় সরিয়ে দিল। রাতেই সব সাবড়ে দিলে সকালে খাবে কি। সিকায় হাঁড়িটা তুলে রেখে শোবার আগে বলল, সারা তর লাগি একখান গন্ধ-সাবান কাইল বাজার থন আইনা দিমু! ভালা কইরা গুসল করবি। তবে যাত্রা দেখাইতে লইয়া যামু কাইল বাইতে।

সানা বল্লো, আমগো নিবানা বাবা?

—না দুইখান টিকিট পাশে পাইছি।

—আমগো না নিলে আমরা কান্দুম।

—কান্দ। কান্দনের কপাল লইয়াই তো আযছত তরা।

শেষের শব্দগুলো ধমকে ভয়ংকর। কথা সরে না আর কারুর মুখ থেকে। বলতে গেলে ভয়েই ঘুমিয়ে যায় চার ভাইবোন।

বাজারবেলায় সত্যি সত্যি আসে সুগন্ধী তেল, সাবান। নতুন শালোয়ার-কামিজ। রাতে সেগুলো পরে বিষণ্ণ ভাইবোনদের পেছনে রেখে সারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো বাবার পিছু পিছু।

পায়েল অপেরায় সন্ধ্যা থেকে দর্শক টানার জন্য মাইকে বাজে হিন্দি বাংলা জনপ্রিয় রেকর্ডের গান। এখন বাজছে যাত্রাদলের নিজস্ব বাজনা। তাঁবুর তলাটা আলোয় ঝলমলে। চেয়ারে চেয়ারে বসে আছে ঝকঝকে পোশাক-পরা সাহেবরা। কম দামের সীটে গরিব দর্শক। আরো গরিবরা ঠাণ্ডা মাটির থলপাতে বসে।

বাপ বেটিকে নিয়ে যাওয়া হলো সাজ ঘরে। সেই লোকটা, কাল সন্ধ্যার

আগন্তুক আজ পরে আছে হাফ প্যান্ট, গেঞ্জি। সাজার কাজ বলেছিল ; পল্টু মৃধা ভেবেছিলো পার্ট-টার্ট কিছু করে। দেখলো লোকটার কাজ হচ্ছে কর্তা-ব্যক্তিদের জন্য তামাক সাজা। তবে ওপরওয়ালাদের ওপর প্রভাব কিছু আছে বোঝা গেলো। সাদা ধবধবে লুঙ্গি, কল্কিদার পাঞ্জাবি গায়ে দশাসই একজন মনিবের কানে কানে কিছু বলতে সে ঘাড় দোলালো সামান্য। কাছে ডেকে বসালো পল্টু মৃধাকে। বলল, এই তোমার মেয়ে সাবারন।

একটা টিনের বাক্সের ওপর বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি ধরে এলো সারার। কানে আসছে দ্রুত লয়ের ঘুঙুরের শব্দ। হারমোনিয়াম তবলার সঙ্গে প্রায় বেসুরা গলার মেয়েলি আওয়াজ! গানটা খুবই পরিচিত—অ অচিন নাগরের···

তাদের ঘরে রেডিও নেই। কিন্তু প্রতিবেশীদের আছে। প্রায়ই শোনে। গাইতেও পারে শুনে শুনে। এমন গান, এমন নাচ রেখে ওকে কেন বসিয়ে রাখা হয়েছে বেরসিকের মতো এখানে? বাবার কি গুন গুন করে কথা বলা শেষ হবে না তামাম রাতে? কী অতো কথা অচেনা লোকটার সঙ্গে।

শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে এক সময় কাছে এসে বসল বাবা। বাবাকে কাঁদতে কখনো দেখে নি সারা। অবাক হলো। সেটা আরও বাড়ল যখন শুনল এই যাত্রাদল আগামীকাল ঢাকা যাচ্ছে। সেও যাবে তাদের সঙ্গে। ওরা ওকে নাকি পৌঁছে দেবে মায়ের কাছে।

সারা কি স্বপ্ন দেখছে? যে মায়ের জন্য তিন বছর ঝড় নেই, রোদ নেই সে দাঁড়িয়ে থাকে হাটতলার লঞ্চঘাটায়, সেই মা সত্যি তাকে ডাকছে।

মনটা পর মুহূর্তে ছোটো হয়ে গেলো। সে না হয় অভাবী সংসার আর বাবার অমানবিক ব্যবহার থেকে রেহাই পাবে, কিন্তু ওরা? বাবার মন-মেজাজ ভালো থাকলে যাদের ডাকে, সানারন, সবুরন বলে। আজ সকালেও সবুরার পিঠের চামড়া উঠে গেছে বাবার ধারালো নখের আঁচড়ে। অপরাধের মধ্যে একটা বেশি লালমোহন চেয়েছিলো।

ঘাড় বাঁকা করে সে বলল, না বাবা মায়ের কাছে আমি একলা যামু না। সানা সবুরারেও লগে লইয়া যামু।

দপ করে জ্বলে উঠল পল্টু মৃধার লালচে চোখ জোড়া। এই চোখেই পানি ঝরছিলো বিশ্বাস হয় না। থাবা মেলে মেয়ের ঘাড় ধরতে দেরি হতো না, পুরো ব্যাপার সামাল দিল মনিব চেহারার সেই মানুষটি। খুব ঠাণ্ডা গলায় সে

বলল, ও মেয়ে তুমি ভাইবো না। অখন তোমার মাও তোমারেই লয়া যাইবার কইছে। পরে আস্তে আস্তে অরা, তোমার বুইনেরাও যাইবো। এক লগে এতো গুলান মানুষ গ্যালে তোমার মা'ও মুস্কিলে পড়বো না?

কথাটা যুক্তিযুক্তই মনে হয়েছে সারার। মা নাকি শহরে আয়ার চাকরি করে। একসঙ্গে বাড়তি তিনটি মুখ খাওয়ানো মুখের কথা নয়, অভাবের সংসারে থেকে সে তা বুঝেছে।

কখন সকাল হবে, লঞ্চে উঠবে? কি নাম হবে লঞ্চটার? বাদল এক্সপ্রেস, এম এল অভিযান? এম, এল, ইছামতি? নাকি স্টিলবডি সেই দৈত্য জাহাজটা? ওটা কাঠের নয়, ইস্পাতের তৈরি। সূর্যের আলোয় রাজকীয়ভাবে চলে। চোখ রাখা যায় না এতো ঝলমল করে তখন। ঝড়-বাদলে অন্য লঞ্চগুলো যখন ঘাট ছাড়তে ভয় পায়, ওটা তখন দাপটের সঙ্গে ঘাঁটি ছাড়ে। হে খোদা, হে বাড়ির ধারের মাজারের দয়াল ফকির একবারের জন্য হলেও আমার একটা খায়েশ পূর্ণ করো। ঐ জাহাজটাই যেন সকালে আসে, আসে।

ঘুমিয়ে যায়।

যখন জাগে প্রথমটা বুঝতে পারে না কোথায়? নৌকার মতো দুলুনি। নৌকার মতো খোল। একটা লণ্ঠন ঝুলছে সামনের দিকে। বেশ বড়ো নৌকা। তার এপাশে ওপাশে ঘুমাচ্ছে আরো কিশোরী যুবতীরা, এরই ভেতর কে একটা মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করতে মেয়েটি জানালো, চাচা ওকে বিক্রি করে দিয়েছে অপেরার মালিকের কাছে। এখন থেকে ওকে তালিম নিতে হবে নাচ গানের। নাচতে হবে মূল যাত্রা শুরু হবার আগে ভাগে। ঐসব প্রলয় নাচ উঠতি বয়সের মেয়েদের শরীর ছাড়া নাকি সহজে জমে না। তাই এই কিশোরীদের কেনা হয় চড়া দামে।

শুনতে শুনতে দম বন্ধ হয়ে আসে সারার। অথৈ পানিতে ডোবা মানুষের মতো তাকায় চারদিকে। তবে কি বাবা সত্য কথা বলে নি? সেই মেয়েটাও যে ঘুমিয়ে গেছে কাঁদতে কাঁদতে। কাকে সে কথাটা জিজ্ঞেস করবে?

অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা

লায়লা যামাদ

রাত থেকেই ভাবনাটা বুকে খচ্ খচ্ করে। সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তেই আর একবার অসোয়াস্তিতে ছটফট্ করে ওঠে। এক সময়ে মনে হয় স্বপ্ন দেখছে নয়ত নিজের মনে অহেতুক বিভীষিকার ছবি এঁকে নিজেই যন্ত্রণা ভোগ করছে।

শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের ঘটনা চোখে ভাসে আর মিলায়। বুকের ভেতরটা থেকে থেকে হু হু করে ওঠে। মনে হয় মনের কথা কাউকে খুলে বলে। মাঝে মাঝে বুকের ভেতর উথলে ওঠে কান্না, কিন্তু কাঁদতে পারে না। নিজের দুঃখে কোনদিন কাঁদতে শেখে নি সুরমা। না শিখেছে সংসারে কারও কাছে অভিযোগ বা দাবি করতে।

দরজার বাইরে জোবেদা বেগমের গলা শোনা যায়, বাবারে বাবা, সুরোর আজ হলো কী? সারা আকাশ ফর্সা হয়ে গেল ঘুম থেকে ওঠার নাম নেই। কাজের বাড়ি একা সামাল দেই কি করে?

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে সুরমা। চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে জানালার দিকে চায়। বেড়ার গায়ে চৌকো করে কাটা নামে মাত্র একটুখানি জানালা, তারই ফ্রেমে ধরা পড়েছে নীলার মত নীলাভ এক টুকরো আকাশ। সত্যিই সকাল হয়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এতক্ষণ সুরমা তবে স্বপ্ন দেখেনি। চোখের পাতা বন্ধ করে কেবল অনুভবের রাজ্যে ভেসে বেড়িয়েছে।

সুরমার মনে যে দুটো জগৎ আছে পাশাপাশি তার খবর কেউ রাখে না। একটাতে সে থাকে অন্যটা সে অনুভব করে। অনুভূতির জগতে যখন নিজেকে ভাসিয়ে দেয় তখন কি অপার আনন্দ তার। পরক্ষণেই আবার যখন বাস্তবের মুখোমুখি প্রত্যক্ষ সত্যকে দেখতে হয় তাকে দু'নয়ন মেলে, তখন সব আনন্দ চুপসে গিয়ে সঙ্কুচিত হয় মন। আজ তেমন সত্যেরই মুখোমুখি হতে হবে

সুরমাকে, কঠিনভাবে, বিশ্রীভাবে।

সত্যিই আজ সেলিম আসছে ঢাকা থেকে, নতুন বৌকে সাথে নিয়ে। বাড়িতে আজ বৌ-ভাত। একমাত্র ছেলের বউ আসছে শহর থেকে। আনন্দে গর্বে জোবেদা বেগমের মাটিতে পা পড়ে না। খবর পাওয়ার পর থেকে এ-গাঁ ও-গাঁর আত্মীয় কুটম্বে বোঝাই করে তুলেছেন বাড়ি।

অথচ সেলিম ঢাকা থেকে প্রথম চিঠি লেখে, নিজের ইচ্ছেয় মায়ের মত না নিয়েই সে বিয়ে করেছে তখন জোবেদা বেগম মগরেবের নামাজ পড়তে পড়তে জলচৌকিটার ওপর আছড়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কি কান্নাই কেঁদেছিলেন। হায় আল্লাহ, আমার ছেলে কেন এমন করল আমার সাথে।

কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতে আবার বর্ষায় ভেজা পলিমাটির মত নরম হয়ে উঠেছে তার মন। কেননা সেলিম চিঠি দিয়েছে আর একটা। নিজের অপরাধের জন্য মাপ চেয়ে লিখেছে—তার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ি নাকি হজে যাচ্ছেন তাই হঠাৎ করে মাকে না জানিয়েই সেরে ফেলতে হয়েছে আকৃদটা। মা যদি ইচ্ছে করেন গাঁয়ের বাড়িতে ধুমধাম করে বধূবরণ করতে পারেন।

চিঠি পড়ে জোবেদা বেগমের আহত মনে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগে। মনে মনে ছেলের বুদ্ধির তারিফ না করে পারেন না। বিধবা মানুষের পক্ষে সাত-তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে ছেলের বিয়েতে যাওয়া কি সম্ভব ছিল। ঘরে সেলিমের বৃদ্ধা দাদী, যুবতী মেয়ে সুরমা এদের ফেলে রেখে যেতে পারতেনই বা কি করে? ছেলের বিবেচনায় খুশীই হন তিনি।

মহানন্দে বধূবরণের জন্য প্রস্তুত হন জোবেদা বেগম। ক'দিন থেকে সুরমার কাজেরও অন্ত নেই। পান বানানো, সুপুরি কুচোনো, এর ওর খাবার তদারক করা। কার ছেলে খেল না, কে ঘুমোবার জায়গা পেল না সব দায়িত্ব তার। এরও পরে বোঝার ওপর শাকের আঁটি রয়েছেন দাদী। ফাঁক পেলেই ডাক পড়ে—ও সুরো এদিকে আয় পান ছেঁচে দে, মাথায় তেল বসাবিনে। কাজের কেবল অজুহাত, আসলে সুরোর সাথে দুটো কথা বলার আনন্দ অনেক। সুরোর মুখ দেখে যেন মনের কথাটা নিমেষে আঁচ করে ফেলেন। হ্যাঁরে মুখটা অমন শুকনো কেন? সেলিমের বৌ আসছে দেখে মুখ গোমড়া করেছিস কেন মুখপুড়ি!

যতসব বাজে কথা আপনার! মুখ আরও কালো হয় সুরমার।

আপন মনেই দাদী বলেন, পারলিনে তো মানুষটিকে জয় করতে। অমন

ডাগর চোখ, চিকন মাটির মত রং কোন কাজেই লাগল না। ছোকরা বড় নেমকহারাম।

যাইগে মেলা কাজ পড়ে আছে। একরকম ছুটেই বেরিয়ে যায় সুরমা ঘর থেকে। গিয়ে বসে উঠোনের ঝুঁকে পড়া সজনে গাছটার গুঁড়িতে। আর তারপর মাথা নিচু করে কি যেন ভাবনায় তলিয়ে যায় সেখানে।

সেলিমের দোষ কি! সুরমারই তো বড় আশা। এ যেন বামন হয়ে চাঁদ ধরার মত। দয়া করে জোহরা বেগম ঠাঁই দিয়েছেন সেই কি যথেষ্ট নয়। পরগাছার মত যে উড়ে এসে জুটেছে সংসারে সে কি জুড়ে বসবে সব। পিতৃহারা সুরমাকে নিজের মেয়ের মত লালিত পালিত করেছেন জোবেদা বেগম। ষোল বছর বয়স না হতেই বিয়েও দিয়ে ছিলেন ভালো ঘরে। কপাল মন্দ থাকলে কি করতে পারেন তিনি। দু'মাস যেতে না যেতেই শাদা থান পরে ফিরে আসবে সুরমা ঘরে তা কে আর জানতো। নতুন বউ হবার সাধ-আহ্লাদটুকু নিঃশেষে মুছে যায় মন থেকে।

ছোটবেলা সেলিমের সাথে ছায়ার মত থেকেছে। সুরমা ছাড়া এক দণ্ডও কাটে নি সেলিমের। সে ঘনিষ্ঠতা অবশ্য পছন্দ করেন নি জোবেদা বেগম। সময় থাকতে সাবধান হতেই গাঁ থেকে সেলিমকে পাঠালেন জেলাশহরে পড়াশুনা করতে। আর সুযোগ বুঝে তাকে না জানিয়েই বিনা ঘটায় সুরমাকে সঁপে দিলেন শহর আলির হাতে।

কোনও প্রতিবাদ করে নি সুরমা। ফেলে নি একফোঁটা চোখের জল। জীবনের সব কিছুকে নির্বিকার সহিষ্ণুতায় যেমন করে স্বীকার করে নিয়েছে, তেমন ভাবেই শহর আলিকেও গ্রহণ করে সে।

কিন্তু সেলিমের প্রতিক্রিয়া হয় অন্যরকম। পড়াশুনো ছেড়ে পাগলের মত গাঁয়ে এসে বসে থাকে। উদাস নির্জনতায় দিনরাত কাটায়। তাকে ছেড়ে চলে যাবে সুরো এ যেন ভাবতে পারে না ও! অনেক বোঝান তবু কিছুতেই মানাতে পারেন না ছেলেকে জোবেদা বেগম। আর এরই মধ্যে ফিরে আসে সুরমা তার বৈধব্য নিয়ে জীবনের বিড়ম্বনা বাড়াতে।

চোখের সামনে এ পরিহাস সহ্য হয় না সেলিমের। পড়াশুনো করবে বলে আরও দূরে ঢাকায় চলে যায়। এর পরের ঘটনা অন্য রকম। ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় পাশ, ভালো চাকরি পাওয়া, পরপর কয়েকটি অধ্যায় স্বপ্নের মত। দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে সুরমার কথা ক্রমেই অস্পষ্টতায় তলিয়ে যায় মনে। একটু

একটু করে অচেনা মানুষ হয়ে যায় সেলিম।

মনে মনে যে সম্পর্কটা তবু ঝড়ের মুখে উসকে রাখা সলতের মত বাঁচিয়ে রেখেছিল সুরমা, সেলিমের বিয়ের পর দপ্‌ করে নিবে যায় সব আলো। যা হবার নয় হতে পারে না, তাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষা কেন? এতদিন কিসের প্রতীক্ষায় বুক বেঁধেছে ও! যেন ছুটেছে অসম্ভব মরীচিকার পিছনে? মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় সব কিছু। চলমান জীবনের আশাময় টুকরো টুকরো যে ছবি নিয়ে সে মালা গেঁথেছে এতদিনে তা জোর করে ছিঁড়ে দিতে হয় নিজেকেই। কিন্তু পারে কই। কঠিন বাস্তবের সম্মুখে দাঁড়িয়েও সত্যকে স্বীকার করে নিতে চায় না মন।

ঠিক গোধূলির দিকে গাঁয়ে পালকি এসে থামে। টুকটুকে বৌকে উল্লাসে বুকে জড়িয়ে ধরেন জোবেদা বেগম। সাজগোজ করা নধর নিটোল রূপবতী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যায় সুরমারও। সেলিমও কি সুন্দর হয়েছে, উজ্জ্বল হয়েছে গায়ের রং। দু'জনে ঝক্‌মক্‌ করতে থাকে সুরমার সামনে।

সেলিম সুরমাকে দেখিয়ে ম্লানমুখে বলে, এই আমার দুঃখিনী বোন সুরমা। যার কথা বলেছি তোমায়। জানো একে জীবনে হাসতে দেখে নি কেউ।

কৌতূহলে নতুন বউয়ের চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠে। কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে সুরমার দিকে চেয়ে হাসে ও। এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারে না সুরমা, ছুটে চলে যায় রান্নাঘরের দিকে। সেই যে আড়াল হয় আর সামনে আসে না।

লোকজনের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকতে বেশ রাত হয়ে যায়। পাড়া-গাঁয়ের রাত অল্পেতে নিঝুম হয়। পা টিপে টিপে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে সুরমা। সারা দিনের পরিশ্রমে শরীর টানতে পারে না। এক পা দু'পা করে নিজের ঘরের দিকে যেতে সেলিমের ঘরে নজর পড়ে। আলো জ্বলছে, দরজার ফাঁক দিকে ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায়।

সেলিমের পাশে খাটের ওপর বসে রয়েছে নতুন বউ। টক্‌টকে লাল বেনারসীর ভেতর মুখখানা পদ্মকলির মত ফুটে আছে। হাসি হাসি চোখ দু'টিতে অনেক তারার আলো।

এমন সোহাগ রাত, বধূবেশ সুরমাও কামনা করেছিল। কামনা করেছিল একটি মানুষকে। যে তার সর্বস্ব দিয়ে গ্রহণ করবে তাকে। জীবনে মরণে তারা হবে সাথী। যাকে চায় নি, যার কথা কল্পনাও করে নি ক্ষণিকের জন্য

সেই এসেছিল সুরমার জীবনে, কিন্তু সে এমনভাবে এসেছিল যেন জীবনের পরম আনন্দের লগ্নকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিতেই, এখন সব শেষ, ধুয়ে মুছে মিশে গেছে। সেই পরম লগ্ন আর ফিরে আসবে না। শুধু বধূ হবার এক গোপন বাসনা তীব্রতর হয়ে মনকে আচ্ছন্ন করে থাকে। কি অসম্ভবের স্বপ্ন কি অবাস্তবের তৃষ্ণা বক্ষ জুড়ে।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে ওঠে। সারাদিনের শ্রমক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়তে চায়। অন্যমনস্কের মত টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

মাঝ পথে থমকে দাঁড়ায় একবার, বিমূঢ় স্তব্ধতায় কি যেন ভাবতে চায়। আবার চোখ তুলে তাকায়, মাথার উপরে তারা ভরা আকাশ দেখে। কোথাও মেঘ নেই। শুধু গাছগাছড়ার আড়ালে অন্ধকার থমকে আছে। জোনাকিরা জ্বলছে যেন তারই মত প্রবল যন্ত্রণায়।

আবার সেই অনুভূতির রাজ্যে হারিয়ে ফেলা নিজেকে। বুকের ভেতর সূক্ষ্ম জ্বালাটা তবু কিছু প্রশমিত হয়।

সেলিমের ঘরের আলো নিভেছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। পা টিপে টিপে কি খেয়ালে ওদের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। অল্পক্ষণ পরে আবার ফিরে আসে সুরমা নিজের ঘরে। ঢুকে পড়েই খিল এঁটে দেয়।

ভোর রাতে বউ-এর ডাক শুনে চমকে বিছানায় উঠে বসে সেলিম। রাত্তিরে শোওয়ার সময় বেনারসী শাড়ি, গয়না সব খুলে জানালার পাশে টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল বেচারী। মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে দেখে কিছুই নেই। ঘরের ভেতর গরম হবে বলে মাথার কাছের জানালা বারবার খুলে রাখতে বলেছিলেন জোবেদা বেগম। মায়ের কথা শুনতে গিয়ে ফল হয়েছে ভালোই। দুজনে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে সব। কোথায় কী? কিন্তু কে নিতে পারে? এত রাতে কাকে ডাকবে সেলিম? কার কাছে গিয়ে বলবে সে কথা। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হয়ে যে যার ঘরে ঘুমুচ্ছে। মাকে বিরক্ত করতে সাহস হয় না। অন্যদেরকেও ডাকতে লজ্জা হয়। শুধু আছে সুরমা, অগত্যা তাকেই বলতে হয়।

দরজার বাইরে থেকে মৃদুস্বরে ডাকে সেলিম, সাড়া পায় না। খোলা জানালা থেকে ঘরের আলো দেখা যায়। সেদিক থেকেই উঁকি মারে ভেতরে। যা দেখে, দু'চোখ বিশ্বাস করতে চায় না।

নতুন বউ-এর লাল টকটকে বেনারসীখানা সুন্দর করে পরেছে সুরমা। বুকে

দুলছে কনেরই সীতাহার, কপালে জয়টীকার মত ঝক্ ঝক্ করছে সোনার টিকলি। সুরমার শ্যামল দেহে উত্তাল হয়ে উঠেছে অপূর্ব লাবণ্যের তরঙ্গ। পরিতৃপ্তির একটুখানি হাসিতে উদ্ভাসিত, রেখায়িত দুটি ঠোঁট। পরম প্রশান্তিতে আচ্ছন্ন দু'চোখের পাতা।

এ হাসি, এ মুখ কখনও দেখে নি সেলিম আগে। বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখ রেখে অন্ধকারে বাক্যহীন দাঁড়িয়ে থাকে ও। প্রচণ্ড শীতে বসন্ত বাতাসের মত পুরনো ব্যথার স্মৃতি বুকের ভেতরে একটু হাহাকার তোলে যেন। জানালার শিক দু'হাতে আঁকড়ে স্থির নয়নে চেয়ে থাকে ও সুরমার দিকে।

ওর মনে হয় অদ্ভুত অনুভূতির রথে চড়ে সুরমা যেন ভেসে গিয়েছে কোনও অলীক স্বপ্নের রাজ্যে। যুবতী মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলবার বাসনায় সুরমা যেন সংযম, নীতিবোধ সব কিছুকে তুচ্ছ করেছে আজ। তৃষিত মনের বাসনাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য রঙে রঙে রঙিন করে তুলতে চেয়েছে।

ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। অপরাধের গ্লানিতে অবসন্ন দেহখানা কোনও মতে টেনে নিয়ে ফিরে যায় সেলিম নিজের ঘরে। কিছুই যেন হয় নি এমন একটা ভাব ফুটিয়ে স্ত্রীকে বলে তুমি শুয়ে পড়, ভেব না। শাড়ি গহনা তোমার হারায় নি কিছুই। সকালেই সব ফিরিয়ে দেবে সুরমা তোমাকে। এখন শুধু একটুখানি শান্তিতে ঘুমোতে দাও ওকে।

নিরুত্তর

রাজিয়া মাহবুব

খুশীর চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড করে টেনে নিয়ে এলেন বেগম সাহেবা !

—বল্—বল্ তুই কেন ওখানটায় উঠেছিলি ?

খুশী নিরুত্তর !

—কী কথা বলছিস না যে।

এ বাড়ীর মেজ মেয়ে খুকু কড়া স্বরে ধমক দেয়।

—থাক এত রাতে আর ওটাকে নিয়ে হাঙ্গামা করে কাজ নেই। বুড়ো সাহেব বললেন, ওকে নিচে পাঠিয়ে দাও।

চোখের পানি মুছতে মুছতে খুশী নিচে নেমে আসে। ওর মাথার নিচে গুঁজে দেওয়া আধা ছেঁড়া শাড়িখানা কোলের মধ্যে নিয়ে সিঁড়ির নিচে বসে থাকে খুশী। আর ভাবতে চেষ্টা করে কেন সে এমন কাজ করতে গেল ?

ওপরের বারান্দাতে এখনও এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বেগম সাহেবা তখনও নতুন বৌমাকে বোঝাচ্ছেন—বৌমা, তোমার জিনিসপত্র সাবধানে রেখো মা—ছুঁড়িটাকে তো ভাল বলেই জানতাম—এতদিন থেকে আছে কোনরকম অবিশ্বাসের কাজ করে নি।

খুকু বলল—ভাবী তুমি ঠিক দেখেছিলে ও হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ?

—আমি হাত দেখেই তো চিৎকার করে উঠি।

—যাও এখন—শোও গে। ভয়ের কিছু নেই সবকিছু ষ্টিল-আলমারিতে রেখে দিয়ো তো ?

—হ্যাঁ—মা—মাথা কাত করে নতুন বৌ।

একে একে সব চলে গেল। বারান্দার বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে রাত দু'টো বাজল।

রাত বারোটায়—যখন সবাই শুয়ে পড়েছে। যখন ঘুমে দু'চোখের পাতা

ভারী হয়ে এসেছে সবাইর, তখনই ঘটনাটা ঘটল।

নতুন বৌয়ের ঘর আর খুকুর ঘরের মাঝখানের প্যাসেজটাতে শুয়েছিল খুশী। বরাবরই ওখানে ঘুমায়। আজ চার বছর থেকে। যেদিন প্রথম এ বাড়িতে এসেছিল তখন ওকে কেউ রাখতে চায় নি।

কেউ রাখতে চায় না ওকে। বলে সোমত্ত মেয়েকে কে জায়গা দেবে? ভয়টা বড় বেগমেরও ছিল। তবু তিনি রাখলেন। বললেন—আহা বেচারি কোথায় যাবে। ওর নাকি দুনিয়াতে কেউ নেই। বাপ আছে খোঁজ নেয় না। নেবে কি সৎ-মায়ের তাড়নায় বেরিয়ে এসেছে খুশী। বড় বেগমের মায়া হয়েছিল। তবু তো খুশী সবটুকু বলে নি। বলতে পারে নি। বড্ড কম কথা বলে খুশী। কেমন বোকা বোকা চাহনি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বিষণ্ণ ওর দৃষ্টি।

নামটাই যা খুশী। খুকু মাঝে মাঝে ওকে দুঃখিয়া বলে ডাকত। বলত—তার ঐ গোমড়া মুখে খুশী নাম মানায় না। কিন্তু ক'দিনেই খুশী সবার প্রিয় হয়ে উঠল। ওর সেবা-যত্নে সবাই মুগ্ধ। খুশী না হলে—একপাও চলে না কারো।

আর বিশ্বাসী তো ওর মত কেউ নয়। বহু পুরোনো করিমকেও ও ছাড়িয়ে গেছে।

আজ তো শুয়েই পড়েছিল। তখন রাত এগারোটা হবে। হ্যাঁ—বড় ঘড়িতে তা ই দেখেছিল খুশী। খুশী অল্প পড়তে জানে, লিখতেও। ঘড়ি দেখতে জানত না। খুকু আপা শিখিয়েছে।

খুকু আপা বলেছিল—তোর ঐ রিরকুটে চামচিকের মত শরীর দেখেই কি মানুষ তোকে রাখবে, না কেউ তোকে ঘরে নেবে? গুণের বলে তো কিছু নেই দেখছি। ঘড়ি চেন্। এই দেখ—এই ছোট কাঁটা যখন—এমনি করে বলতে গেলে—হাতে ধরে অনেক কিছুই শিখিয়েছে খুকু আপা। খুকু আপার বয়স কত হবে? তার চেয়ে ছোটই হবে। ছোটই দেখায়, অনেক ছোট। কিন্তু বিদ্যা অনেক। বিয়ের কথা খুকু আপারও হয়। একটি ছেলে আসে। খুকু আপা তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে। কী যে সব বলে। সামনে বই খোলা থাকে। আজও বুঝে উঠতে পারে না এরই সঙ্গে খুকু আপার বিয়ে হবে কি না।

তবে এটুকু বুঝেছে—দু'জনাই দু'জনকে দেখলে কেমন একটা খুশির ঢেউ

খেলে যায় ওদের চোখেমুখে।

এই খুশির ঢেউ খুশী দেখতে পেয়েছে নতুন বৌয়ের চোখেমুখে। আজও ওর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু পাশের ঘরের নতুন বৌয়ের গলা আর মৃদু হাসি ওর রক্তে দোলা লাগল—ঢেউ তুলল এ বাড়ির বড় ছেলে—ঐ নতুন বৌয়ের স্বামীর হাসির শব্দে। এত কী কথা বলে ওরা? এত রাত পর্যন্ত? বেটি তো দেখি দিনে লাজে চোখ তুলে তাকায় না—মুখ খুলে কথা বলে না। যা বলে শুধু ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বা না। আশ্চর্য! রাতে শরম লাগে না? শরম কি শুধু দিনের আলোতেই ওকে পেয়ে বসে? আজই তো খুশী কথা বলল—তা নতুন ভাবী একটারও উত্তর দিল না। আর বড ভাইবা? বাপরে, ভাবলেও বুক কাঁপে খুশীর। যে গম্ভীর। কারো সঙ্গে কথা বলে না। ওর চোখের দিকে বড় বেগম ছাড়া আর কেউ সাহস করে তাকাতে পারে না।

—আহ ছাড়ো—দাঁড়াও গহনাগুলো খুলে রাখি—বৌয়ের গলা। উৎকর্ণ হয়ে শুনেছিল খুশী।

—না ছাড়বো না। থাক না। কেমন জড়ানো, জড়ানো, আদুরে আদুরে—বড় ভাইয়ার গলার স্বর।

খুশী আর থাকতে পারে নি। ওর মাথার ভেতর ঝিমঝিম করছিল। একটা অদম্য ইচ্ছা ওকে পেয়ে বসেছিল, দেখতে হবে। হ্যাঁ, যেমন করেই হোক দেখতে হবে। পাশেই একটা টুল ছিল। আর ছিল একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স। এরই একটার ওপর আরেকটাকে চাপিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল খুশী। এ পাশের বড় ভেন্টিলেটারকে আঁকড়ে ধরে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে ওর দৃষ্টিকে ভেতরে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল খুশী। কিন্তু তার আগেই ঘরের স্বল্পালোকে ওর হাতের পাতা দেখেই চিৎকার করে উঠল নতুন বৌ—চোর—চোর। আর তাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়ে গেল খুশী।

মুহূর্তে সবাই এসে জড়ো হলো। আর একবাক্যে সবাই বলল—ছিঃ ছিঃ ছিঃ শেষকালে তুই নতুন বৌর ঘরে চুরির চেষ্টা করলি।

—গাধী, অত উঁচু থেকে তুই কীই বা নিতে পারতি। খুকু বলল, মাকে আগেই বলেছিলাম এসব আপদ রেখো না। বড় ভাইর বজ্রগম্ভীর স্বরে ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাবে? চেঁচিয়ে

বলতে ইচ্ছা হয়েছিল – ও চোর নয়—ও চুরি করতে যায় নি। কিন্তু বলতে পারে নি। পারে নি কারণ এ কথার পরও যখন ওরা জিজ্ঞেস করবে – তাহলে কেন ওখানে উঠেছিল – তখন ও কী বলত? কেমন করে বলত – ওর যে বয়স অনেক হয়েছে। পঁচিশ! তার এই পঁচিশের যন্ত্রণাময় বয়সটার কথা কেউ ভাবে না – ভাববার মত ওর কেউ নেই। একথাটা ভাবতে গিয়ে আরো জোরে ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে খুশী।

হাবিল কাবিলের জমানা

রিজিয়া রহমান

সবার আগে চোখে পড়লো রজব মুন্সির। ফজরের নামায পড়েই গিয়েছিলে খালপাড়ে। তখনি। আলো না ফোটা ভোর। দলা দলা কুয়াশায় দু'হাত দূরে নজর চলে না। শীতের টানি খাল যেন কুয়াশারই নদী। তবুও দেখতে অসুবিধে হলো না। মুন্সী। দু'হাতে চোখ রগড়াল। শুকনো খালের ঢালে কি ওটা! দুর্গন্ধে খালপাড়ের উঁচু পথটায় দাঁড়ানো যায় না। কারো গরু-টরু মরেছে নিশ্চয়ই। নাকে লুঙ্গির খুঁটি চেপে গজ গজ করলো রজব— হালারফুতে গো কামখান দেইকচ্ নি। মরা গরু একখান ফালাই থুই গেছে পানির কিনারত। আরে বেক্কলেরা জানচনি ফানি নাফাক করণ গুণাহ। দুর্গন্ধময় এলাকাটা তাড়াতাড়ি পার হতে গিয়ে দু'পা অসাড় হয়ে গেলো রজবের। ইয়া আল্লাহ! কোথায় মরা গরু। এ যে মানুষ! মরা মানুষ! কয়েক পলক বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো রজব। তারপরই এক ঝটকায় পেছন ফিরলো। বাতাসের বেগে উঠে এলো মসজিদের সামনে। ফজরের নামাযের জামায়ত শেষ হয়েছে। তবু দু'চারজন রয়েছে। তসবীহ পড়ছে। মসজিদের দাওয়ায় প্রায় আছড়ে পড়লো রজব—

ও বাজীরা। কোহানত আছ সব। জলদি করি আইয়ো। মাইনষের লাশ একখান ফাঁচিগলি ফড়ি রইছে খালের কানিত।

ভোরের ভেজা বাতাসে এমন ভয়ংকর আতংকিত সংবাদ ছড়িয়ে দেবার পরও ভিড় তেমন জমলো না। জনা কয়েক বেরিয়ে এলো মসজিদ থেকে, ব্যাপারী বাড়ির এসহাক ব্যাপারী বেরিয়ে এলো। বিচক্ষণ লোক সে। বিজ্ঞ মুখ করলো। ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলো।

—চাচামিয়া কোহানত দেহি আইলা ফঁচা গলা লাশ।

রজবের ঠোঁট মুখ শুকনো, দাঁতে দাঁতে প্রায় কাঁপন উঠে গেছে। কোনো

রকমে বললো—ওই তো। খালের কানিত। আইও না। আই ছাঁই যাও।

দাড়িতে হাত রেখে ছটফটি পাক খেলো রজব। বিড় বিড় বিড়—ইয়া আল্লাহ! কি দেহি আইলাম। ইয়ান কি চাঁইলাম। ভিড় জমলো ক্রমে। জটলা হলো মসজিদের সামনেই। এসহাক ব্যাপারীই বললো—হুনি লও মিয়ারা। লাশ একখান ফঁডি রইছে। কে মারি থুই গ্যাছে আল্লাহ জানে। লাশের কিনারত যাই আবাইন্যা দারোগা ফুলিশের ঝামেলায় আটকি না যাও।

থমকে গেলো সবাই। কথাটা ভাববার বিষয়। এ গ্রামে খুনখারাবি তেমন যে হয় না তা নয়। এই তো গত বৈশাখে ইচোলির বড সড়কের ধারে ডাকাতেরা কুপিয়ে মারলো মুন্সি বাড়ির জোয়ান ছেলেটাকে। বাজারে মনোহারির দোকান ছিলো তার। মাল কিনে ফিরছিলো চাঁদপুর থেকে।

ভোটের আগে মনু শেখের ভাইটার চোখ তুলে নিলো শত্রুরা। সাতদিন পরে তার লাশ পাওয়া গেলো গ্যাগুরী ক্ষেতে, শেয়ালে অর্ধেক শরীর খুবলে খেয়েছিলো। তাই নিয়ে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট কম হয়নি। গ্যাগুরী তুলতে গিয়ে প্রথম দেখেছিলো তালেব মিয়া। আর তাকে নিয়েই পুলিশের টানা—হ্যাচড়া।

এ গ্রামের মানুষ এখন হুঁশিয়ার। বুঝে গেছে খুনের লাশের ধারে কাছে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আসল অপরাধী নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াতে পারে। আর উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চেপে নাহক হয়রানি। রজব মুন্সি গরিব মানুষ। মসজিদে ইমামতি করে কোনোরকমে পরিবারের খাওয়া-পরাটা চলে। পয়সাওয়ালা আর ক্ষমতাশালী লোকদের মন জুগিয়েই চলতে হয়। এখন ভয় পেলো সে। শুকনো মুখে বললো—আঁই তো লাশের ধারত যাই নাই বাজান। আর কোনো গলতি নাই। নামায পড়ি বাড়িত যাওন ধইচ্ছিলাম। ফচা গন্ধ ফাই দেইকলাম···।

বেলা উঠে গেছে। ডাকাতিয়া—মেঘনার সঙ্গমে ঝলমলিয়ে উঠেছে কাঁচা রোদ। লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে গাঙপাড়ে। এসহাক বাড়ি চলে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো—মেম্বরের বাড়িত যাই খবর দি আও গিয়া। হেতি আই যা করন লাগে করি দিবো।

মসজিদের সামনে কৌতূহলী জটলা ভেঙ্গে গেলো। রজব মুন্সি মসজিদের দাওয়ায় বসে পড়লো। এ কি ঝামেলায় পড়ে গেলো সে। সত্যিই যদি কোনো খুনের লাশ হয়···। লাশটা মেয়ে না পুরুষের, নাকি বাচ্চা-কাচ্চার

সেটাও তো ভালো করে নজরে আসে নি। তবু যদি চেয়ারম্যান মেম্বারেরা ডেকে পাঠায়? তাকে সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যায়। কি করবে রজব। শুকনো মুখে আবার বিড়বিড় করলো রজব।

—আঁই কইতাম পারি না কিছু। গন্ধ ফাই আঁর থন ঠেকছে একখান মরা গরু। হিবার ছাই দেহি মাইনষের লাহান ঠ্যাহে। এইত্থন বেশি আঁই কইতাম ফারি ন। লাশের ধারত আঁই ত যাই ন। আঁই বাইল—বাইচ্চা লই থাহি। আর থন ডর নাই?

রজব মুন্সি তাড়াতাড়ি অজু করে বসে গেলো। এশরাকের নামাযে। মোনাজাতে দু'চোখের পানিতে কাঁচা-পাকা দাড়ি ভিজিয়ে ফেললো—ইয়া রাহমানুর রাহীম। কিতান ছাঁই আইলাম! ইয়া আল্লাহ হাবিল-কাবিলের জমানা আনি দিও না আঁরার জমানায়। আল্লাহ আঁরা তোমার বান্দা। আঁরা আশরাফুল মাখলুকাত।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। টানি খালের পাড়ে আবার ভিড় জমলো। খালের ঢালে কেউ অবশ্য নামলো না। তবে উঠতি বেলার রোদে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে কারো অসুবিধা হচ্ছে না। মরা গরু নয় মানুষেরই লাশ। মেয়েমানুষের লাশ। উলঙ্গ শরীর ফুলে ঢোল। পেটের একপাশে শিয়ালের ভোজের চিহ্ন। আঁতুড়ি বোধহয় কাদায় গড়াচ্ছে! ভ্যান ভ্যান করছে মাছি অথচ মাথার লম্বা চুল আশ্চর্যভাবে ছড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হয় যেন শুয়ে চুল ছড়িয়ে দিয়েছে রোদে শুকোতে। আহাঃ। ইতাননি ছাঁওন যায়, কার ঝি! কার বউ হেতি! ক্যাডায় কইলল এমুন জালেইম্যা কাম গো।

আহাজারি করলো গ্রামের গরিব বুড়ি আজির মা। বাড়ি ঘুরে ভিক্ষে করে সে। তার যেমন দাম নেই। তেমনি তার কথারও নেই। তবু সে বলতে থাকলো—ইগ্‌গা তো জোয়ান মাইয়া। এককান কাপড় আনি লাশখান ঢাকি দেও গো বাজানেরা। মাইয়া মাইনষের উদাম লাশ। আহা আল্লাহ সইত ন।

উঠতি বয়সের মেয়েমানুষের লাশ। ফুলে বীভৎস দেখাচ্ছে। তবু কৌতূহলের জিনিশ বৈকি! মেয়েদের চালচলনের ব্যাপারে এই নন্দিপুর গ্রামের পুরুষেরা যথেষ্ট হুঁশিয়ার আর কড়া। দিনের আলোয় মেয়েরা সহজে বাড়ির বাইরে আসে না। এলেও অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা বোরখা পরে। ছাতা

ব্যবহার করে। গরিব ঘরের মেয়েদের ছাতা কিনবার পয়সা না থাকলেও ধার করতে হয়। নইলে বিচার-আচার, নালিশ-সালিশ তো রয়েছেই।

সে গ্রামে উলঙ্গ একটি মেয়েমানুষের লাশ দিনে-দুপুরে দেখতে পাওয়া অভাবনীয় নিষিদ্ধ বস্তু দেখার মতোই। দুপুরের আগেই খবর আরো জোরালো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। আশেপাশের গ্রামেও। লোক ভেঙে পড়লো। জটলা হল্লা আলোচনা। গ্রাম গম গম। দলে দলে লোক চলেছে খালপাড়ে। মেম্বার চেয়ারম্যান এসে ঘুরে গেছে। লোক চলে গেছে পাঁচ মাইল দূরের থানায় খবর দিতে।

আর ঠিক তখনি—যখন রজব মুন্সি জোহরের আজান দিচ্ছে। আতরীর মায়ের চিল চিৎকার আছড়ে পড়লো খালের পাড়ে। পচা লাশের দুর্গন্ধে ভারী বাতাস চিরে গেলো—কই আমার ঝিগে, কোহানে আমার আতরী।

ঘটনাটা আচমকা। আতরীর মা আজ দু'দিন বাড়িতে ছিলো না। আতরীর তিন বছরের ছেলেটাকে নিয়ে গিয়েছিলো চাঁদপুরে। সেখানে তার ছোট বোন থাকে। আতরীর খোঁজেই গিয়েছিলো সে। আতরী আজ পাঁচদিন থেকে নিখোঁজ। সারা গ্রাম তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি। আত্মীয়-স্বজন বলতে আতরীর মায়ের এক বোনই থাকে দূরে। চাঁদপুর পুরানো বাজারে। গ্রামের মানুষ বললো—যাও, হিগানত খুঁজি দেহ। কই যাইত আর। প্রস্তাবটা মনে ধরে নি আতরীর মায়ের। অত পথ একা কেমন করে যাবে আতরী। মাথাটা ভালো নেই ওর গত চৈত্র মাস থেকে। ঘরের দাওয়ায় বসে একা একা বিড় বিড় করত। ছেলেটাকে দেখত না। নাওয়া খাওয়া বন্ধ। আর যখন তখন হুট করে বেরিয়ে যেত বাড়ি থেকে। আগানে—বাগানে পাটখেতে ঘুরে বেড়াত। সবাই বললো হেতির তো আছর হইছে, বাতাস লাইগছে। তো তার তদবিরও কম করে নি আতরীর মা। মসজিদের হুজুরের কাছ থেকে পড়া তেল আর তাবিজ এনে দিয়েছে। পাশের বাড়ির গেদু মিয়ার মেয়ে থাকে ঢাকায়। বর্ষাকালে এসেছিলো বাপের বাড়ি। বড় পছন্দ করত সে আতরীকে। বললো—চাচী বাতাস লাগছে ঠ্যাকে না আর থন। ইগারে ঢাকায় লই যাও। ডাকতর দেখাও। অমন সোন্দর ঝি তোমার। কি বিয়া দিলা···

দুঃখে কপাল চাপড়াল আতরীর মা, বিয়ে কি সে দিয়েছিলো। বিয়ে তো দিতে হয়েছিলো। না দিয়ে উপায় কি। গরিব মানুষ আতরীর মা। বাপ-মরা

আতরীর হয়ে কথা বলে কে। একটামাত্র ভাই। সেও থাকে গাঙে-গাঙে। ঢাকা-চাঁদপুরের লঞ্চে চাকরি তার। মাঝে মধ্যে এসে মা-বোনকে কিছু টাকা-কড়ি খোরাকি বাবদ দিয়ে যায়। ইচলী বাজারের তিনটে দোকানের মালিক রহিম আলিই তো করলো কাজটা। টাকা খেয়ে আতরীকে তুলে দিলো বাট-পাড়ের হাতে। বিয়ে তো নামমাত্র। তিন তিনটে বউ রয়েছে যার তার কাছে কেউ মেয়ে দেয়। আর রহিম আলির মিঠা কথার ছড়াছড়ি—চাচী, ঝি তোমার রাজরানী হইব। কাম করণ লাইগত না। খাইব আর ঘুম যাইব। দাসী-বান্দী খাটাইব। কি পোড়া কপাল আতরীর। কেন যে সে রহিম আলির বাড়ি ধানের কাজ করতে গিয়েছিলো। নইলে কি রহিমের কুটুম নজু ব্যাপারীর চোখ পড়ত তার দিকে। কাজ সেরে বেরোবার মুখেই লোকটা এসে দাঁড়ালো আতরীর সামনে—কার ঝি এইগ্‌গা ? ছাতা বাদে ময়দানে হাঁটে। হেইতির শরম নাইনি ? ভয়ে জড়সড় আতরী। আরো ভয় পেলো মানুষটা ভেজা ঠোঁটে লোভে চকচকে সরু চোখে তাকিয়ে। মানুষটাকে এ গ্রামে কে না চেনে! মানুষের জমি আর উঠতি বয়সের মেয়েদের দিকে সবসময়েই হাত বাড়িয়ে আছে। বাজারে বড় গুদামের মালিক সে। তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি কে করে। রহিমের সঙ্গে ভারি খাতির তার।

আতরীর মা রাজি হয়নি—ইতান কি কও গো। আঁর আতরী নি যাইব হতিনের ঘরে।

ক্ষেপে উঠলে রহিম। মাইয়াফোলার আবার হতিন কি! চাইর বিবি ঘরে থাকলে দোষ নাই। পয়সাআলা মানুষ। দুইখান লঞ্চের মালিক। আতরীর মা অরাজি তবু। লোকটা ভালো না। জুলুমবাজ। এক বউকে লাথি-পেটা করে হাত ভেঙেছে। বাজারে গিয়ে নেশা-ভাং করে। চাঁদপুর থেকে বাজারী নটী এনে ঘরে তুলেছিলো একবার। তবু ঠেকান গেলো না। আতরীকে দিতেই হলো। নইলে আতরীদের এক টুকরো বাগান-ঘেরা ছোট কুঁড়েঘর হাতছাড়া হবে। চাকরি যাবে আতরীর ভাইয়ের। আতরীর ইজ্জতহানিও হতে পারে। এসব কথা রহিমই বলেছিলো। আতরীর মায়ের উপায় কি!

বাবুরহাটের একখানা ডুরে শাড়ি আর একটা নাকছাবি পরে আতরীকে চলে যেতে হলো ন'মাস পরে। পোয়াতি শরীর নিয়ে। নজু তিন তালাকে বিদায় করেছে তাকে। ছেলেটা হবার পর থেকে কি যে হলো আতরীর। অমন শান্ত মেয়ে একেবারে বদলে গেলো। যেন খ্যাপা। তারপরই আউল-বাউল।

সবাই বলে পাগল। আতরীর মাথা খারাপ হয়েছে। মাথা কেন খারাপ হবে। আসলে লেগেছে খারাপ বাতাস। আছর হয়েছে জীনের। গ্রামের মানুষ তো এ কথাই বলে। অনুমানটা মিথ্যে ভাববার কারণ নেই। নাইলে সকালে ভালো, বিকেলে খারাপ। পাঁচদিন আগে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় আতরী তো ভালোই ছিলো। এখন ভিড়ের সামনে এসে আছাড় খেয়ে পড়লো আতির মা—আঁর ঝিয়েরে কে মারি হালাইলো। কে আনি হালাইলো…

আবার নতুন খবর হয়ে গেলো সারা গ্রামে। পশ্চিম পাড়ার আতরীকে জীনে মেরে ফেলেছে। লাশ এনে ফেলেছে টানির খালে। লাশটা যে আতরীর এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবু নিখোঁজ মেয়ের জন্য মায়ের বিলাপই যথেষ্ট। শীতের রোদে টান ধরলো। বেলা গড়িয়ে গেলো। লাশের দুর্গন্ধ এসে পৌঁছলো মসজিদ পর্যন্ত। একটা পাগল মেয়ের পচাগলা লাশ ঘিরে সারাবেলা দাঁড়িয়ে থাকার সময় কোথায় মানুষজনের। খালপাড়ের ভিড় হালকা হয়ে গেছে অনেক আগেই। পুলিশ এখনও এসে পৌঁছায় নি। খুনের লাশ দাফন করবার মতো বেআক্কল এখন এ গ্রামে কম। আতরীর মা একাই লাশের মাথার কাছে গড়াগড়ি করে বিলাপ করে চলেছে। আর আতরীর তিন বছরের ছেলেটা ভীষণ ভয়ার্ত ভঙ্গিতে বসে আছে খালপাড়ে।

শীতের রোদে টান ধরেছে। ঢাকা থেকে বেলা তিনটের লঞ্চ এসে যাত্রী নামিয়েছে ইচলির লঞ্চঘাটায়! রিকশা নিয়ে নান্দীপুরের দিকেই ফিরছে মকবুল। খালপাড়ের উঁচুনিচু খানাখন্দ ভরা রাস্তায় আছাড় খেয়ে ঘটাং করে ভাঙল সাইকেলের তিনটে স্পোক। যাত্রী নামিয়ে দিতে হলো। বিগড়ানো মেজাজে রিকশাকেই গালি দিচ্ছিলো মকবুল। হঠাৎ করে থেমে গেলো, পথের পাশে বড় এক ছড়ানো বটগাছ। পেছনে আলু ক্ষেত। আলুক্ষেতের ধারে এগুলো কী! রিকশা রেখে নেমে এলো মকবুল। আলু খেত এদিকটা দলা-মোচড়া। যেন একদঙ্গল মহিষ ছেড়ে দিয়েছে কেউ। ঠিক সেখানেই ধুলো কাদায় মাখামাখি হয়ে গড়াচ্ছে একটা পুরোনো শাড়ি। অর্ধেকটা মাটিতে চাপা দেওয়া। টেনে তুললো মকবুল শাড়িটা। পুরোনো ছেঁড়া শাড়িতে আটকে আছে একটা চাঁদির মাকড়ি। এদিক ওদিক তাকালো মকবুল। এদিকটা জনবিরান। দূরে গাঙপাড়ে কিছু গরু,ছাগল চরছে। ডাংগুলি খেলছে রাখালেরা। অতদূর থেকে এদিকে দেখছে না কেউ।

ঝটপট হাতে শাড়ি পিরান তুলে নিলো মকবুল। ভরে দিলো রিকশার

সীটের তলায়। মাকড়িটা গুঁজে রাখলো কোমরে লুঙ্গির খুঁটে। রিকশা ঠেলতে ঠেলতে একাই কথা বললো – হালার চোরে হামলাই থুইছে আনি। ঠিক তখনি পুলিশের জীপগাড়ি ধুলো উড়িয়ে পাশ কাটালো। চলে গেলো নান্দিপুরের দিকে। আবার সোরগোল উঠলো। কিছু ভিড় জটলা পাকালো ইচলি খালের পাড়ে। মেম্বার, চেয়ারম্যান সবাই এসে গেলো। গ্রামের গণ্যমান্যরাও এলো। শুধু নজু বাদে। সে এক সপ্তাহ আগে ঢাকায় গেছে। ব্যবসার কাজে। পুলিশ লাশ দেখতে গিয়ে সরে এলো। লাশ কোথায়! এতো পচাগলা হাড্ডি মাংসের দলা হয়ে গেছে। কে যেন বললো – ইয়ান মাইনষের লাশ তো ঠাহে না। লাগে য্যান মরা গরু! আতরীর মা পুলিশের পায়ে আছড়া – পিছড়া শুরু করলো – ও বাজানেরা। আঁর ঝিয়েরে কাটায় মাইরছে, কই দি যাও। কেউ একজন গিয়ে সরিয়ে নিয়ে এলো আতরীর মাকে। গ্রামের কিছু লোকজন লাশ তুলে দিলো পুলিশের জীপে। লাশ যাবে চাঁদপুরে। সেখানে লাশকাটা ঘরে কেটেকুটে বের করতে হবে অপমৃত্যুর কারণ। যাবার আগে গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হলো পুলিশের। তারা বললো – মনে হয় রেপ কেস।

পুলিশ চলে যাবার পর কিছুক্ষণ আলাপ চললো মসজিদের মাঠে। এসহাক ব্যাপারী বললো, আরে ফালাই থুই দেও ফুলিশের কথা। ফাগল মাইয়া পোলা। আলুক্ষেতের থন আলু চুরি কইরবার লাই গেছিলো ঠ্যাহে – আইত্‌কালে খালত্‌ পড়ি গি মইরচে।

কথাটা বিশ্বাস করবার কারণ রয়েছে। খালের পাড় দিয়ে টানা আলুক্ষেত। এতো বড় আলুক্ষেতের মালিক এসহাক ব্যাপারী। এর আগে দু'বার ক্ষেতে আলু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে আতরী। পাগল বলেই শুধু ধমক-ধামকে সাবধান করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

রজব মুন্সি আস্তে বললো – কতাখান নি ঠিক বাজান। হকনা খালে ক্যামনে পড়ি মইরব মাইয়াডা? চোখ লাল করে ধমকে উঠলো এবার রহিম মুন্সি, কথা ব্যাক্কলের লাইন কও কির লাই। ইসকিমের পানি ছাইড়ছে। কালিয়া বেইন্যায় ভুলি গেলা নি।

কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ইরিক্ষেতে পানি সেচের জন্য কাল ভোরে স্কিমের পানি ছাড়া হয়েছে। শুকনো খালের বুক এক বেলাতেই টলটলে পানির তোড় ছুটেছে। হতে পারে পানিতেই ডুবে মরেছে।

হঠাৎ খটকা লাগলো রজবের তাবিজ। আবার একদফা হৈ চৈ। তাবিজ খোলা হলো! না খুলে উপায় কি। এসহাক মিয়ার হুকুম। ভিড়ের জটলায় হুমকি ছড়ালো সে—কোন হালার পুতে, কোন বান্দীর বাইচ্চা আর ক্ষেতি করণের লাই আঁর ক্ষ্যাতে তাবিজ গাড়ি থুই গ্যাছে। হেতিরে ধরি দেওন লাইগত।

হুমকি-দামকির শব্দটা জোরালো হচ্ছে না। মকবুল সেটা বুঝলো। কথা বললো না তবু।

তাবিজ চিনতে ভুল হলো না রজব মুন্সির। তার নিজের হাতে লেখা তাবিজ। আতরীকে দিয়েছিলো। চুলে বেঁধে রাখবার জন্য।

এসহাক ব্যাপারীর পাশে দাঁড়ানো রহিম জিজ্ঞেস করলো রজব মুন্সিকে।

—কি চাঁইলা মুন্সি? ক্যাডায় কইচ্ছে এই কাম।

তাবিজটা ছুঁড়ে ফেললো রজব মুন্সি খালের পানিতে। আস্তে বললো—

—শয়তানে কইচ্ছে। এই ব্যাক কাম শয়তানের। ইবলিশের।

বীরপুরুষ

নয়ন রহমান

সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে অকাল বর্ষণের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে রান্নু তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সেরে ছেলে দুটোকে গরম জামা-কাপড় পরিয়ে নিজেও তৈরি হয়ে নেয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর রান্নু বাচ্চা দুটোর হাত ধরে সামনের এক বাসায় যায় টিভি দেখতে। টিভি দেখার সখ রান্নুর আজকের নয়। সে যখন 'মহসিন ভিলায়' কাজ করত তখন হাতের কাজ চটপট সেরে বাবু হয়ে বসে যেত টিভির সামনে। বাসায় কাজ করার এই এক মজা যা বস্তিতে থাকলে কখনই সম্ভব নয়!

দশ বারো বছর বয়স থেকে রান্নু বাসায় কাজ করা শুরু করেছে। লোকে তখন ফুট-ফরমাশ করার কথা বলে কাজে রাখলেও সারাদিনই কাজের পেছনে ছুটতে হত রান্নুর। কেউ এক মুহূর্ত বসতে দিতে চাইত না। ছুটোছুটিতে ওর পা দুটো ব্যথা হয়ে যেত। সে-সব দিনের স্মৃতি রান্নু মনে করতে চায় না। যখন রান্নার দায়িত্ব রান্নু ইচ্ছে করে নিয়ে নেয় তখন কিছুটা আরামের মুখ দেখে। হাতে পায়ে রান্নু তখন অবশ্য অনেক বড় হয়ে গেছে। গরিবঘরের মেয়ে বলে সৌন্দর্যের কোন কমতি ছিল না রান্নুর। আর এই সৌন্দর্য ওকে আজ পাটরানীর সিংহাসনে বসিয়েছে তা মনে মনে স্বীকার করে রান্নু।

'মহসিন ভিলা' রান্নুর জীবনটাকে নানাভাবে পালটে দিয়েছে। কথাবার্তা আদব-কায়দা কাপড়-চোপড় পরার ধরন সবই রান্নু মহসিন সাহেবের মেয়ে শিরীনের কাছ থেকে শিখেছে। সমবয়সী বলে শিরীন ওকে কিছুটা প্রশ্রয়ও দিয়েছিল। শিরীনের কাছেই রান্নুর অক্ষর জ্ঞানে হাতেখড়ি। কাঁচা হাতের লেখায় রান্নু পত্রও রচনা করতে শিখেছিল। ওর রূপ-গুণ দেখেই হানিফ বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল।

তা রীতিমত দু'হাজার টাকার কাবিনে রান্নুর বিয়ে হয়েছে। হানিফ

রাম্নুকে মাথায় করে রাখে। সারাদিন কাটে হানিফের কাজের ধান্দায়। ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ। পয়সা মন্দ আসে না। দেড় কামরার পাকা দালানে রান্নু উঠে এসেছে। দু'ছেলের জন্মও এখানে। পাড়ার সবাই রান্নুর ইতিহাস জানে না। কাজের মেয়ে বলে স্বামীও তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে পরিচয় দেয়নি। রান্নুর বাপ-মা কমলাপুরের বস্তিতে থাকে একথাও কেউ ঘুণাক্ষরে জানে না। তা রান্নু বেশ মানিয়ে চলে। ইদানীং স্বামী ওর সাজ-গোজ নিয়ে একটু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। ওকে ঘরের বাইরে বের হতে দিতে চায় না। বাবা-মার কাছে কালেভদ্রে রান্নু যায়—তাও কেউ টের পায় না। রান্নুর বাবা-মার অবশ্য এ পাড়ায় প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ।

রান্নু সংসারের কাজ সেরে সন্ধ্যার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। ছেলে দুটোও হয়েছে মায়ের মত। টিভি না দেখলে ওদের যেন পেটের ভাত হজম হয় না। রান্নুদের বাসাটা কোনাগলিতে। এখানে গাড়ি চলে না। রিকশা গলির মাথায় এসে থেমে যায়। তবে লোকজন চলে হরদম। আর এই লোকজনের চেহারা সুরতই বলে দেয় এরা বিত্তের বৃত্তে কেউ বাঁধা নেই। বরং রিক্ততাই এদের পরিচয়। দৈন্যতার ছাপ পোষাক-পরিচ্ছদে। হাঁটা চলার ভঙ্গিতে রান্নুর বিত্ত নেই। সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যের উত্তাপ আছে। 'মহসিন ভিলা'য় আট বছর কাটিয়ে রান্নুর একটা সুন্দর মন তৈরী হয়ে গেছে। তাই ছেলে-মেয়েদের রান্নু পাড়ায় কারো সাথে মিশতে দেয় না। নিজেই একটু একটু করে পড়ায়। ইচ্ছে আছে স্কুলে দেবার। অনেক স্বপ্ন রান্নুর দু'ছেলেকে ঘিরে।

হানিফ রান্নুর স্বপ্নের কথা যে জানে না তা নয়। তবে রান্নুর অতিরিক্ত পারিপাট্য, মাথা উঁচু করে চলার অভ্যাস, জানালায় দাঁড়িয়ে মানুষ দেখার আগ্রহ—হানিফ পছন্দ করে না। রান্নু বুঝতে পারে হানিফ যতখানি উন্মাদ হয়ে রান্নুকে ঘরে তুলেছিল ততখানি উন্মাদনা এখন ওর মধ্যে নেই। লোকটা আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসুখ পরায়ণ তো বটেই। রান্নুর বাবা-মা এ বাড়িতে অনাদৃত নয় শুধু—অনাহুতও বটে।

দিন যত পার হয়েছে রান্নুর মনে ততই ক্ষোভ জমতে শুরু করেছে। গরিব বলে কি বাবা-মার পরিচয় থাকবে না। কী অন্ধ মোহে যে রান্নু সেদিন এই লোকটার শর্ত মেনে নিয়েছিল! হ্যাঁ বড় কঠিন শর্ত। রান্নুর বাবা রিকশা চালায়। মা বাসায় বাসায় কাজ করে। ভাই-বোনেরাও কাজ করে। রান্নু

মুখ ফুটে এ কথা কাউকে বলতে পারবে না। বিনিময়ে হানিফ রান্নুকে ঘর দেবে, সন্তান দেবে, সম্মান দেবে। নিজের একটা ছোট সুন্দর ঘরের জন্য রান্নু লোকটার শর্তে সহজেই রাজি হয়ে যায়। আট-বছরের সুন্দর জীবন যাপনের অভ্যাস ত্যাগ করে রান্নু তো বস্তিতে ফিরে আসতে পারে না।

গলিতে নেমেই সান্নু আর পান্নুর যেন পাখা গজিয়ে যায়। ওর হাসিখুশী প্রজাপতির মত উড়ে যেতে চায় সামনে। রান্নু ছোটছেলে পান্নুর কচি হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। আটটা বাড়ির পরই যে একতলা বাড়িটা ওখানে রান্নু ছেলেদের নিয়ে টিভি দেখতে যায়। ও-বাড়ির মেয়েরা রান্নুর ছেলেদুটোকে খুব আদর করে। তা ছেলেরা রান্নুর মত রঙ-চেহারা পেয়েছে। দুটো পুতুলের মত ওরা বড় বড় চোখ মেলে টিভি-র পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকে। রান্নুর বড় খোঁপাটি তখন ও-বাড়ির মেয়েরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। খোঁপাটি আসল কি নকল তা নিয়ে বাজিও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, রান্নু হেসে খোঁপা খুলে লম্বা চুল ছেড়ে দিয়ে ওদের সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে। মিলা ও নীলা রান্নুকেও খুব পছন্দ করে। আজ রান্নু আকাশের সাথে মিল রেখে সুরমা রঙের শাড়ি পরেছে। তাতে চওড়া লাল পাড। লাল একটা টিপও দিয়েছে কপালে। হানিফ রান্নুর টিপ পরা পছন্দ করে না। কিন্তু মণ্টু যেদিন বলেছে—তোমার টিপ কপালে থাইক্যা সরাইও না, সেদিন থেকে রান্নু টিপের দিকে বেশি করে ঝুঁকেছে।

মণ্টু হানিফের বন্ধু। মাঝে মাঝে আসে। ছেলেদের জন্যে হাতে করে এটা-সেটা খাবার আনে। মণ্টু যখন আসে তখন হানিফ বাসায় থাকে না। হানিক তো দুপুরে খেয়ে বের হয়। ফেরে রাত দশটা-এগারটায়। হানিফ নাকি দুটো টিউশানিও করে। মণ্টুর আসা-যাওয়া হানিফ পছন্দ করে না। মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না। মণ্টু একগুচ্ছ টাকা ধার দিয়েছে হানিফকে। মণ্টুর জন্য রান্নুর যে ব্যস্ততা তা টের পেয়ে হানিফ চোখ গরম করে রান্নুকে কিছু বললেই রান্নু বলে তোমার মনটা মুরগির মত। মণ্টু আমার ধর্মের ভাই। হানিফ তখন একটা অশ্লীল গালি দেয়। বলে ঐ সব ধর্মের ভাই-টাই আমি বিশ্বাস করিনা না। তুই ওই হারামজাদার সামনে যাইবি না।

রান্নু তেজের সাথে বলে, ঠিক আছে যাইব না। আর আমি কি সাইধ্যা যাই। তোমার খোঁজে মণ্টু ভাই আসে। আমি দুয়ার বন্ধ কইরা থাকুম!

—হ-থাকবি। দুয়ার খুলবি না। আমি বাসায় না থাকতে মণ্টু আসে ক্যান? হানিফের গলা চড়তে থাকে। তখন রান্নু একেবারে বোবা হয়ে যায়। এ-বাড়ি

ও বাড়ীর লোকেরা এসব চল্লাচিল্লি শুনলে কৌতুহলী হয়ে উঠবে। রান্নু কাউকে ঘরের অশান্তি জানাতে চায় না। কেউ তো সাহায্য করবে না। উল্টে বাজে কথায় পাড়া সরগরম করে তুলবে।

রান্নু এ পাড়ায় কারো বাসায় যায় না। মিলা ও নীলাদের কথা আলাদা। অল্প বয়সী এ মেয়ে দুটো রান্নুকে পছন্দ করে। তা রান্নু সন্ধ্যার পর এসে কিছুক্ষণ টিভি দেখে। হানিফ ফেরার আগেই রান্নু বাসায় আসে। সান্নু পান্নুও বাবাকে ভয় পায়। মার হাত ধরে ওরা আজ গলিতে নামতেই রান্নুর হঠাৎ মনে পড়ে ঘরে জানালা বন্ধ করা হয়নি। বিড়াল সব সাবাড় করে দিতে পারে ভেবে রান্নু পান্নুর হাত ধরে দরজার কাছে ফিরে আসে। পান্নু কি ভেবে মার হাত ছাড়িয়ে দে দৌড়। রান্নু ঘরের সামনে এসে নীচু হয়ে শিকলের মুখে তালায় চাবি লাগায়। অন্ধকারে তালার মুখে চাবি পুরতে একটু দেরি হয়। কিন্তু অভ্যস্ত হাত অবশ্য ভুল করে না। তালা খুলে উঁচু হয়ে দাঁড়াতেই রান্নুর পৃথিবীতে যেন ভূমিকম্প নেমে আসে।

মাগো — বলে চিৎকার করে রান্নু ঘরের সামনে লুটিযে পড়ে। তখন অবিরাম প্রস্তর বৃষ্টির মত দুর্বৃত্তের আঘাত রান্নুকে হত চৈতন্য করে ফেলে। আচমকা মাথায় বাড়ি পড়তে রান্নু বুঝতে পারে না আক্রমণকারী কে এবং কেনই বা হঠাৎ এভাবে প্রহার শুরু করেছে।

রান্নুর আর্তচীৎকারে মানুষজন ছুটে আসে, লাগোয়া ঘরগুলো থেকে মেয়ে পুরুষ সবাইর উপস্থিতিতে সংকীর্ণ গলিটা থিক থিক করতে থাকে। কেউ অবশ্য এগিয়ে এসে আক্রমণকারীর উদ্যত নিষ্ঠুর হাত চেপে ধরে না। রান্নুকে বাঁচাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কারুর নেই।

হারামী মাগী — তুমি সন্ধ্যার পর সাইজা গুইজা রোসনাই করতে যাও। সাতদিন চোরের একদিন সাউধের। আইজ তোরে আমি হাতে নাতে ধরছি। মাইরা লাশ বানাইয়া ফালামু। দেখি তোর রিকশাওয়ালা বাপ আমারে কি করতে পারে। তোর এঞ্জিনিয়ার বাপে আইস্যা আমারে কি করবো — দেখুন আমি······অশ্রাব্য গালিগালাজের তোড়ে জটলা করা মানুষের মধ্যে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। রান্নুর দুর্দশা যে তারা বেশ উপভোগ করছে তাও বোঝা যায়।

রান্নুর পাট-ভাঙা শাড়ী ধূলায় লুন্ঠিত। ব্লাউজ ছিঁড়ে ছাতার বাটের মাথায় উঠে এসেছে পিঠের চামড়া। পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। রান্নুর সংবিৎ ফিরে

আসে। একটুও কাঁদে না রান্থ। এতক্ষণে আততায়ীকে চিনতে পারে রান্থ। স্বামীর হাতের এ ধরনের সোহাগ রান্থ আরো অনেক সহ্য করেছে। তবে প্রকাশ্যে এভাবে বেইজ্জতি হওয়া এই প্রথম। লজ্জায় অপমানে রান্থ যেন মাটির সাথে মিশে যায়! ও যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেত যে যমদূতের মত স্বামী এসে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাহলে জান কবুল একটা শব্দও করত না। নীরবে মার হজম করে রান্থ না হয় মরেই যেত। বাইরের আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তো রান্থ চিৎকার করে লোক জড়ো করেছে ···।

ভীড় এখন পাতলা হয়ে আসছে। স্বামী তার স্ত্রীকে পেটাচ্ছে—এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। নেহাতই ঘরোয়া ব্যাপার স্যাপার!

এরই মধ্যে হয়ত কোন এক উৎসাহী দর্শক সান্থ পান্থকে টিভি-র রঙীন জগৎ থেকে টেনে নিয়ে আসে। মাকে ঘরের সামনে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখে কচি শিশু দুটি চিৎকার করে ওঠে। তখক ওদের কসাই বাপ ওদের গালে জোরে প্রচণ্ড চড় বসালে রান্থ নিজের যন্ত্রণা ভুলে ছেলেদেয় বুকের তলায় লুকিয়ে ফেলে।

অবশেষে বৃষ্টি নামে। শীতার্ত রাত্রের অকাল বর্ষণ। রান্থ ছেলেদের নিয়ে ঘরে ঢোকে।

ওর স্বামী পরিপাটি করে বিছানো শয্যায় বসে তখন হাঁপাচ্ছে। হাড় জিরজিরে শরীর নিয়ে রান্থর মত স্বাস্থ্যবতী বউকে পেটানো চাট্টিখানি কথা নয়।

এখন রান্থ যদি আক্রোশে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে হানিফের কণ্ঠ থেকে চিঁ চিঁ শব্দ বের হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাছাড়া তেমন হলে হানিফ মিস্ত্রিকে উদ্ধার করতে এই বৃষ্টি ভেঙে কেউ এগিয়েও আসবে না।

হানিফ রান্থকে গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে থাকে। রান্থর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহার লক্ষণ দেখা গেলে যাতে দরজা দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব হয় তার জন্য হানিফ দরজাটা হা করে খুলে রাখে। রান্থ কোন রকম আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয় না। বরং জলে ভাসা চোখ নিয়ে ছোট্ট একচিলতে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে।

একটু পরে গায়ে পানি ঢালার শব্দ শোনা যায়। রান্থ শরীর থেকে ময়লা ধুয়ে

ফেলছে। রক্ত ঝরছে হাত দিয়ে, পা আর পিঠে মনে হয় কে যেন মরিচ ডলে দিয়েছে। এত যন্ত্রণায়ও রানু টু শব্দ করে না। ওর বুকটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে অপমানে। হানিফ ওকে আজকাল বড বেশী সন্দেহ করে। বাপ মা তুলে গালি দেয়। যাদের নুন খেয়ে বড হয়েছে তাদেরও ছাড়েনা হানিফ। বেশ রগচটা তা প্রেম প্রেম খেলা শেষ হতেই বুঝতে পেরেছে রানু। তবু নিজের ঘর নিজের সংসার। রানু এ ঘর হারাতে চায় না।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকায়। মেঘ ডাকে।

জানালা দিয়ে বিদ্যুতের ছটা এসে রানুর ভেজা শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতক্ষণ যে নাটক চলছিল—নাটকের সেই ছবিটা যদি বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নষ্ট হয়ে যেত তাহলে রানু অনায়াসে মাথা উঁচু করে বাইরে এসে দাঁডাতে পারত। হানিফ আজকাল ওকে সহ্য করতে পারে না। কেবলই ভয় দেখায় তাডিয়ে দেবার। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসায় গিয়ে নালিশ দেবে বলে একদিন রানু হানিফকে ভয় দেখিয়েছিল। তা শুনে হানিফের কি হম্বি-তম্বি। তোর পালক বাপেরে ডরাই আমি ? নিজের বাপ তো পয়দা দিয়া খালাস। কোন শালা আমারে কি করতে পারবে দেখুম আমি। তুই কোর্টে যাবি, আমার নামে নালিশ দিবি—আমি বইসা থাকুম ভাবছোস ? আমিও এসিড দিয়া তোর মুখ পোডাইয়া দিমু। হানিফ আরও কত কি বলে রানু প্রতি-উত্তর করে না। রানু বোঝে হানিফের এসব মিথ্যে লম্ফ-ঝম্ফ নয়। হানিফ বড় হিংস্র।

মা-মাগো বাইরে আসো। বড ছেলে সানুর কণ্ঠস্বর। রানু তাডাতাডি বাস্তবে ফিরে আসে। কাপড বদলে ঘরে এসে দেখে পানু বিছানায় কাদার মত পড়ে আছে। হানিফও তার পাশে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে। হানিফ এতক্ষণ বড পরিশ্রমের কাজ করেছে।

রানুর ভেজা ফোলা মুখের দিকে তাকিয়ে সানু বলে, মা তুমি কানছো ? লও আমরা ধানমণ্ডি নানার বাসায় যাই।

শ্বাপদের মত দৃষ্টি নিয়ে হানিফ বিছানায় উঠে বসে। রানুকে দেখে ওর মেজাজটা মুহূর্তে আগুন হয়ে যায়। বর্ষণ শেষে মেঘলা আকাশ যেমন ঝকঝকে হয়ে ওঠে গোসল শেষে রানুকে তেমনি দেখাচ্ছিল।

ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো চেঁচিয়ে ওঠে হানিফ। যা-যানা তোরা এঞ্জিনিয়ার বাপের বাড়ী। রিশকা ডাইক্যা দিতাছি। চইলা যা একেবারে চইলা যা।

হানিফ আজ রাতে যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে তা বুঝতে কষ্ট হয় না রান্নুর। রান্নু নিজেকে সংযত করে। একবার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসায় গিয়ে হানিফ রান্নুর চরিত্র নিয়ে খুব আজে-বাজে কথা বলে এসেছিল। একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে হানিফ। রান্নু বেরিয়ে গেলেই হানিফের দুয়ারে সুযোগের ঘোড়াটা এসে দাঁড়াবে।

রান্নু ছেলেকে বিছানায় তুলে দিয়ে ঝট করে লাইট নিবিয়ে দেয়। তারপর দরজা বন্ধ করে ছেলের পাশে শুয়ে পড়ে।

রান্নুর এরকম শীতল ব্যবহারে একেবারে চুপসে যায় হানিফ। মনে মনে ভাবে এর মানেটা কি? উত্তেজনায় ওর লিকলিকে হাত-পা কাঁপছে থর থর করে। ওর কেমন ভয় করতে থাকে। রাত যত গভীর হয় ভয়ের দৈত্যটা ততই ওকে জাপটে ধরে। রান্নুর মনের কথা পাথর চাপা আছে। হানিফের অবর্তমানে বাসায় রান্নুর কাছে একজন আসে—রান্নু তার সাথে দেখা করতে যায় এরকম একটা সন্দেহ হানিফকে অনেকদিন থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আজ এত মার খাওয়ার পরও রান্নু কোন প্রতিবাদ না করে কেমন চুপচাপ শুয়ে আছে—হানিফের মাথার মধ্যে সন্দেহের ধোঁয়া চক্কর দিতে থাকে। পেটের মধ্যে হাজার দানবের দাপাদাপি ওকে অস্থির করে তোলে। তখন হানিফ ফট করে বাতি জ্বালায়। ঘরের এককোণে রান্নার সরঞ্জাম। ক্ষুধার্ত হাঁসের মতো হানিফ তখন থালা বাটিতে শব্দ তুলে গোগ্রাসে ভাত গিলতে থাকে।

পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙে হানিফের। হানিফ ধড় ফড় করে উঠে বসে। দরজা-জানালা বন্ধ বলে প্রথমে কিছু ঠাহর করতে পারে না। বিছানাটা কেমন খালি খালি লাগছে। ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে দেখে ছেলেরা নেই। ধক্ করে ওঠে হানিফের বুকটা। চট করে দরজা খুলতে গিয়ে আর একটা ধাক্কা খায়। দরজা ভেজানো। কপাট মেলে ধরতেই আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোট্ট ঘরখানায়। হানিফ দেখে ঘর শূন্য। তখনই হানিফ ছুটে যায় ধানমণ্ডি। না রান্নু সেই নিরাপদ দুর্গে যায়নি। তাহলে?

রান্নু কি সেই সন্দেহভাজন লোকটির সাথে পালিয়েছে? লোকটিকে রান্নু ধর্ম ভাই ডাকে। চড়-চড় করে মাথায় রক্ত উঠে যায় হানিফের। হানিফ ছুটে আরামবাগ। ধর্মভাই বাসায় নেই। তার বউ ছেলে-মেয়ের কাছে কথাটা ভাঙেনা হানিফ। তখন কমলাপুরের বস্তির দিকে পা বাড়ায় হানিফ। রান্নু যে বস্তিতে যায়নি সে বিষয়ে হানিফ নিশ্চিত। নির্ঘাত ঐ লোকটির সাথেই রান্নু

পালিয়েছে। রান্নুর বাবা-মাকে তাদের সুকন্যার কীর্তি কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করার মহড়া দিতে দিতে হানিফ বস্তি এলাকায় ঢোকে। উঁচু রাস্তার পাশেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বস্তি। কাঁচা নারকেলের ছোবড়া আর টুকরো টুকরো রং-বেরং এর কাপড়ের স্তূপ ঢিপ করে রাখা আছে এক একটা ঝুপড়ির সামনে। নাকে কাপড় গুঁজে আসতে হয় এসব জায়গায়। হানিফ হন হন করে রান্নুর বাবার ঝুপড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। সব ঝুপড়িই দেখতে প্রায় এক রকম। কোনটা রান্নুর বাবার তা ঠিক মনে করতে পারে না হানিফ। কারণ এখানে মাত্র দু'একবারই এসেছে ও।

হানিফকে অবশ্য বেশী খুঁজতে হয় না।

দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে হানিফ দেখে ওর রূপসী স্ত্রী রান্নু একটা ঝুপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ওপারে খোলা জায়গায় ছেলে দুটো ছোটাছুটি করছে।

রান্নুও হানিফকে দেখতে পায়। হানিফকে দেখে রান্নু নড়ে না চড়ে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে/ ছেলেরাও বাবা বাবা বলে ওর কাছে ছুটে আসে না। হানিফের ভেতরে বুনো হাতিটা হঠাৎই যেন পা গুটিয়ে বসে পড়ে। অনাহূত হানিফ ঝুপড়ির সামনে এগিয়ে যেতে ভয় পায়।

রান্নু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুপড়ির উচ্চতার চাইতে রান্নুর উচ্চতা বেশী। চারদিকের এত মালিন্যের মধ্যে রান্নুর দাঁড়াবার ভঙ্গীটুকুতে কি এক অহংকার প্রকাশ পাচ্ছে। ধানমণ্ডির ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাড়ীতে যে লতানো রান্নুকে হানিফ দেখেছে এ যেন সে নয়। হানিফের মুখে সহসা কোন কথা যোগায় না।

বস্তীর কৌতূহলী বৌ ঝিরা রান্নুর দিকে হানিফকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে রান্নুর মাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওগো রান্নুর মা, দ্যাহ কেডা আইছে তোমার মাইয়ার তালাশে।

ঝুপড়ির ভেতর থেকে রান্নুর মা বলে, কেডা আইছেরে রান্নু ?

রান্নু তেমনি গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে উত্তর দ্যায়—বীরপুরুষ আইছে মা, বীরপুরুষ।

সূর্য তৃষিতা

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

ভোর হয়ে এসেছে। দূরের কোন মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসছে আজানের সুমিষ্ট স্বর।

শেষ আশ্বিনের হিমের হাওয়ায় গা শিরশির্ করে উঠে কলিমনের। দু'চোখ ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরও জড়িয়ে আসছে। পুরানো নকশা করা কাঁথা-খানি গায়ে টেনে ছ'মাসের ছোট্ট ময়নাকে বুকের আরও কাছে টেনে নেয়।

ময়নার গোলগাল ছোট্ট মুখে একরাশ রেশমের মত কালো চুল ছড়ানো। ঐ দুধের বাচ্চাকে ফেলে এখনই আবার কাজে ছুটতে হবে।

চাঁচের বেড়ার অপর পাশেই জমিলা বিবির ঘর। জমিলা সদ্য ঘুম থকে উঠে আলস্যের হাই তুলছে।

দাওয়ায় ছড়িয়ে পড়া চিকন হলদে রোদের দিকে তাকিয়ে কলিমন চমকে উঠে। পাশে শুয়ে থাকা এগারো বছরের শ্যামলা মেয়েটিকে জোরে জোরে ধাক্কা দেয়।

—ও বানু লো ওঠ্, ওঠ্। উইঠ্যা দেখ্, কতহানি বেইল্ হইছে।

সাহার বানু ঘুম জড়ানো চোখে আড়মোড়া ভাঙ্গে। তারপর আবার শুয়ে পড়ে।

এই ঘুমকাতুরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কলিমনের বুক ছল্ছলিয়ে উঠে। নিজের পেটের মেয়ে ও নয়। কলিমনের অতি আদরের আধপাগলা দেবর রহিমের মেয়ে। সময়ে-অসময়ে সে 'ভাবী' বলে ডাকতো। আহা, কোথায় আজ রহিম, কোথায় তার মুখরা বৌ ফুলবানু।

নিজের অজান্তেই সে তার রুক্ষ হাতের দিকে তাকায়। এই খস্খসে হাতের আঙ্গুলগুলোই একদিন চাঁপার কলির মত ছিল। গরীবের মেয়ে কিন্তু বাপজান কোনদিন এই হাত দিয়ে গোবর নিকাতে দেয় নি। বাসন

মাজতে দেয় নি। আজকাল ছোট্ট হাত-আয়নায় যখন নিজের মুখ দেখে তখন তার নিজেরই অবাক লাগে। এই স্বল্প চুল, মাঠের মতো চওড়া কপাল, রোদে পোড়া তামাটে মুখ—কি সেই মোড়ল বাড়ীর বড় বৌ কলিমন বিবির ?

যখন শুধু রূপের ঐশ্বর্যে সে মোড়ল বাড়ীর বৌ হতে পেরেছিল তখন তার বয়েস আর কতো ?

নয়-দশ হবে। গাঢ় লাল রঙের জমিতে সোনালী ময়ূর আঁকা টাঙ্গাইলের শাড়ী পড়ে পোঁটলার মত বৌ যখন পাল্কী চড়ে মোড়ল বাড়ীর দাওয়ায় নেমেছে, শাশুড়ী রূপোর বাজু দিয়ে মুখ দেখেছে। হাসি ভরা মুখে পড়শীকে বলেছে,

—দেখ্ লো আলিমার মা, লাল মরিচের লাকান বৌ হইছে আমার—

আলমের মায়ের নিজের বৌ ছিল কালো। মুখের গড়নও ভালো ছিল না, আর তা নিয়ে আলমের মায়ের ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

আলমের মা বলেছিল,—মুখের গড়নতো তোমার পোলার বউ-এর ভালই। মাথায় চুলটুল আছে নি ?

মাথার একহাত ঘোমটা সরিয়ে আলমার মা অবাক হয়ে যায়। কালো পাথরের বাটির মতো মস্ত এক খোঁপা। মাথার চেয়েও বড়ো।

জমিলা বিবর্ণ বোরখার ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ঘরের সুমুখে এসে দাঁড়ায়।

—বিছানা থাইক্যাই উডস্ নাই এখনও ? আজ কামে যাইবি না ?

কলিমন ধড়মড় করে উঠে পড়ে।—শরীল্ডা আইজ ভালা লাগ্তাছে না রে লাবুর মা।

—তো আইজ কামে গিয়া কাম নাই।

ঠোঁটের কোণে করুণ হাসি চিক্‌চিক্ করে ওঠে কলিমনের।

—একদিন কামাই করলে মাইনার টাকা কাটবো না ?

সমব্যথী লাবুর মা বলে—আমাগো দুঃখ, কি আর টাহা-পয়সাওলা মাইন্‌ষে বুঝবো ? আমি অহন যাই লো, বান্নুর চাচী।

জমিলা চলে যেতেই কলিমন জোরে জোরে ধাক্কা দেয় সাহার বান্নুকে। এতোক্ষণ নিজের অতীত ভাবনার মাঝে এতো আত্মস্থ ছিল যে, কাজে যাবার কথা সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।

ঠিকে কাজ যাবা করে, ওরা দরজায় ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

আশ্বিনের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে বাইরে। সে রোদের দিকে তাকিয়ে কলিমনের মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে উঠে।

সাহারবানুকে প্রায় টেনে তুলতে তুলতে বলে—নবাবের বিটির যে ঘুম ভাঙতেই চায় না, কামে যাইবি না আইজ।

দু'হাতে চোখ রগ্‌ড়ে বানু ওড়নাখানি গায়ে জড়িয়ে নেয়।

ময়না ততক্ষণে জেগে উঠেছে। তারস্বরে চিৎকার করছে ক্ষুধায়।

কলিমন রাগে-দুঃখে কুপি থেকে বেশ কিছুটা কেরোসিন তেল খড়কুটোতে ঢেলে দেয়। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চুলো ধরিয়ে ছোট্ট পোড়া সসপ্যানে ময়নার জন্য বার্লির পানি চাপায়।

বানু এককোণে রাখা ডেকচি থেকে পান্তা ভাত টিনের থালায় বাড়ে। দু'টো শুকনা লঙ্কা পোড়া আর খানিকটা মুন দিয়ে বলে,

—তুই খাইয়া ল চাচী।

কলিমন দড়িতে ঝুলানো রঙ্‌-চটা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কালো রঙের শতচ্ছিন্ন বোরখাখানি গায়ে জড়িয়ে বলে,

—তুই ময়নারে বার্লি খাওয়াইয়া কামে আইছ। আমি শরিফাবাদের লাইনে যামু। তুই নাজমাবাদের যাইস, বুঝচ্ছনি? জল্‌দি কর। রোজ রোজ দেরি কইরা কামে গেলে কাম থাইক্যা উড়াইয়া দিব না?

কলিমন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পা চালায়।

'মূসা কলোনী' আসন্ন দুপুরের রোদ মেখে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। কে বিশ্বেস করবে, শেষ দুপুর থেকে সারারাত এ কলোনীতে চ্যাচামেচি চলে। এই মহানগরী করাচীর কতো অলিগলির গোপন ঘটনা একে অপরকে বলে। সারাদিন একটানা কাজের পর, শেষ দুপুরে ভাত খেয়ে একমুখ পানজর্দা মুখে পুরে ওরা প্রাণ খুলে হাসে। মহল্লার অশ্লীল গালগল্পে ওরা মুখর হয়ে উঠে। নীরব, স্থিতধী কলোনী ওদের কলকাকলীতে ভরে যায়।

হগস্‌বে, ক্লিফটনের জোয়ারের উচ্ছ্বাস, নিয়ন আলোর শত শত নীরব বিজ্ঞাপন, সাগরের বুক ছুঁয়ে আসা হিমেল হাওয়া, রিকশা-মোটরগাড়ীর দিন-রাত্রি মিছিল—সোসাইটি, বাথ, আইল্যাণ্ড আর কুইন্স রোডের স্কাইস্ক্রেপার বাড়ীগুলো নিয়ে যেখানে করাচী নগরীর পরিচয়, কে-ই বা জানতে চায়, চট আর চাঁচ দিয়ে কুকুরের মতো আস্তানা গেড়েছে কতো দেশছাড়া, বন্যা আর ঘূর্ণিঝড়ে খুইয়ে আসা অসহায় ভেতো বাঙালীর দল একমুঠো ভাতের আশায়।

লাউ আর সিমগাছের মাচান, পুঁই এর নধর ডাঁটার জংলা-ঘেরা মাটির নিকানো আঙ্গিনায়—নাকে নথ পরা কতো কিশোরীর ভীরু স্বপ্ন, কতো বাজুবন্দ পরা স্বামী সোহাগিনীর শত শত কামনা আজ এই নগরীর বুকে মিথ্যে স্বপ্ন হয়ে মাথা কুটে মরছে।

সারাদিন ঠিকে কাজ করে শেষ দুপুরের দিকে কলিমন ঘরে ফিরে আসে। নসিবন, ছমিরন কলরব করে উঠে। 'মারে আইছে। মায়ে আইছে।'

কলিমন ময়নাকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—বানু এহনও আহে নাই?

—বুবু আহে নাইক্যা।

ঘরের কোণের এলুমিনিয়ামের ডেকচিতে পান্ত ভাত পড়ে আছে। বানু বুঝি খেয়েও যায় নি। ভ্যান্ ভ্যান্ করছে নর্দমার মাছির ঝাঁক। আহা, বানু আজ এতোক্ষণ উপোস করে আছে।

গরমে পচে উঠা পান্তা ভাতগুলো ফেলে হাঁড়িখানি ভালো করে মেজে তাড়াতাড়ি ভাত চড়িয়ে দেয় কলিমন। ঘরে ফেরার সময় 'মছ্‌লী ওয়ালার' কাছ থেকে চার আনার কুচো চিংড়িও এনেছে।

নসিবনকে বলে—ময়নারে মাটিত বওয়াইয়া আয় দেহি। মাছগুলান কুইট্টা দে।

উথ্‌লে উঠা ভাতের হাঁড়িতে নাড়া দিয়ে, মা-মেয়ে মাছ কুটতে বসে। কলিমন ভাবে, করাচীতে এসে এ মাছও কিনে খেতে হয়। দেশের বাড়ীতে বৃষ্টিঝরা বর্ষার দিনে ভিজে ভিজে রহমত ছোট্ট জাল দিয়ে চিংড়ি মাছের পাহাড়ে ভরে তুলতো রান্নাঘরের দাওয়া। এখন এইমুঠো 'ইচাকে' বলতে হয় 'ঝিঙ্গা', ওজন করে পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয়।

কুটে আর মাছ কতোটুকু হয়? একফালি কদু হলে বেশ হতো। খাওয়ার মুখ তো আর কম না। এই ক'টা চিংড়ি দিয়ে কি হবে। পাঁচ-সাতটা বাড়ীতে বাসন ধুয়ে, কাপড় কেচে ক্ষুধাও লেগেছে খুব।

কলোনীর গফুর শহরে সব্জি ফেরী দিয়ে ফেরে। সময়ে-অসময়ে ওর কাছ থেকে তরিতরকারির সাহায্যও পাওয়া যায়। এই দুর্দিনে তাও কি কম?

গফুরের বয়স অল্প। জোয়ান, তাগ্‌ড়া। সিলেটের খিত্তারপাড়ে বাড়ী। বাপের সঙ্গে রাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। সে সময়ে-অসময়ে কলিমনকে ঠাট্টা করে। ঘনিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করে। কলিমন তাই তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে।

কলিমন জানে, এ কলোনীতে তার ঘরে গফুরের যাওয়া-আসা নিয়ে কানাকানি করে সবাই। কিন্তু কি করবে সে? কি করে সে মহল্লার সবাইকে বুঝাবে, সে নষ্ট মেয়ে মানুষ নয়। ঘরে-বাইরে তাকে কাজ করে খেতে হয়। ময়নার আব্বা, রহমত দেশেব বাড়ীতে গেছে মাস ছয়েক আগে। দেশের বাড়ীর জমি-জিরাত যা আছে তার সুবন্দোবস্ত করে আসার জন্য। কিন্তু সেই যে দেশে গেছে এতোদিনেও তার ফেরার নাম নেই। একজন পুরুষের নিরাপত্তা যে কতো প্রয়োজন একটি নারীর জীবনে, এই কিছুদিনে তা প্রতি পদে পদে অনুভব করেছে কলিমন।

কলিমন বলে—ভাতটা দেখরে বাবু, আমি এট্টু কদু লইয়া আহি।

গফুর চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি চড়িয়েছে। বিড়িতে সুখটান দিয়ে আপন মনে গান গাইছে—

ভাল কইরা বাজান গো দোতরা
সুন্দরী কমলায় নাচে।

কলিমন হেসে ফেলে।—সুন্দরী কমলার আর নাচনের কাম নাই। এক পাও কদু দেও দেহি সব্জিওয়ালা মিয়া।

গান থামিয়ে গফুর বলে—এখানে কদু কইয়ো না গো ময়নার মা। কইও 'লোকি', বুইঝোনি?

কলিমন বলে—কত দিমু?

গফুর কচি লাউ-এর বেশ খানিকটা টুকরো কলিমনের হাতে তুলে দিয়ে বলে—লইয়া যাওগি ময়নার মা। তোমারটাইন থাকি পয়সা লইমু, একটা একটা কথা কইলায় না কিতা তুমি?

কলিমন ঘরে ফিরে এসে ত্রস্ত হাতে কদু কুটে চিংড়ি মাছ দিয়ে তাড়াহুড়ো করে রান্নার পাট চুকিয়ে নেয়।

আজ দু'বাড়ী থেকে ধনেপাতা দিয়ে রান্না করা বাসি ডাল, একটু 'গোশতের ছালুন' ও পেয়েছে। কাজের বাড়ী থেকে ঐটুকু সাহায্য প্রায়ই মেলে। বাসি ডাল ও বাড়তি তরকারি তার মতো গরীবের সংসারে কম সাহায্য নয়। তরকারিগুলো গরম করতে করতে কলিমন একমনে ভেবে চলে।

গোসল সেরে সবাই খেতে বসে বসে। ময়না কলিমনের কোলে শুয়ে শুয়ে মাই টানে। মনের খুশীতে কখনও বুকের কাপড়, কখনও ছোট্ট দু'টি হাত

দিয়ে জাপ্‌টে ধরে, কখনও তার 'শক্ত মাড়ি দিযে কামড় দেয় আর খিল্‌খিল্‌ করে হাসে।

খেতে খেতে কলিন হাসে—এই শয়তান—কি করতাছ ?

শিশু মায়ের দুর্বোধ্য ভাষা না বুঝে খুশিতে মুখ দিয়ে শুধু অস্ফুট শব্দ করে।

কলিমন বান্নুর পাতে আরো খানিকটা কদু তুলে দেয়। বান্নু বলে—

—আর দিছ্‌না রে চাচী।

—খা, খা পেট ভইরা খা। আইজ 'শরিফাবাদের' উর্দুওয়ালী কি কইলো রে বান্নু ?

—কয়, এক ঢোক পানি গিলে বান্নু বলে—রোজ দেরি কইরা কামে আইবি। এমুন করলে উডাইয়া দিমু।

কলিমন খেতে খেতে বলে—খালি ডর দেহায়। উডাইয়া দিলে উডাইয়া দিবো। 'নাজিমাবাদের' বাঙালী বাসায কইছে কাম করাইবো।

বান্নু বলে—এতো 'বর্তন' আইজ দিচ্ছিল রে চাচী, ঘরের বেবাক বর্তন ধুইয়া শেষ কবরার পারি না।

শেষ দুপুরে ভাত খেয়ে পানদোক্তা মুখে পুরে বসতে না বসতে ক্লান্ত চোখ দু'টো ঢুলে পড়ে।

হুশ করে আসন্ন বিকেলটুকু ফুরিয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর রান্নার পাট সেরে মুসা কলোনীর ছেলে-বৌরা সবাই বাইরে এসে বসে, একে অন্যের সাথে সুখ-দুঃখের গল্প করে। ফেলে আসা নিকানো আঙিনা, লাউ আর সীমগাছের জাংলা-ঘেরা ঘর-বাড়ীর কথা বলতে বলতে কারুর কণ্ঠ ছলোছলো হয়ে উঠে।

একসময় রাত ঘনিয়ে আসে। কোলের বাচ্চাদের খাওযানোর তাগিদে কেউ কেউ উঠে ঘরে যায়। কেউ বা ছেলেমেয়েদের খাইয়ে নিজেরাও বিছানা নেয়। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে বসে বসে সবাই হাই তুলে। একসময় সবাই ঘরে ফিরে যায়। দরজায় দরজায় ঝাঁপ পড়ে। সমস্ত বস্তিটা নীরব নিঃঝুম হযে ঘুমিয়ে থাকে।

শুধু স্তব্ধ সুনীল আকাশের অজস্র তারার দিকে কলিমন অসহাযের মতো তাকিয়ে থাকে। ভাত ঠাণ্ডা কর্‌করে হয়ে গেছে। পেঁয়াজকুচি আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাখানো বেগুনের ভর্তা এতক্ষণে পান্‌সে হযে গেছে। বুক তার নিশীথের নিভৃতে হু হু করে উঠে। রহমতের ভালোবাসা আর সোহাগে

ডোবানো দু'টি চোখে বেদনার অশ্রু জাগে।

কবে ফিরবে রহমত? এই নি:সঙ্গ জীবন, এই চারটি শিশু সন্তানকে নিয়ে জীবন-যাত্রার ভার সে যে আর বইতে পারছে না।

চার-পাঁচদিন থেকে ময়নার জ্বর। দু'দিন কাজে কামাই করেছে কলিমন। ময়নার গা আজও জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, অথচ কাজে না গেলেই নয়। মনে পড়ে যায় গিন্নীদের রক্তচক্ষু, ক্ষুরধার বাক্য। দু'দিন কামাই-এর জন্য কতো কথাই না শুনতে হবে।

কলিমন চোখ বুঁজে ভাবে, ঈদও এসে গেছে। কাজের ছ'বাড়ী থেকে, ঈদের ছ'টি রঙিন কাপড পাবে। সারাটি বছর তাই দিয়ে চালিযে নেয় সে। পরনের নীল রঙের শাড়িখানি শতচ্ছিন্ন। আব্রু আর রাখা যায় না এই কাপড়খানি দিয়ে।

—আম্মা গো, কামে যাইবি না আইজ?

দশ বছরের মেয়ে নসিবনের ডাকে আত্মস্থ হয় কলিমন। চাঁদের বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতের মিঠে রোদ ছড়িয়ে পডেছে ঘরের দাওয়ায়।

বোরখাখানি গায়ে দিয়ে কলিমন ত্রস্ত পা দু'খানি চালায়। মুসা কলোনী শীতের ভেজা ভেজা রোদ গায়ে মেখে ঠাঁয় দাঁডিয়ে রইলো।

শরিফাবাদের বাঙালী বাসায় কাজে যেতেই বিবি সাহেবা বলেন—এমন করলে কি করে চলে কলিমন? এ মাসে এমনিতেই অনেক ছুটি নিয়েছ।

কলতলার নীচে শুকিয়ে চচ্চডি হওয়া একরাশ বাসনে বালি আর সাবান ঘষতে ঘষতে মৃদুস্বরে কলিমম বলে—কি করুম গো বিবিসাব। মাইয়াডার বড়ো জ্বর। থুইয়া আইবার পারি না।

—আহা, কদ্দিন থেকে?

—তিনদিন থাইক্যা গো বিবিসাব।

অল্পবয়েসী বৌটিকে বড্ড ভালো লাগে কলিমনের। বড়ো মায়া-মমতা। কাজ শেষ করে যাবার বেলা কাগজের মোড়কে দু'টো বিস্কুট, খানিকটে হরলিক্স্ চিনি দিয়ে বলল—মেয়েকে দিও কলিমন।

শীতের বেলা। দুপুরটুকু হুশ করে ফুরিয়ে যায়। ছ'সাত বাড়ীতে বাসন মেজে, কাপড় কেচে কুলিয়ে উঠতে পারে না সে। হাত পা অবশ হয়ে আসে। মাথার কোষ ঝাঁ ঝাঁ করে। কিন্তু কাজ ছাড়লেই বা তিন চারটে মেয়ে নিয়ে এই অচেনা নগরীতে কে দু'মুঠো ভাত দেবে।

নাজিমবাদের বাসায় গিয়ে দাঁড়াতেই বিশালবপু গিন্নি খ্যাচ, খ্যাচ, করে উঠেন।

—ক্যাযা বাত, হে কলিমন্? হর মাহিনা তুম্ ছুটি করতি হে? আজহি কাম ছোড়্ দোও।

কলিমন ভীরু কণ্ঠে বলল—নেহি নেহি বিবিজী—ছোটি বাচ্চী কি বিমার থি—

—আরে ছোড়ো ভাই বিমার, বিমার। কামাল করতি হে মাসি—হর রোজ তুম ছুটি করতি হে। ছোড়দোও কাম। ম্যায় খোদ কাম করুঙ্গী।

গলায় জড়ানো দোপাট্টাখানি কোমরে সেঁটে গিন্নী নিজেই কাজ করার জন্য হাত বাড়ান।

কলিমন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। দু'কাজের জন্য বিশ টাকা মাইনে দেয় ওরা। মধ্যে মধ্যে বাসি-পোড়া তরকারি, এটা-সেটা দেয়। সবচেয়ে লোভনীয় ঈদে পাওয়া আনকোরা নতুন একখানি শাড়ী।

বেডসাইড টেবিলে পেতলের ট্রেতে সাজানো আঙ্গুরের থোকা খালি চায়ের পেয়ালা, আর ঐ রক্তলাল উজ্জ্বল রঙ কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে কলিমনের পা দু'টি নিঃসাড় হয়ে আসে।

ফুঁপিয়ে ওঠে কলিমন। এ কাজ গেলে যে নিজের তিনটি মেয়ে ও সাহার বান্নুকে নিযে উপোস করে মরতে হবে। কি করে সে বিবিজীকে বুঝাবে তার মতো দুঃখিনীর এ সংসারে কেউ নেই। বুক জুড়ে তার উথাল-পাতাল ঢেউ। রুদ্ধ কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠে কলিমন।

বিবিজী বিরক্ত হযে উঠেন—আরে পের ছোড়ো। কিউ রো রাহি হে?

—বিবিজী, মেরী ছোটি বাচ্চী মর্ চুকী।

মায়ের হৃদয এবার সহানুভূতিতে সিক্ত হয়ে উঠে। আহা, বাচ্চাটি মরে গেছে।

— বাত তুম্ পেহেলে কিউ নেই বোলা, মাসি?

কলিমনের হাতে পাঁচ টাকা গুঁজে দেন বিবিসাহেব। কড়্কড়ে নোটখানি আঁচল বেঁধে কলিমন রাস্তায় নামে।

শেষ দুপুরে ঘরে ফিরে এসে ময়নাকে বুকে চেপে ধরে। ক্লান্ত দেহ স্নায়ু অবশ হয়ে আসছে। জিভ্ শুকিয়ে কাঠ। বান্নু রান্না চড়িয়ে দিয়েছে। উথ্‌লে উঠা ভাতের হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে কলিমন ক্লান্ত কণ্ঠে

বলে—ও নসিবন, এক গেলাস পানি খাওয়া দেহি।

টুক্‌টুক্ করে নসিবন পানি নিয়ে এলো। ময়না, নসিবনের দিকে তাকিয়ে দু'চোখ তার সজল হয়ে উঠে। হায় আল্লা, কাজের তাগিদে কতো মিথ্যে কথাই যে বলতে হয়। তুমি তাতে দোষ নিও না আল্লা। তুমি বহুত মেহের-বান। তুমি আমার বাছাদের ভালো রেখো।

কলোনীর মালেক এসে বলে—ও বান্নুর চাচী, তোমার চিঠি আইছে।

খুশীতে ঝিক্‌মিকিয়ে উঠে ক্লান্ত মণিতারা। আগ্রহের সাথে চিঠিখানি হাতে নিয়ে মালেকের হাতেই ফিরিয়ে দেয়।

—তুমিই পড়ো। আমি তো পড়বার পারি না।

আশার দোলায় কলিমনের হৃদয়খানি দুলে দুলে উঠে। ময়নার বাপ কবে ফিরে আসবে, চিঠিতে তো তাই লিখা থাকবে।

চিঠিখানি পড়তে পড়তে থম্‌কে যায় মালেক। কলিমনের উৎসুক মুখের দিকে তাকায়। কলিমন তাড়া দেয়।—

—জলদি কইরা পড়ো, ভাই।

—কি আর পড়ুম কলিমন বিবি। হেঁইয়ায় ফের বিয়া করছে।

বাইরে থেকে কেউ দেখলো না, কেউ বুঝলো না কলিমনের কোমল বুক জুড়ে তীরের ফলার মতো, বেদনার বহ্নিশিখা জ্বলনে লাগলো। বিলাসস্বর্গ করাচীর বুকে তারমতো স্বামীহারা, গৃহহারা, এক রূপহীনা, যৌবনহীনা নারীর অসহায়ত্বের কথা ভেবে তার দু'চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সন্তানগুলো আজ আর খাবার জন্য বায়না ধরে না। বান্নু ভাতের ডেকচি নামিয়ে তেল-নুন দিয়ে সবাইকে ভাত দেয়। নীরবে ওরা খেয়ে নেয়।

জমিলা এসে সান্ত্বনা দেয়—কাইন্দা আর কি হইবো? এই জাইতটাই এমুন।

অস্নাতা, অভুক্তা কলিমন পাঁশুটে রঙের বিকেলের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকে। ভাবতেই অবাক লাগছে তার আদরের সন্তান আর কলি-মনকে দূরে ঠেলে, সে আবার বাসর সাজিয়েছে আম-জাম ঘেরা ছোট্ট মাটির ঘরে। হাস্নাহেনার সৌরভে মদির সেই চাঁদভরা রাতে দুটি নর-নারী আবেগে ভালোবাসায়-উচ্ছ্বাসে বিহ্বল হয়ে যাবে—একথা ভাবতেও কলিমনের বুক ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চায়।

দাওয়ায় বসে অঝোরে কেঁদে চলে কলিমন। শক্ত জোয়ান পুরুষ রহমতের

বুকে ঠাঁই পেয়ে পরম নির্ভরতায় তাকেই আঁকড়ে ধরেছিল সে। শুধু তার ঘরনী নয়, তিনটি সন্তানেরও জননী সে। উপর্যুপরি বন্যা আর নদীর ভাঙ্গনে ঘরবাড়ী হারিয়ে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও সে তরী ভিড়িয়েছিল।

সামান্য কারণে এক একদিন রহমত রাগ করে মেরেছে কলিমনকে। কতো দিন কঞ্চির ঘায়ে গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। ফুলে ফুলে কেঁদেছে কলিমন। এরই মধ্যে রহমত লালুখেত থেকে ফুলেল তেল, চুলের টাসেল, রঙিন ফিতে এনে মানিনীর মান ভাঙিয়েছে, কতোদিন বস্তির পাশের পানের দোকান থেকে চার আনা দামের পানের খিলিও এনে দিত রহমত। একমুঠো নারকোল আতর আর মসলার সুগন্ধ ভরা পানের গায়ে রূপোলী তবক্ আঁটা থাকত। পানখানি মুখে দিয়ে স্বামী সোহাগিনী কলিমনের ঠোঁটে হাসি ধরত না।

এই নগণ্য আস্তানা, নর্দমার পূতিগন্ধ ভরা এই প্রায়ান্ধকার ঘুপ্‌চি ঘরে দুঃখের দিন যেমন আসতো, সুখের দিনও আসতো, কিন্তু আর কোনদিন এই-ঘরে সুখের দিন আসবে না। মোমের ভীরু শিখার মতো ক্ষীণ আশা ছিল—রহমত ফিরে আসবে। দপ্ করে নিভে যাওয়া শিখার মতো সে আশা চির-তরে বিলীন হয়ে গেছে।

কলিমনের চোখের সুমুখে আঁধারের সমুদ্র নেমে এলো উত্তুঙ্গ চূড়া আঁধারের ঢেউ ভেঙ্গে আলোর তৃষ্ণায় দু'হাতে পথ খুঁজতে থাকে বেপথু কলিমন।

মতিজানের মেয়েরা

সেলিনা হোসেন

বিয়ে হলে নতুন সংসারে মেয়েদের একটা অবস্থা নির্ধারণ হয়, সে বাড়ির বউ হয়, বউ হওয়া মানে একটা নতুন জনম – সুখ-দুঃখ অনেক কিছু মিলিয়ে আপন ভুবন—সংসারের কর্তৃত্ব—এমন একটি ধারণা ছিলো মতিজানের। কিন্তু এই সংসারে ওর অবস্থানটা যে কোথায় তা ও বুঝতে পারে না। এই সংসারে ওর কী প্রয়োজন সেটাও জানে না। মাথার ওপর আছে শাশুড়ি, সংসার তার, সে সংসারে মতিজান বাড়তি মানুষ। এই বাড়তি মানুষ হওয়ার কষ্ট ওর বুক জুড়ে। শাশুড়ি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বুক পুড়িয়ে খাক করে দেয়। তখন মতিজানের হৃদয় থেকে সংসারের সাধ উবে যায়। ও বিধবা হতে চায়।

মতিজানের শাশুড়ি গুলনুর, তার ছেলে আবুল। ছেলের জন্মের দেড় বছরের মধ্যে বিধবা হয়েছিলো, এভাবে বাইশ বছর কেটেছে। স্বামীর ভিটে-জমি যা ছিলো বেশ শক্ত হাতে তার দেখাশোনা করে সংসারটা টিঁকিয়েছে, ছেলেকে বড়ো করেছে। না, শ্বশুরকূল—না বাপের কূল কারো কাছে কোন সাহায্যের জন্য গিয়ে দাঁড়ায় নি। গাঁয়ের লোকে বলে, বড়ো শক্ত ম্যায়ামানুষ গো। এই অহংকার আছে গুলনুরের মনে। শক্ত হওয়াটাকে ও গৌরব মনে করে এবং এই শক্ত হওয়ার ব্যাখ্যা ওর কাছে ব্যাপক। ফলে ও যা করে মনে করে সেটাই যথার্থ, এর বাইরে আর কিছু হতে পারে না। মতিজানের আশা ছিলো স্বামীর কাছে, কিন্তু দেখলো সে জায়গাও দখল করে রেখেছে শাশুড়ি। কখনো ওর মনে হয় মায়ের সংসারে আবুলও বাড়তি মানুষ। স্বামীকে নিয়ে সংসারের সাধ মিটলো না বলে ওর প্রবল অভিমান যখন তীব্র হয়, তখন আবুল সংসার থেকে পালিয়ে যায়। মতিজানকে পরিষ্কার বলে দেয়, হামক কিছু কব্যা না। হামি কিছু জ্যানি না। কিছু করব্যার প্যারমো না। মা-ই সব। মা হামার বুকের মধ্যি পা থুয়্যা চ্যাপা র‍্যাখছে। আবুল হাত নেড়ে, ঠোঁট উলটে

কথা বলে খিস্তি আওড়ায়। খিস্তি কাকে উদ্দেশ্য করে ওর কথায় তা বোঝা যায় না। মতিজান দুচোখ মেলে স্বামীকে দেখে। উদভ্রান্ত চেহারা, রক্তাভ চোখ, সংসার সম্পর্কে উদাসীন। সংসারের ধার ধারে না। ওর গাঁজার আড্ডা আছে, মাস্তানি আছে, পকেটে টাকা নিয়ে গঞ্জের রসুইয়ের ঘরে ঢুকে পড়ে অনায়াসে। ওর কাছে মা কিছু নয়, বউও কিছু নয। মতিজান এই সত্যটি বুঝে ফেলে ওর ভেতরে রেখে চাপে। ও শাশুড়ির মতো শক্ত হতে চায়। শাশুড়ির গঞ্জনা ওকে ভেতরে ভেতরে জেদি করে তোলে।

বিয়ের এই নয় মাসে ওর চোখ এখন একদম খোলা সেটা কোনোভাবেই বুঝতে পারে না। ডানে ফিরে না, বামে ফিরে না—নীচে তাকিয়ে না, উপরে তাকিয়ে না। চারদিক সাফ, কোথাও কুটোটি পড়েও ওর দৃষ্টি আড়াল করতে পারে না। এই সংসারের শুরুটাই কি খুব ভালো ছিলো? নতুন সংসারে কয় দিন তো ঠিকমতো কিছু বুঝে উঠতে পারে নি। এখন ভেবে দেখে বিয়ের সাতদিনও ওর ভাল কাটে নি। শাশুড়ি তার, ঠিকমতো কথা বলে না। মতিজান ভয়ে ভয়ে সে মুখের দিকে তাকায়। স্বামীকেও বুঝতে পারে না। সেও ভালো করে কথা বলে না। রাতদিন বিড়ি টানে, ধোঁয়ায় ঘর ধোঁয়াটে করে রাখে। জোর করে শ্বাস টেনে হাঁফ ছাড়ার উপায় নেই। মতিজান কিছু বলতে পারে না। এই গুমোট পরিবেশে ওর কেবলই ভয় করে। পা ফেলতে ভয়, হাঁচি দিতে ভয। ইলিশ মাছের কাঁটা বাছার সময়ে হাত থমকে যায়। ভাতের গ্রাস মুখে তোলার সময়ে আড়চোখে দেখতে পায় শাশুড়ি কাঁপানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মতিজানের বুকের ভেতর গুড়গুড় ধ্বনি গড়ায়, বর্ষায় মহানন্দার স্রোতের মতো, কান পাতলে ঢেউয়ের শব্দ শরীরেও এসে লাগতো। আটদিনের মাথায় শাশুড়ি কথাটা তুললে ও আতঙ্কে সিঁটিয়ে যায়। তখন কেবল খাওয়া শেষ হয়েছে এলুমিনিয়ামের থালাটায় ঝোলের একটা চিত্র আঁকা হয়ে আছে। গুলনুর ·চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, বিহার সুময় তুমহার বাপে কহাছিলো আমার আবুলকে ঘড়ি দিবে, সাইকেল দিবে। অক্যনও পাঠালে না ক্যানহে?

মতিজান চুপ করে থাকে। তর্জনী দিয়ে থালার বুকে আঁকিবুঁকি কাটে। বাপের অবস্থা ও জানে, যা আয় তার চেয়ে দ্বিগুণ ব্যয় সংসারে। কেমন করে ঘড়ি আর সাইকেল কিনবে? কোথা থেকে এতোকিছু জোগাড় হবে না জেনেই ওর বাবা এইসব দেয়ার কথা কবুল করেছিলো। এখন? গুলনুর ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কথা কহাচ্ছ না' যে?

মতিজান কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, হামি কিছু জ্যানি না।

গুলনুর চিৎকার করে ওঠে, জ্যানবে না ক্যানহে? জ্যানতি হবে। মতিজান থরথর করে কাঁপে। থালার ওপর আঙুল স্থির হয়ে যায়। ভাতগুলো যেন গলার কাছে এসে থমকে আছে, আর কিছু চেঁচামেচি হলে ওগুলো গলগলিয়ে বেরিয়ে আসবে।

আর ফ্যাচফ্যাচ কর‍্যা ল্যাগবেন্যা। যাও থালাবাসনগুল্যা মাজ্যা আনো।

কাজ পেয়ে বর্তে যায় মতিজান। পালিয়ে বাঁচার এ এক দারুণ পথ। ও বাসন কোসন, হাঁড়িকুড়ি নিয়ে ডোবার ধারে আসে। যখন ভরা দুপুর, খরখরে রোদ চারদিকে, মতিজান নির্নিমেষ রোদের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে ওপর ওপর কোথাও কিছু পুড়ছে না, দহন নেই জ্বালাও নেই। কেবল বাবার ওপর প্রবল অভিমানে ওর কান্না পায়। হাঁটুতে মুখ গুঁজে চাপা কান্নায় নিজেকে উজাড় করতে চায়। বাবা কেন মিথ্যে আশ্বাস দিলো? ওর বিয়ে না হলে কি ক্ষতি হতো? ও তো চেয়েছিলো গ্রামে সমবায়ের কর্মী রেলি বুয়ার সঙ্গে নকশি কাঁথার কাজ করতে। নিজের রোজগার নিজে করবে বলে ওর জেদ হয়েছিলো। বাদ সাধলো বাবা। মেয়ের বিয়ে না হলে তার মানসম্মান থাকবে না। যে কোনো উপায়ে বিয়ে দিতে হবে। কেন? কেন? মতিজান লাথি দিয়ে বাসন-কোসন ডোবার জলে ফেলে দিতে চায়। হায় বিয়ে, কোথায় সংসার, কোথায় স্বামী? এইকি বাবার মানসম্মান? গরিবের মান-সম্মান তো ভাত-কাপড়। খর দুপুরের রোদের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে মতিজান—বিড়ির ধোঁয়ায় ধোঁয়াটে হয়ে থাকা ঘরটা একটা রঙিন ফানুস হয়ে যায়—ক্রমাগত উড়ছে, উড়ছে। ছোঁযার সাধ্য ওর নেই। তখন দুপুরটা ওর ভেতরে শক্ত হয়ে জমতে থাকে। ও ভাবে, আমিও একটা শক্ত মে মানুষ হবো।

দিনতো গড়াবেই, দিনের নিয়ম। মতিজানেরও দিন গড়ায়। ও বুঝে গেছে আবুল ওর জীবনে থেকেও নেই। মাসের অর্ধেক দিন রসুইয়ের ঘরে কাটায়। প্রথম প্রথম মতিজান এ নিয়ে কথা বলে মার খেয়েছে। এখন এ প্রসঙ্গটি আর তোলে না, ছেলের ঘরে ফেরা নিয়ে গুলনুর মাথা ঘামায় না। ছেলে যা করে তাতেই তার সায় আছে। বরং ছেলে ঘরে না ফিরলে সে বেশ স্বস্তিতেই থাকে। মতিজানকে বেশ নিংড়ানো যায়, আবুল সামনে থাকলে কখনো সেটা হয়ে ওঠে না। নেহাতই চক্ষুলজ্জার খাতিরে ছেলেকে মানতে হয়। তা ছাড়া যৌতুকের ব্যাপারটি নিয়ে গুলনুর এখন সরাসরি ক্রোধ প্রকাশ করে। চেঁচিয়ে বলে, তুমহার বাপ একটা মিথ্যুক, প্রতারক। সাইকেল, ঘড়ি

'দিতে না পারবে তো কহে ক্যানহে ?

গুলনুর উত্তেজনায় গালাগালি, চেঁচামেচি করে। আবুলও মায়ের সঙ্গে যোগ দেয়। সেদিন মতিজানের কণ্ঠ ধরে আসে, চুপ থাকতে পারে না। কাঁপা গলায় বলে, বাপজান ঠগ লয়, গরিব। বাপজান মিথ্যুকে লয়। পয়সা হ্যাই বুল্যা ঘড়ি, সাইকেল দিনব্যার সময় লাগিচ্ছে।

চোপ হারামজাদি। আবার বড়ো কথা।

গুলনুর ওর চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। গলায় দড়ি দিয়ে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। সারাদিন খেতে দেয় নি। মতিজান অনুভূতিশূন্য হয়ে যায়। চোখে জল নেই, বুক জ্বালাও নেই। বোধহীনতা ওর শক্ত হয়ে জমতে থাকে। ও শক্ত মেয়েমানুষ হতে চায়। সন্ধ্যায় গুলনুর দড়ি ধরে টেনে ডোবার ধারে নিয়ে গিয়ে বলে, হামি আর তুমহাক ভাত খ্যাওযাবার প্যারমো না। খ্যা, খ্যা, ঘাস খ্যা।

প্রচণ্ড কৌতুকে মায়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে আবুল গঞ্জে রসুইয়ের কাছে চলে যায়। মতিজানকে বারান্দায় এনে এক থালা ভাত দেয় গুলনুর। ও শান্ত, সুবোধ হয়ে নিঃশব্দে ভাতগুলো খায়। তারপর ঘরের দরজা লাগিয়ে দেবার সঙ্গে অন্ধকার নামে দু'চোখের সামনে। সারারাত ও একফোঁটা ঘুমুতে পারে না। ও বিছানায় ছটফট করে, মেঝেতে গড়িয়ে নেয়। শান্ত থাকার চেষ্টা করেও পারে না। অন্ধকারের সঙ্গে কথা বলে, অন্ধকার তুই বলে দে কেমন করে প্রতিশোধ নিতে হয ? কেমন করে ? নিঃশব্দতার এই চরম মুহূর্তে ওর মনে হয় ওর একজন সঙ্গী দরকার, খুব কাছের কেউ, যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারবে। এখন ওর আনন্দ চাই। এভাবে মার-খাওয়া জীবন আর নয। মাতাল, জুয়াড়ি, পরনারী-আসক্ত স্বামীর জন্য ও কোনো দয়া অনুভব করে না। একজন প্রতিপক্ষই ও সামনে দেখে, যে শক্ত ম্যায়ামানুষ বলে এই গ্রামে খ্যাত। তার সঙ্গেই মতিজানের যুদ্ধ।

দিনতো গড়াবেই, দিনের নিযম। মতিজানেরও দিন গডায। আবুল বাড়ি আসে, কখনো আসে না। শাশুড়ি যৌতুক নিয়ে গালাগালি করলে মতিজান চুপচাপ শোনে। ও কতদিন বাবার বাড়ি যায় না। বাবার বাড়ি থেকেও কেউ আসতে পারে না। ওর বড়ো ভাই দুবার এসেছিল। গুলনুর খারাপ ব্যবহার করেছে। সাইকেল, ঘড়ি নিয়ে আসতে নিষেধ করেছে। মাস ছয়েক হয়ে গেলো কেউ আর আসেনি। গতবার বড় ভাই যাবার সময়ে

চুপিচুপি বলেছে, তুই একলাও মন খারাপ করব্যা না কথ্যা দেল্যাম। হামি আর বাপজান ঘড়ি আর সাইকেল জোগাড় করবার চেষ্টা করিচ্ছি।

বড় ভাইকে তীব্র চোখে শাসিয়েছে মতিজান, না, আপনেরা কষ্ট করবার পারবেন না। বাবা তো মিথ্যুক আর ঠগ হয়্যা গেছে। কিসের আবার ঘড়ি সাইকেল? আর হামি? হামিতো গরু হয়্যা গেন্নু। ওরা হামাক ঘাস খ্যাবার কহে। খি-খি হাসিতে মতিজান বাড়ি মাতিয়ে তোলে। এ বাড়িতে আসার পর এই প্রথম ওর বাঁধ-ভাঙা হাসি। ওর ভাই বোকার মতো তাকিয়ে থাকে.। বারান্দা থেকে গুলনুর এমন বেয়াদবি হাসির জন্য তীব্র কণ্ঠে বকাবকি করে। মতিজান এই প্রথম শাশুড়িকে উপেক্ষা করে। উপেক্ষা করে হাসতেই থাকে। ওর ভাই মতিজানের অস্বাভাবিক চেহারা এবং হাসির শব্দে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। এই পলায়নে ওর মনে খুব দুঃখ হয়, কষ্ট ওর বুক ছিঁড়েখুঁড়ে নেয়। ও চুপচাপ গোয়ালে আসে। গোয়াল পরিষ্কার করে ঘুঁটে বানাতে বসলে ওর দুপুর গড়িয়ে যায়। খর রোদ পড়ে আসে। সেই থেকে মতিজানের বুকের ভেতর উপেক্ষা করার শক্তি শক্ত হয়ে যায়।

সেদিন অনেক বেলায় প্রচণ্ড খিদে নিয়ে ভাত খেতে গেলে গুলনুর রান্নাঘরের দরজায় ওকে বাধা দেয়। মতিজান বুঝতে পারে গুলনুর আজ দুপুরে না ঘুমিয়ে ভাত পাহারা দিচ্ছে। ওকে আজ বেয়াদবি হাসির শাস্তি দেবে। বাধা পেয়ে মতিজান ঠাণ্ডা গলায় বলে, হামি ভাত খ্যামো'। হামার ভুখ ল্যাগছে।

গুলনুর বলে, ভাত ন্যাই।

মতিজান চেঁচিয়ে ওঠে, ক্যানহে?

গুলনুর দাঁতমুখ খিচিয়ে হাত উলটে বলে, ভাত খ্যামো না। ঘাস খ্যামো। —হাম্‌তো এই বাড়ির কামের মানুষ। কাম কর্যা ভাত খ্যাই। বস্যা ভাত খ্যাই না। হামাক ভাত দেয়্যা ল্যাগবি।' মানুষে কামের মানুষকে ভাত খ্যায় না?

মতিজান শাশুড়ির পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। হাঁড়িকুড়ি উলটে ভাত পায় না। শিকার ওপর এক শানকি ভাত ঢাকা ছিল। ওটায় হাত দিতেই শাশুড়ি ছুটে আসে, হাত খ্যাবা না কয়্যা দেল্যাম। ইগুলান আবুলের ভাত।

সেই খি-খি হাসি হেসে ওঠে মতিজান। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, তার লিগা রসুই ভাত রান্ধ্যা থুছে। আপনার ভাবনা কি?

—কি ক্যালা? তুমহার এতো বড়ো সাহস?

মতিজান কোনো জবাব দেয় না। শানকিতে রাখা ভাত-তরকারি বুকের কাছে জাপটে ধরে খেতে থাকে। বুঝতে পারে শানকি হাতছাড়া করে খাওয়া যাবে না। বসে খেতে গেলেও শাশুড়ি আক্রমণের সুযোগ পাবে। সুতরাং ও এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে খায় যে গুলনুর এগিযে আশার আগেই ও শানকিটা ছুঁড়ে মারতে পারবে। ঠিক বরাবর। আবুলের জন্য মাছের বড়ো টুকরো রাখা হয়েছিল, আজ তা ওর কপালে, কী ভাগ্য! নাকি অধিকার? বেলি আপাতো এভাবেই বলতো নিজের অধিকার বুঝে নেওয়া, ভাবতেই মতিজানের ঠোঁটে চিকন হাসি মেলে যায়। প্রচণ্ড খিদে নিয়ে ও গপগপিয়ে ভাত খেতে যাবে। শাশুড়ির দিকে তাকায় না। আড়চোখে দেখে নেয় তার অবস্থানটা, না সে একপাও সামনে এগুচ্ছে না। ও বুঝতে পারে গুলনুর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শক্ত মেয়েমানুষের এ পরাজয় বড়ো বেশি অভাবনীয়। ওর বুকের ভেতরে জয়ের মহানন্দা, ঘন কুয়াশার আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে।

বিকেলে ও ডোবার ধারের বাঁশবাগানে আসে। জায়গাটা নিরিবিলি ছায়াচ্ছন্ন। গাছের মাথায় জমাট আঁঠা যেন রোদ আটকে ধরে, সে রোদ নিচে পৌঁছয় না। স্যাঁতসেতে ভেজা মাটি নরম স্নিগ্ধ। মতিজানের কাছে পরাজিত শাশুড়ি ঘরে হয়তো ঘুমিয়েছে, সাড়াশব্দ নেই। দুপুরের ঘুম না ঘুমুলে তার স্বস্তি নেই, এ এক প্রিয় অভ্যেস। বাঁশঝাড়ের নিচে বসে মতিজান গুনগুনিয়ে গান গায়। বিয়ের পর এই প্রথম ওর খুব ভালো লাগছে। ডোবার ওপাশে বাছুর দুটো বাঁধা, গাই দুটো চরাতে নিয়ে গেছে বুধে—ভারী ছটফটে ছেলে। একদণ্ড বসতে পারে না। মাঝে মাঝেই মতিজানকে বলবে, একটা গপ্প কহান না ক্যানহে ভাবী।

কিসের গপ্প? বাজার।

ও মাথা নাড়ে। মতিজান ওকে রাজার গপ্প বলে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর কথা বলে। শুনতে শুনতে বারো বছরের বুধের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে বাড়িতে বুধে নেই। মতিজানের মনে হয় আজ ওর বুকভরা রাজার গপ্প—ও নিজেই সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বুধেকে ওর এই কথা জানানোর খুব ইচ্ছে হয়।

বাঁশঝাড় পেরিয়ে বাড়ির সদর আসতেই ও লোকমানের মুখোমুখি হয়। লোকমান ওকে দেখে হাসে। লম্বা, পাতলা শরীর, চোখে চোখ পড়লে শরীর কেঁপে যায়। অনেকবার এ বাড়িতে এসেছে। আবুলের বন্ধু। আবুল বেশ

কয়েকদিন বাড়ি না ফিরলে লোকমানের হাতে সদাইপাতি পাঠায়। লোকমান এই পথে প্রতিদিন গঞ্জেও যাতায়াত করে। লোকমানের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ছিলো না, সাহসও ছিলো না। আজ লোকমান ওকে সদরে দেখে অবাক হয়।

ভাবী ক্যাংকা আছেন?

ভালো।

মতিজান সহজ হাসে। হাসিতে মুক্তো ঝরে। লোকমান চমকিত হয়।

ন্যান। আপন্যাকেরো সদাই।

মতিজান হাত বাড়িয়ে সদাই নেয়। সহজভাবে বলে, চলেন ছ্যাওয়ায় বসবেন খানে। পান খ্যাবেন?

কথায় সুর ঝরে। লোকমান চমকিত হয়। ইচ্ছে হয় দুদণ্ড বসে যেতে। তবু দ্বিধা নিয়ে বলে, আজ য্যাই।

আবার অ্যাসবেন। অ্যাসবেন তো?

অ্যাসবো, আবার অ্যাসবো।

লোকমান দুচোখ উজ্জ্বল করে বলে। মতিজান ঘাড় ঝাঁকিয়ে সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে বাড়িতে ঢোকে। চলায় ছন্দ উথলে ওঠে। লোকমান চমকিত হয়। এতোদিনের দেখা মানুষটা কি এইরকম ছিলো? ওর দ্বিধা কাটতে সময় লাগে।

সদাই বারান্দায় রেখে উদাস হয়ে বসে থাকে মতিজান। গুলনুর এখনো ঘুমুচ্ছে। উঠেই সদাই খুলে বসবে। সদাই ও খুলতে পারে না। খোলার কোনো ইচ্ছাও ওর হয় না। আজ আরো অবহেলায় ফেলে রেখেই ওর স্বস্তি। পারলে ঐ পোটলাটা ও ডোবায় ফেলে দিতো কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে অকারণ ঝগড়া ও বাধাতে চায় না। ওর বিষণ্নতা ওর চারপাশে তুমুল বৃষ্টির মতো প্রবল হয়ে ওঠে। বছর গড়িয়ে গেলো তবু মা হতে পারলো না। ওর শরীর মোড়ায়। হাড়গোড় থেকে কষ্টের কড়কড় শব্দ উঠছে। রসুইয়ের ঘরে আবুল সব লুটছে। ওর চারদিকে ব্যাপক শূন্যতা। মতিজানের উদাসীনতা কাটে না।

সেই পরাজয়ের পর গুলনুরের কণ্ঠে এখন ভিন্ন সুর। যখন তখন খোঁচা দেয়। বাঁকা কথায় খলবলিয়ে ওঠে কণ্ঠ। সরাসরি জিজ্ঞেস করে, তুমহার ছাওয়াল হয় না ক্যানহে?

মতিজান হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ প্রশ্নের কী জবাব হয়। একবার বলতে চায়, আপনার ছাওয়ালেরে পুছ করেন না ক্যানহে? কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নেয়। কথার কোনো জবাব না দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে কাজে চলে যায়। পেছন থেকে শুনতে পায় শাশুড়ি কণ্ঠ চড়িয়ে বলছে, হামার বংশের বাত্তি কুণ্ঠে পামু গো? ও আল্লাহরে।

সেই স্বর শুনে মতিজানের শরীর চিড়বিড় করে। ধম করে পা ফেলে ঘুরে দাঁড়ায়। দেখে শাশুড়ি পেছন দরজা দিয়ে পাশের বাসায় যাচ্ছে। ও ফিরে এসে বারান্দায় বসে, মাথা ঝিমঝিম করছে। বুঝতে পারে শাশুড়ি এখন ওর বিরুদ্ধে বাঁজা মেয়েমানুষের অভিযোগ ওঠাবে। শরীর অসাড় লাগে মতিজানের। তাইতো, কেন ওর সন্তান হচ্ছে না? দুঃখে কষ্টে মতিজানের চোখ ছলছল করে।

বুধে এসে ওর সামনে দাঁড়ায়। কোঁচড় ভর্তি জাম নিয়ে এসেছে।

ভাবী খ্যান। দ্যাখেন কত্ত জাম।

মতিজান দুচোখ মেলে বুধের দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বলে না। অন্য দিন হলে ও চেঁচামেচি করতো। বলে বুধে একটা সোনার ছেলে। আজ এই প্রশংসাটুকু না পেয়ে বুধে মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আম্মা খারাপ কথা কহাছে না?

মতিজান জবাব দেয় না। বুধেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে ইচ্ছে করে। বুধেকে তো বলা যায় না যে শাশুড়ির খারাপ ব্যবহারে আজ ওর দুঃখ নয়, দুঃখ মা না হতে পারার যন্ত্রণায়।

বুধে ফিসফিসিয়ে বলে, ক্যান্দবে না ভাবী। আম্মা খুব খারাপ গো।

জামগুলো বারান্দায় ফেলে রেখে বুধে দৌড়ে চলে যায়। তখন গুলনুর পাশের বাড়ির নুরের মাকে বলে, বুবু হামার বৌটা বানজা গো। নইলে ছাওয়াল হয় না ক্যানহে?

নুরের মা খি খি করে হাসে, বান্‌জাতো কী হয়েছে? ছাওয়ালকো আবার বিয়া দাও। এইবার মেলা টেকা নিয়া দিও।

গুলনুর খুশি হয়ে হাসে, মতিজানকে একথা শুনিয়ে দেয়। বংশের বাতি না হলে তার জীবন যে বৃথা হয়ে যাবে একথাও ঘোষণা করে। মতিজান সাড়াশব্দ করে না। মাথার মধ্যে প্রবল ঘূর্ণির মতো বিয়ে শব্দ ঘুরপাক খায়। দু'দিন পর আবুল বাড়ি ফিরলে রাতে বংশ রক্ষার কথা ওঠায় মতিজান, শুনে খেঁকিয়ে ওঠে আবুল। বলে, বংশের পোঁদে লাথ্‌থি।

তুমহার মা যে চ্যাহে?

মাকে কহাস –

বলেই থেমে যায়। অস্ফুট শব্দে খিস্তি করে। সে খিস্তি শুনে মতিজান বেকুব বনে যায়। মনে হয় পেটের ভেতরে কোনোকিছু নড়েচড়ে উঠে নাড়িভুঁড়ি খামচে ধরে। অসুস্থ লাগে -ওর। তবু আবুলের মুখভরা গাঁজার গন্ধে শ্বাস নিয়ে মতিজান নিজের জীবনের ওপর রেগে উঠতে চায়। লাথি দিয়ে ফেলে দিতে চায় চেপে থাকা আবুলকে। কেবলই মনে হয়, সময়ের অপেক্ষা, শুনতে পায় বুধের ডাক। গাঁজার গন্ধ বুকের ভেতর শক্ত হয়ে উঠলে লোকমানের দীর্ঘ, ছিপছিপে শরীরটা ওর হাতের কাছে চলে আসে। ও ছুঁয়ে দেখার জন্যে হাত বাড়ায়। এবং সেই শরীরটা ওর মুঠোর মধ্যে পুটুলি পাকিয়ে ঢুকে যায়।

একদিন দুপুরবেলা মেঘ করে বাতাস ওঠে, আকস্মিক ঝোড়ো বাতাস, বুধে মাঠ থেকে ফেরে নি। কাছাকাছি কোথাও থেকে গরুর হাম্বা শোনা যায় না। গুলনুর সকালে কানসাট গেছে, ভাসুরের বাড়ি বেড়াতে। বলেছিলো, বিকেল নাগাদ ফিরবে। দুদিন ধরে আবুল বাড়ি নেই। মতিজান বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে রুমালে ফুল তোলে। শাশুড়িকে লুকিয়ে ও কাজটি করতে হচ্ছে ওর। রুমালটা লোকমানকে দেবে। লোকমানের সঙ্গে ওর একটা সহজ সম্পর্ক হয়ে গেছে। লোকমান জানে কখন গুলনুর ঘুমোয়, কখন বুধে থাকে না, কখন বাঁশঝাড়ের রোদ ছায়ার মতো বিছিয়ে থাকে। তখন মতিজানের হাতে অঢেল সময়, সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরুতে থাকে।

ঝোড়ো বাতাসে উঠোনের ধুলো উড়ে এসে মতিজানের চোখ-মুখ ধাঁধিয়ে দেয়, চুল এলোমেলো হয়ে যায়। ও নিজেকে সামলাতে না সামলাতে দেখতে

পায় দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে লোকমান বারান্দায় এসে ওঠে। হাতে একগাদা সদাই। তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে, কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা মুষলধারায় পড়তে থাকে। বাজ পড়ে বিদ্যুৎ চমকায়। ঘরের ভিতর লোকমান দুই হাতে মতিজানকে বুকের ভেতর চেপে ধরে। এই প্রথম, এই প্রথম মতিজান একজন পুরুষের স্পর্শ প্রবল আবেগে অনুভব করে। বুঝতে পারে আবুলের সঙ্গে লোকমানের অনেক ব্যবধান।

দিন গড়ায়, দিন তো গড়াবেই, দিনের নিয়ম। মতিজানের দিনগুলো এখন অন্যরকম গড়ায়। ও মা হবে। সেদিনের ঘটনার পর প্রথম ঋতু বন্ধ হয়ে গেলে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলো মতিজান, একলা ঘরে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া—একলা ঘরে নিজের সঙ্গে উথাল-পাতাল। মতিজানের সামনে সব বন্ধ দরজা খুলে যায়। খবরটা শোনার পর বাঁকা চোখে তাকায় আবুল, ত্যালে বংশরক্ষা হলো।

শাশুড়ি শুনে প্রথমে খুশি হতে পারে না, থম ধরে থাকে। এ তার দ্বিতীয় পরাজয়। এতো দ্রুত পরাজিত হবে ভাবতেই পারে না। তারপর বাঁকা চোখে তাকিয়ে রূঢ় কণ্ঠে বলে, মাইয়া ছাওয়াল বিয়াবার পারব্যা না।

মতিজান বলে, আপনার আবার পুরুষ ছাওয়ালের শখ ক্যানহে? আপনার ছেলে তো আপনাকে পুছে না।

—না পুছলে তোর কি রে হারামজাদি। তুই ছেলে বিয়োবি, না বিয়ালে ভাল হবে না কহ্যা দিলাম।

শাশুড়ির নিঃশ্বাসে গরম হলকা, তা মতিজানের মুখে এসে লাগে। ও জানে এ বছর দারুণ খরা—ফসল পুড়ছে, মাটি ফাটছে! মতিজানের শরীর জুড়ে ক্লান্তি। ক্লান্ত শরীর ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে চায়। ও শারীরিক দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে মানসিক শক্তি দিয়ে।

যথাসময়ে একটি মেয়ের জন্ম দেয় মতিজান। আবুল হো হো করে হেসে বলে, বংশরক্ষা তো হলো না।

গুলনুর গম্ভীর। মাতনির মুখও দেখেনি। শুধু বুকের ভেতর মেয়েকে আঁকড়ে ধরে মতিজান, আবেগে সোহাগে নিজেকে উজাড় করে ফেলে। মেয়ের জন্মের কারণে চারদিকের এতো কিছু উপেক্ষার মধ্যেও এক অন্তহীন আনন্দের মহানন্দা

ওর চারপাশে থই থই করে। শাশুড়ির মুখের সামনে মতিজান মেয়েকে নাচায়, দোলায় এবং গান গেযে ঘুম পাডায়। মতিজানের এই আনন্দ সহ্য হয না গুলনুরের। সে মারমুখী হিংস্র হয়ে ওঠে। মতিজান ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে বলে আমি পারলে শত মেয়ের জন্ম দিতাম। এখন ও আর চুপ করে থাকে না। তারস্বরে কথার জবাব দেয ঝগড়া করে। গুলনুর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইদানীং আবুল ঘরে একরকম ফিরেই না। মতিজান শুনেছে রসুইকে ছেড়ে দিযে ও আর একজনের সঙ্গে জুটেছে। ওর এখন ব্যস্ত সময কাটে। মতিজানের জেদ হয়।

বছর ঘুরতে আবার লোকমান, এবারও একটি মেযের জন্ম দেয় মতিজান। গুলনুর সাত দিন চুপচাপ থাকে। তারপর ঘোষণা দেয়, যে বউ কেবল কন্যা সন্তানের জন্ম দেয তাকে সে সংসারে রাখবে না। ছেলে বাড়ি এলে এই বউকে তালাক দিয়ে বাপের বাডি পাঠিয়ে দেবে।

মতিজান চুপচাপ শাশুডির এই ঘোষণা শোনে। ওর এখন বেশি কিছু ভাবার সময় নেই। বাচ্চাদের নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত সময় কাটে। তার ওপর সংসারের প্রতিটি কাজও করতে হয়। ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে আসে।

মাসখানেক পরে পরে আবুল ফিরে এলে গুলনুর তার ঘোষণার কথা সরবে ছেলেকে বলে। গাঁজার ঘোরে ছিলো আবুল। মার কথা শুনে চমকে ওঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকিযে থাকে, তারপর বাডি থেকে বেরিয়ে চলে যায। গুলনুর চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে, অক্যুনই অক্যুনই হারামজাদিরে বাডি থিকা ব্যার করম।

আশেপাশের বাড়ির লোকজন এসে ওঠোনে ভিড় করে। মতিজান দু'-মেয়েকে দু'হাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ভিডের সামনে এসে দাডায়। গুলনুর এখনো সমানে চেচিয়ে যাচ্ছে, গালিগালাজের তুবড়ি ছুটছে। মতিজান রুখে দাঁডায়, মুখ খ্যারাপ করব্যান না, কাগ্যা দিল্যাম।

গুলনুর চেঁচিয়ে বলে, আজ থিকা হামার সংসারে তুমহার ভাত ন্যাই। হামি আমার ছাওয়ালোক আবার বিয়া করামো। হামার বংশের বাত্তি লাগবে।

সবাইবে সচকিত করে দিয়ে খি খি করে হেসে ওঠে মতিজান। বলে,

বংশের বাত্তি? থুঃ আপনেব ছাওযালেব আশায থ্যাকলে হামি এই মাইযা দুইডাও পেত্যাম না।

কি কহালা?

গ্রামেব শক্ত মেযেমানুষ গুলনুর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মতিজানের দিকে তাকিযে থাকে। ভিড়েব মধ্যে গুঞ্জন।

দু'হাতে দু'মেযেকে বুকেব সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রেখেছে মতিজান। মাযেব বুকেব ভেতব থেকে জ্বলজ্বল চোখে সবাব দিকে তাকায মতিজানেব মেযেরা।

আত্মাশক্তি

মকবুলা মঞ্জুর

পাছ বাড়ির ঢাল বেয়ে নামতে নামতে সবুরনের চোখে পড়ল সেই বেজিটা হালটের উত্তরদিকের বেতন থেকে বেরিয়ে ছুটে ঢুকে গেলো দক্ষিণের মটকিলা ঝোপের ভেতর। ঐ বেজিটা ক'দিন থেকে বড়ই জ্বালাচ্ছে সবুরনকে। ডিমফোটা নতুন মুরগির ছানাগুলোব দু'টো ওরে পেটে গিয়েছে। এখন অন্য দশটার দিকে ওর জুলজুলে চোখ আর তিরতিরে জিভের লোভ। এই জঙ্গুলে বাড়ির ভেতরে থেকে কতো কষ্টে যে হাঁস-মুরগি পালাতে হয় তা সবুরনই জানে। তার ওপর আছে একটা শয়তান খাটাশের উৎপাত।

গরিব বাপের ঘরে উদয়াস্ত খেটেও পেটের ভাতের জোগাড করতে পারে না সবুরন। নিজের পেট নিয়ে তার ধান্দা নেই। চিন্তা শুধু ঐ পেটের শত্রু ছুটোর জন্য। ছেলেটা এই চার বছর বয়সে দু'বেলা ভাতের জন্য কাঁদে—ভাতই বুঝি ওর একমাত্র চাওয়া। সাজু আদর চায় না, আহ্লাদ ওর অচেনা। ও চায় পেট ভরে খেতে। ওর ঐ খাই খাই স্বভাবের জন্য নামই হয়ে গেলে 'পেইটক্যা'। পাড়া-পড়শি তো বটেই—সবুরনের বাপ-মা পর্যন্ত ছেলেটাকে 'পেইটক্যা' বলে ডাকে। এই ডাক কি সবুরন নিজে কখনও ডাকে না? ডাকে—যখন ওর মেজাজ খারাপ থাকে—যখন নিজের ভাগের ভাতটুকুও ছেলেকে ধরে দিয়েও পেট ভরাতে পারে না তখন। কিন্তু ঐ নাম ওর বড় অপছন্দ। ওতো জানে সাজু তার চার বছর বয়সের বেশির ভাগ দিনই পেট ভরে খেতে পায়নি। সবুরন ওদের দুই ভাই-বোনকে পেট ভরে খাওয়াবার জন্য দিন-রাত খেটে-খেটে হাড় কালি করছে, তবু না পারে ওদের পেট ভরাতে—না পারে বাপ-মায়ের মন ভরাতে। বাপ করমালি তো সরাসরিই বলে যে সবুরনের শুয়ারের পাল সে টানতে পারবে না। আর মা বলে যে, সবুরনের নাকি মায়ের জন্য কোনো দরদ নেই—দরদ শুধু ঐ হারামীর জম্মাদের জন্য। কিন্তু সবুরন বোঝে না ওদের

জন্মাবার জন্য সে কতোটুকু দায়ী। বাপ করমালি আমডাঙ্গার সুরুজ মিয়ার সাথে সবুরনের বিয়ে দিয়েছিল চার হাজার টাকা নগদ আর একটা ট্রানজিস্টার রেডিও যৌতুক দেবার কড়ারে। ছয় বছর আগে। সবুরনের শরীরে তখন সতেরো বছরের যৌবন। পাড়ার লোকে করমালিকে মেয়ের বিয়ের কথা শুধায়, জোয়ান ছোঁড়ারা রাতে চালে ঢিল ফেলে, ঘাটের পথে সবুরনকে কুপ্রস্তাব দেয়। সবুরনের মা বারমেসে রোগী। ঘরে-বাইরে যত কাজ সব সবুরনেরই ঘাড়ে। ছোটবোন সখিনার একটাই কাজ—তা হচ্ছে পাড়া বেড়ানো। তাকে কেউ আহ্লাদ দেয় না তবু সে যেন সব সময় আহ্লাদে গলেই আছে। নিজেকে নিয়ে কেন যে সখিনা এতো কম বয়সেই আত্মহারা হয়ে উঠলো সবুরন তা বোঝে না। সখিনার শরীরের বড় যত্ন। তেরো বছরের মেয়ে সখিনা রান্নার ডাল থেকে একমুঠ মসুর ডাল সরায় ভিজিয়ে বেটে মাখবে বলে। মাখবে বলে সে বন-জঙ্গল থেকে কাঁচা হলুদ খুঁজে আনে সখিনা সবুরনকে আবার মুখ বেঁকিয়ে শোনায—মরার গুষ্টির জইন্যে খাইটা তো হাত-পাও খসখসা করলি বুবু, তোর বিয়া হইব কেবা কইর‍্যা ?

তবু পাত্র জুটল। খসখসে হাত-পা আর তেলের অভাবে জট পাকানো চুল সত্ত্বেও সবুরনের সাথে আমডাঙ্গার সৌখিন যুবক সুরুজ মিয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে হয়ে গেল। সবুরন জানলো না যে, তার বাপ কোন শর্তে তার বিয়ে ঠিক করেছে।

সেদিন দুপুরে চাচাতো ভাইয়ের বউ বুলিভাবী আর ময়না বু আচ্ছা করে হলুদ মাখালো সবুরনকে। বুলি ভাবী কোত্থেকে যেন খানিকটা দুধের সর জুটিয়ে এনেছে। হলুদের সাথে সর মিশিয়ে ঘষে ঘষে মাখাল একঘণ্টা ধরে। তারপর আরও কয়েকজন মিলে ওলে গোসল করাল। নতুন একখানা কাপড় পরালো গোসল শেষে। নতুম পাটি জোটেনি। পুরানো মাদুরখানার ওপর বসে সবার অলক্ষে নিজের হাত দু'খানা দেখতে দেখতে সবুরনের মনে হয়েছিলো কি সুন্দর হলদে আভা লেগেছে তার শরীরে—তার খসখসে হাত দু'খানা বুঝি এখন সখিনার হাতের মতোই মোলায়েম হয়ে গেছে। ওর খেটে খেটে ভোঁতা হয়ে যাওয়া মনটাতে বুঝি রঙের ঘোর লাগতে শুরু করেছিল। সুরুজ মিয়াদের আনা নাইলনের লাল ছাপা শাড়ি আর নকল সোনার গহনায় সেজে অপেক্ষা করছিল সবুরন এই বুঝি তার এজিন নিতে আসছে লোকজন। কিন্তু তার বদলে এলো গোলমালের শব্দ। সুরুজ মিয়ার বাপ

বেঁকে বসেছে। সবুরনের বাপ যৌতুকের টাকা জোগাড় করতে পারেনি। মাত্র পাঁচশ টাকা কোনোমতে জোগাড় করে তাই জোড় হাতে এগিয়ে দিয়ে সুরুজের বাপকে বলেছে—এহন এই পাঁচশ ট্যাহা ল্যান বিযাই সাব, বাকি ট্যাহা জোগাড় কইরবার পারি নাই। পরে দিমু।

সুরুজ মিযা ট্যারা চোখে হবু শ্বশুরকে দেখতে দেখতে বলেছিল, আর টেনজিস্টার? সেইডাও কি ফাঁকির তালে ফালাইবেন।

করমালি মুখ নিচু করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখেনি।

শেষ পর্যন্ত এই নান্দিনা আর আলমডাঙ্গা দুই গ্রামের মুরুব্বিদের মধ্যস্থতায় সুরুজ বিয়ে করতে রাজি হল। তবে শর্ত এই যে, ছয মাসের মধ্যে করমালি জামাইকে সাড়ে তিন হাজার টাকা আর টানজিস্টার রেডিও সেট দিতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় তার মেযের ঠাঁই হবে না শ্বশুরঘরে।

সবুরনের যৌবনপুষ্ট শরীরটাকে নিয়ে সুরুজ যতো মাতামাতিই করুক ভালোবাসার ছিটে-ফোঁটাও ছিল না তার আচরণে। বউযের রং মযলা, হাত-পা গোবদা, গাড়িটানা বলদের মতো চোখের চাউনি—এইসব মন্তব্য করেও সুরুজের সাধ মেটে না। উঠতে বসতে 'ফকিরের বেটি' 'বাটপাড়ের বেটি' ছাড়া সম্বোধন করে না বউকে। তবু ওরই মধ্যে ছযমাস পার হযে গেল। সবুরনের বাপ জামাইযের একটা টাকাও শোধ দিতে পারেনি বটে কিন্তু সবুরনের পেটে সন্তান এসে গেছে বিয়ের মাসেই।

ছয মাস হযে গেছে, এখন আর দেরি করতে রাজি নয সুরুজ। সে সবুরনকে নিযে নান্দিনা চলে এল। করমালি যেন জামাই নয, আজরাইলকে দেখল চোখের সামনে। সবুরনের মা ভেতরে ভেতরে ভযে সিটিযে গেলেও মুখে জামাইকে আদর-আপ্যাযনের ত্রুটি রাখল না। বহু যত্নে পালা হলদে মোরগটা জবাই করে জামাইযের জন্য রান্নার ব্যবস্থা করতে বলল সবুরনকে। ঐ মোরগটাকে সবুরন চেনে। ওর যখন বিযে হয তখন ওটা ছিলো ছোট্ট একটা ছানা। এখন সোনা রং পালক আর লাল টকটকে ঝুঁটি নিযে কেমন তাগড়া হযে উঠেছে। হাটে নিযে বেচলে নির্ঘাৎ ওটার দাম হবে পঞ্চাশ টাকা। সেই টাকা পেলে এ বাড়ির লোকেরা দু'দিন চাল-ডাল কিনে পেটভরে খেতে পারত। কিন্তু এখন পাওনাদার জামাইযের জন্য ওটার গলায ছুরি পড়বে।

সবুরনের মা চিরকালের রোগা-ভোগা মানুষ। বিযের আগে সবুরনই তার

সংসার সামলেছে। ছয়মাস পরে বাপের বাড়ি এসে সবুরনকেই আবার চুলো আগলে বসতে হলো। ওর মা একবার সখিনাকে ডেকে বলেছিল, 'অ-লো সখিনা, মোরগডা তুই কুউট্যা-বাইছা দে, তর বুবুর শরীল ভালো না, একলা আর কতো কইরব।'

সখিনা মায়ের কথার উত্তরে বোনকে হেসে হেসে শুনিয়ে দিল—বুবু লো, তর ভাতার আইছে, তু-ই-ই তরিবৎ কইরা রান্দাবাড়ি কর—আমার ঠ্যাহা পড়ে নাই।

তবে দেখা গেলো দুলাভাইকে আপ্যায়ন করার ঠেকা সখিনার কিছুটা আছে বই কি। আস্ত পানে কাঁচা গুয়া দিয়ে জোড়া খিলি বানিয়ে নিয়ে সে গিয়ে বসেছে সুরুজ মিয়ার গা ঘেঁষে। পান চিবোতে চিবোতে সৌখিন পুরুষ সুরুজ মিয়াও বেমক্কা রসিকতা চালিয়ে যাচ্ছে। রসিকতার ভাষা তার শুধু মুখেই বজায় থাকছে না—হাতটাও চলছে ঠোনা মারা, গাল টিপে দেওয়া আর চিমটি কাটার ভেতর দিয়ে। আর ওদিকে ভাদ্র মাসের গরমে পোয়াতি বউ সবুরন মোরগের গোশ্‌ত রান্না করেছে, রান্না করেছে ইরি চালের ভাত আর খেসারির ডাল। শালীকে পাশে বসিয়ে আধকাঠা চালের ভাতে ডাল আর লেবু মেখে মোরগের রানের গোস্‌ত দিয়ে খেয়ে উঠে সুরুজ শ্বশুরের কাছে টাকার দাবি তুলেছে। তার সময় নেই। শহরে নাকি সে মোটর মেকানিকের কাজ শিখছে। বেলাবেলি ফিরতে হবে।

শ্বশুর করমালিকে জামাইয়ের জন্য ধার করে চাল-ডাল কিনতে হয়েছে, কিনতে হয়েছে মোরগের গোস্‌ত রান্না করার জন্য তেল-মশলা। সাড়ে তিন হাজার টাকা মাথায় থাক—এখন তার হাতে সাড়ে তিনটে টাকাও নেই। জামাই যদি দয়া করে রাত কাটাতে চায় তাহলে আবার শ্বশুরকে ধারে চাল জোগাড করতে ছুটতে হবে। আর ঐ ট্রানজিস্টার সেট না কি কয় ও জিনিশটা করমালি এ পর্যন্ত কখনও ভালো করে দেখে নি। আওয়াজ-টাওয়াজ বুঝি শুনেছে দূর থেকে। ঐ বস্তু কিনে জামাইকে দেবার কথা সে কল্পনাতেও আনতে পারে না। কোথা থেকে কেনে—কেমন করে কিনতে হয় তাও সে জানতে চায় না। আবিয়াত্যা মাইয়ার বাপের কতো মিছা কথাই তো কওন লাগে মাইযা পার করার জইন্যে'—এই নীতিবাক্য সার করেই সে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। এখন যা হবার হোক।

যা বহার ত-ই হলো। সুরুজ মিযা টাকার জন্য শ্বশুরকে বাপান্ত করে

ছাড়লো এবং বলা বাহুল্য সবুরনকে বাপের বাড়ি ফেলে রেখে চলে গেল। তারপরের সময়টা দীর্ঘ হলেও ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে গেছে পর পর।

সবুরনের ছেলে হবার খবর পেয়ে সুরুজ মিয়া এসেছিল। কিন্তু ছেলেকে দেখার আগেই সে তুলেছে টাকার কথা। করমালি জামাইয়ের আস্ফালন আর খিস্তির সামনে যেন কাদায় আটকে পড়া মোষ। মোষের মতো নির্বোধ চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিই বা করার আছে তার। মেজাজের ঝাল উগরে দিয়ে সুরুজ যখন এ বাড়িতে জল গ্রহণ না করেই চলে যাবার উপক্রম করল তখন—ঠিক তখনই যেন রঙ্গমঞ্চে নায়িকার আবির্ভাব ঘটল। দুলাভাইয়ের সামনে এসে কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়াল সদ্যযৌবনা শালী।—ইসলো। যামু কইলেই যাওয়া যায় না বুইঝলেন মিয়া সাব? আসার মালিক নিজে আর যাওয়ার মালিক পর।

'পর' বলে সখিনা নিজের বুকে আঙ্গুল ঠেকালো। সখিনায় পবনের সিম ফুল রঙের কালো পাড কাপড়খানা বড বেশি আঁটসাঁট করে জড়ানো, চোখে কলাপাতায় তোলা কাজলের টান, লাল নাইলনের ফিতা জড়ানো বেণীটা দুলছে বুকের ঢেউয়ের ওপর। অতএব সুরুজ মিয়াকে জলগ্রহণ করতেই হল। খেতে হল আউশ চালের ভাতের সাথে সবুরনের বড়কষ্টে পালা হাঁসটার দুটো আণ্ডা ভাজা।

তারপর থেকে প্রায় তিন বছরেরও বেশি এই নিয়ম চলে এসেছে। দু'-এক মাস পর পরই সুরুজ মিয়া এসেছে টাকার তাগিদা দিতে, শ্বশুরকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছে, সামান্য অজুহাতে সবুরনকে মেরেছে কিল-লাথি। সবশেষে যুবতী শালীর সোহাগে ভুলে গিয়ে রাত কাটিয়েছে শ্বশুরবাড়ি। ফলে সবুরন আবার গর্ভবতী হয়েছে। খাওয়ার মুখ আর একটা বেড়েছে। যদিও ঐ এক বছরের মেয়েটার বরাতে ভাতের মাড আর আটা গোলা ছাড়া জোটে না কিছুই। কিন্তু আশ্চর্য প্রাণশক্তি ওর। খিদে পেলেই গলা ফাটিয়ে চ্যাচায় —চেঁচিয়ে মনে হয় আকাশ ফাটিয়ে ফেলবে। টুনির নানা বলে, মর্ মর্। সখিনাও বলে মর্ ছেমড়ি। শুধু সবুরন বলে, আল্লা আমার মরণ দ্যাও। তাই শুনে সখিনা হেসে লুটায়। ঐ কথা কইস না বুবু—তুই মইলে ঐগুলারে দ্যাখব কে?

—ক্যান তুই দেখবি।

সবুরন উত্তর না খুঁজে পেয়েই বুঝি জবাব দেয়।

—আমি! আমি দেখমু কোন্ দুঃখে? অরা আমার কোন্ সতীনের ক্যাথা যে আমি দেখমু?

এবার আর সহ্য করতে পারেনি। আচমকা সবুরন খেঁকিয়ে উঠেছিল—সতীন হওয়ার দেহি বড়ই হালস তর সখিনা?

—অমুন হাউস সখিনা করে না। ক্যান তুই কি মনে করস আমার ভাতার জুটব না? তে মনে রাখিস আমি হাইস্থা কথা কই বইলাই এহনও তর ভাতার এই উঠানে আইসা খাড়ায়।

কথা শেষ করে ঝামটা দিয়ে সবে গিয়েছিলো সখিনা। তাজ্জবের ব্যাপার, ঠিক সেই দিন সন্ধ্যাতেই 'সখিনা কনেরে' বলে সুরুজ করমালির উঠানে এসে দাঁড়াল। তখন ফাল্গুনের মাঝামাঝি। উঠানের চকা আমগাছটা থেকে মুকুলের গন্ধ ঢালছে বাতাস। সুরুজের পরনে কালো ফুলপ্যান্টের ওপর পলিয়েস্টারের নকশীদার পাঞ্জাবি, গলায় বাঁধা রুমাল। তার ডাক শুনেই ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো সখিনা।

—বাব্বা! আইজ দেহি পশ্চিমে সুরুজ উঠছে!

ঘরের ভেতর থেকে দাঁতে দাঁত ঘষে সবুরন চাপা আওয়াজ করলে—হারামজাদী! বেহায়া!

প্রতিবারের মতো এবারও করমালি আর তার বউ তাদের একমাত্র ঘরখানা মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে ছেড়ে দিয়ে নাতিটাকে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে শুয়েছে। শুতে যাবার আগে সখিনাকে কয়েকবার ডেকেছে ওর মা। কিন্তু সখিনার ঠাট্টা-মস্করা শেষই হয় না। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় চাটাই বিছিয়ে বসে কী যে মাতন জুড়েছে ওরা শালী-দুলাভাই। ওদিকে ঘরের ভেতর সর্বাঙ্গে বিছার কামড় সইতে সইতে বুলি ভাবীর কাছ থেকে চেয়ে আনা তেলটুকু মাথায় দিয়ে চুল আঁচড়ে বেঁধেছে সবুরন। বাসন মাজার সময় একচিমটি খইল দিয়ে হাত মুখ ঘষে ধুয়েছে। কাপড়খানা বদলাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সাকুল্যে ওর এই একখানাই আস্ত কাপড়। অন্যখানা এমনই ছেঁড়া যে সেখানা শুধু গোসল করে এই কাপড়খানা শুকাবার সময়টাতে গায়ে জড়ায় সবুরন। হাঁসের ডিম আর একজোড়া মোরগ বেচে হাতে কিছু জমিয়েছে সে। ঠিক করেছিল বাপকে দিয়ে বাজার থেকে যেমন হোক একখানা কাপড় আনিয়ে নেবে। কিন্তু তার আগেই সুরুজ এসে গেল। সবুরনের মনে হয় ওর কপালেই সব সময় এমন উল্টোটা ঘটে। তা নইলে যেদিন ওর গায়ে নতুন কাপড় উঠত

সেদিন না এসে আজও কেন সুরুজ এল? ওদিক আজ বিকেলে সখিনা ঘটা করে পায়ে আলতা পরেছে, চারগুছির বিনুনি করে চুল বেঁধেছে? ঠোঁটেও বুঝি একটুখানি আলতা ঘষেছে। ওকি তাহলে জানতো যে আজ সুরুজ আসবে? সবুরনের মনে সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

একপহর রাত উঠানে হা-হা-হি-হি- করে কাটিয়ে ঘরে এসেছিল সুরুজ। বিছানায় বসেই তার প্রথম কথা—সর্, সইরা শো। মাইয়া মানুষ তো না জানি গোয়াল ঘর – গন্ধে ভূত পালায়।

এ কথার কী জবাব দেবে সবুরন? সে তো জানে তার পরনের কাপড়-সাতদিনের মধ্যে সাবান-সোডার মুখ দেখেনি, গায়ের তেলচিটে ব্লাউজটাতে বুকের দুধ আর ঘামের গন্ধ। জবাব দিলে এই সৌখিন পুরুষ তার মুখে লাথি মেরে বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে। তার চেয়ে নিজের ইজ্জত নিয়ে সরে শোয়াই ভাল। তবু তো লোকে জানবে সবুরনের স্বামী তার ঘরে আসে।

কিন্তু ঘরে আসা মনেই তো আর ঘরে থাকা না। দুইপহর রাতে সবুরনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেয়েটা পেসাব করে কাঁথা-কানি ভাসিয়া দিয়ে কান্না জুড়েছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ভেজা কাঁথা সরাতে গিয়ে সবুরন টের পেলো বিছানায় সুরুজ নেই। ঘরের খোলা ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে জোছনা এসে মেঝের অনেকখানি জায়গা ধুয়ে দিচ্ছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে নামতেই চোখে পড়ল উঠানে বিছানো চাটাইয়ের ওপর দুটো শরীরের উন্মত্ত মাতামাতি। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে ছুটে ঘরে গিয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে দিলো সবুরন। ও বুঝি প্রতিবাদের অন্য কোনো ভাষা খুঁজে পায়নি ঐ মুহূর্তে।

সকালবেলা সারা বাড়ি আর একটু বেলায় সারা গ্রাম জেনে গেলো যে সবুরনের স্বামীর সাথে সখিনা বের হয়ে গেছে। পরের জুম্মাবারেই নামাজ শেষে মসজিদে কথা উঠে গেল করমালিকে লক্ষ করে। যেহেতু তার বড় মেয়ের জামাই তার ছোট মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে এবং জানা কথাই নিকা-বিয়া একটা কিছু করে ঘরবসত করেছে, অতএব শরীয়ত মোতাবেক তার বড় মেয়ের স্বামীর সাথে তালাক হয়ে গেছে। এখন ইদ্দতকাল পুরো হবার পর করমালি তার বড় মেয়েকে নিকা-বিয়া যাহোক একটা দিতে পারে।

কথাটা শুধু মসজিদেই থেমে থাকল না। ইমাম সাহেবের প্রতিনিধি হিশেবে আফাজ মুন্সি করমালির বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াল শুনিয়ে দিতে।

সবুরন প্রথমটায় মাথা নিচু করে আফাজ মুন্সির হুকুমনামা শুনছিল—কিন্তু শেষ কথাটা কানে যাবার সাথে সথে—'আউ-ছি:' বলে, এক দলা থুথু ফেলে ছিটকে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

একবার—ঐ একবারই সবুরন তার রাগ আর ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। তারপর থেকে একদম চুপ হয়ে গেছে। চুপ সে বরাবরই। এখন যেন তার ভেতরে-বাইরে একেবারেই কোনো সাড় নেই। একঘণ্টার কাজ সে টিমিয়ে টিমিয়ে তিন ঘণ্টা ধরে করে—মায়ের বকাবকি, বাচ্চাদের কান্নাকাটি কোনো-কিছুই যেন তাকে ছোঁয় না। সুরুজের হঠকারিতায় সবুরন যতো না কষ্ট পেয়েছে। তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে ওকে বাপ করমালির ব্যবহার। করমালি একবার সুরুজদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেওয়া দূরে থাক; সে যেন ভেতরে ভেতরে বেশ খুশিই। সবুরণ ঠিকই বুঝেছে করমালির খুশি হবার কারণ। প্রথমত জামাই আর কখনও টাকার তাগাদা দিতে এ বাড়ি আসবে না, দ্বিতীয়ত নিখরচায় করমালি আর একটা মেয়েকে বিয়ে দেরার দায় থেকে রেহাই পেয়েছে।

কিন্তু মাসখানেক না যেতেই সবুরনের কানে এল অন্য খবর। এক-দুইকান করে ছড়িয়ে পড়ল দশকানে। সখিনাকে নাকি সুরুজ মিয়া বিয়ে করেনি। এই গ্রামের আজু শেখের শালা নাকি সখিনাকে দেখেছে ঢাকা শহরে রাস্তার ধারে সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে থাকতে। পথচারীদের ডেকে হাসি-মশকরা করতে। এক কথায়, সখিনা এখন যে খাতায় নাম লিখিয়েছে তার সব রকম প্রমাণই হাতে আছে আজু শেখের শালা নান্নুর। সখিনা নাকি নিজেই বলেছে যে, সুরুজ তাকে বিয়ে করে শহরে বাসা করে রাখার লোভ দেখিয়ে এনে এই পাড়ার সর্দারনীর কাছে বেচে দিয়ে পালিয়েছে।

কথাটা নিয়ে গ্রামে কয়েকদিনআলোড়ন চলল বটে। কিন্তু করমালি একদম চুপ। সাধ করে বেরিয়ে গেছে যে মেয়ে সে নিজের কপাল হাতে করেই গেছে। করমালির কি করার আছে। তার ক্ষমতাই বা কতোটুকু।

সবুরন গোপনে আজু শেখের শালার সাথে দেখা করেছিল। জানতে চেয়েছিল সখিনার কথা। নান্নু তার কথার দায়সারা ভাবে উত্তর দিয়েছিল—মানে পথের মইধ্যে দেখা, ঐ রকম জায়গায় কি খাড়ানো যায় কও? তয় সখিনা আমারে চিনতে পাইরা খুব কানলো—।

—কানলো! ক্যান! কানলো ক্যান!

সবুরনের শান্ত চোখে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে উঠতে শুরু করেছে তখন থেকেই।

—কি জানি ক্যান কানলো।

নান্নু আর কথা বাড়াতে দেয়নি সবুরনকে।

ফাল্গুন মাসে সখিনাকে নিয়ে সুরুজ পালিয়েছিল এক মাঝরাতে। আর বৈশাখ মাসের এক থম্ ধরা সন্ধ্যায় এসে দাঁড়াল করমালির উঠনে। এবার আর শালীকে নয়—নিজের ছেলের নাম ধরে হাঁক দিল—কই গেলিরে সাজু।

সেই ডাক শুনে করমালি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে খুব সহজভাবে বলে উঠল—বাজান। আছেন কেমুন আপনেরা ?

—আমাগো তো মস্ত বিপদ গ্যালো। এই বিষ্যুদবারের আগের বিষ্যুদ বারে আমার মায়ে মারা গেলো হঠাৎ কইরা। মরার আগে সাজুর মায়েরে দেখতে চাইছিলো। বাজান আমারে পাঠাইছে তারে লইয়া যাইতে। এদিগে সংসারও অচল, কেডা রান্ধে, কেডা ভাত-পানি দ্যায়।

জামাইয়ের কথার তোড থামতে করমালি বলল—সবুরনকে নিতে আইছো ? হে যদি যাইতে চায় যাউক।

ঠিক তখনই সরকার বাড়ি থেকে ধান ভেনে পিছ-দুয়ার দিয়ে এসে ঢুকেছে সবুরন। তারা সারা শরীরে ধানের কুঁড়ো আর ধুলো, আঁচলে বাঁধা সেরখানেক চাল। ধান ভানার মজুরি। বাপের পেছনে দাঁড়িয়ে সুরুজের কথাগুলো শুনলো সবুরন। তারপর তার পাশ কাটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সাজু ততোক্ষণে একটা ছেঁড়া মাদুর এনে দিয়েছে বাপকে। করমালি বাড়ির বাইরে চলে গেছে। গ্রামের দু'-একজনের সাথে সবুরনের যলন-ব্যাপারে কথা বলতে চায় সে।

সুরজ মিয়া মাদুরটার ওপর চিত হয়ে শুয়ে বেশ গলা চড়িয়ে বলল—সাজু তর মায়েরে ক, সকাল সকাল খাইয়া লইযা আইজ রাইতেই হাঁটা দেওয়া লাগবো। পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটন তো সোজা কথা না।

সবুরন বুঝল সুরুজ দিনের আলোয় এ গ্রামে নিজের চেহারা দেখাতে চায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে সবুরন স্থির চোখে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর নীরস কঠিন গলায় বলে উঠলো—সখিনারে তুমি কতো ট্যাকা দিয়া বেচছো।

বউয়ের গলার এই স্বর সুরুজের অচেনা। সে তড়াক করে উঠে বসে। ধমকের গলায় বলে—এইটা আবার কি কস তুই? তর বইন বাজাইরা স্বভাবের মাইযা, নিজেই হাউস কইরা বাজাবের খাতায নাম ল্যাখাইছে। আমি তরে লইতে আইছি, তুই যাবি কি না তাই ক?

—আগে তুমি সইত্য কথা কও—কতো ট্যাকায বেচছো আমার বইনেরে?

সুরুজের মেজাজ চড়তে শুরু করেছে। ঐ ভিজা বিলাইযের মতো মাগীর এতো সাহস। সুরুজ ওব কোনো ধার ধারে। নেহাৎ সংসার অচল হয়ে গেছে বলে ওকে নিতে এসেছে।

—কি কথার উত্তর দিলা না?

সবুরনের চোখ নডছে না সুরুজের মুখের ওপর থেকে। সুরুজ এবার রুখে উঠল—সইত্য কথা শুনবি, তয শোন, যা দিযা বেচছি তা দিয়া তর বাপের নগদ টাকার দেনা শোধ হইছে, টেনজিস্টারের দাম ওঠে নাই বুঝলি? নে এহন সকাল সকাল কাজকাম সাইরা ল—হাঁটা দেওন লাগবো। সুরুজ আবার চিত হয়ে শুযে চোখ বোজে। রোদ মাথায করে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে এসে তার হযরান লাগছে। এখন একটু ঘুমিযে নিতে চায়। একদৃষ্টে চেযে থেকে সবুরন দেখল ঘর থেকে আসা কুপির ফিকে লালচে আলোয সুরুজকে সেই ধূর্ত খাটাসটার মতো দেখাচ্ছে—যেটা প্রায়ই ওদের বাডির হাঁস-মুরগি চুরি করে পালায।

বাতের ব্যথায কোঁকাতে কোঁকাতে সবুরনের মা দেখলো সবুরন ঘরের বেড়ার গা থেকে ওর বাপের মাছ মারা কোঁচটা খুলে নিচ্ছে। সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সবুরন কোঁচটা নিযে দ্রুত বের হযে যায। পরক্ষণেই পুরুষকণ্ঠে প্রচণ্ড আর্তনাদে বৈশাখের থমধরা রাত্রিটা যেন খান খান হযে গেলো।

মুহূর্তে করমালির উঠান ভরে গেলো মানুষে। সবাই দেখলো সবুরনের হাতের কোঁচটা সুরুজের চিৎ হযে শোযা শরীরটা এফোঁড-ওফোঁড করে ফেলেছে। সবুরনের সারা শরীরে ধুলো, রুক্ষ চুল হঠাৎ-ওঠা বৈশাখী হাওযায উড়ছে, দু'চোখে পলক পডছে না।

মাটির দাওয়া বেযে রক্তের ঢল নামছে।

সালেহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা

পূরবী বসু

পদ্মার ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে ছোট নিরিবিলি গ্রাম তারপাশা। আশে-পাশেই রহিয়াছে হলদিয়া, ষোলঘর, শ্রীনগর, শিমুলিয়া ও দিঘলী। সন্ধ্যা হইতে বেশি বাকি নাই। হেমন্তের মাঝামাঝি সময়। বেলা পড়িতে না পড়িতেই এখন শীত নামিয়া আসে।

সকাল হইতেই সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া একটা উৎসব উৎসব আমেজ। রহিমার নিকানো উঠানের উত্তর ধারে বসানো বিশাল মাটির উনানটায় আজ অপরাহ্ণে আগুন জ্বালানো হয় নাই। ধান সিদ্ধ করিবার এখন সময় কোথায় তাহার? কন্যা সুফিয়ার মাথায় ভাল করিয়া তৈল মাখাইয়া দেওয়া হয় না অনেকদিন। চুল তো নয়, পাটখড়ি। রহিমা প্রথমে কন্যার মাথার ঠিক মধ্যস্থলে বোতল হইতে বেশ খানিকটা আধা-জমা সাদা সাদা নারিকেল তৈল ঢালিয়া দিল। তাহার পর ডাইন হাতের তালু কন্যার মাথায় ক্রমাগত চপাস চপাস শব্দে উঠানামা করাইয়া সম্পূর্ণ তৈলটিকে মাথাময় ছড়াইয়া দিতে থাকিল। মনে মনে ভাবিল যদি এই সুশীতল তৈলের খানিকটাও মস্তিষ্কের ভিতরে কোনরকমে ঢুকাইয়া দেওয়া যায়। সে শুনিয়াছে নারিকেল তৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে—অন্তর নির্মল করে। এই সময়—গ্রামের এই ভরা দুর্দিনে বড় প্রয়োজন শরীর ও মন ঠাণ্ডা রাখা। সুফিয়ার মাথায় যেন কোন কুমতলব ভর না করে। রহিমা আরও খানিকটা নারিকেল তেল ঢালিল কন্যার মস্তকে। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া সুফিয়ার চুলগুলো ভাল করিয়া কাঁকই দিয়া আঁচড়াইয়া দিল। দুই ধারে দুইটি বেণী গাঁথিয়া, প্রতিটি বেণী দুই ভাঁজ করিয়া লাল ফিতা দিয়া কানের পাশে ফুল করিয়া দিল। গ্রামের একটি কন্যার দুর্দশা আর পতনে অন্য কন্যাদের প্রতি পিতামাতার বড়ই নজর, অন্তত আজিকার এই সন্ধ্যাবেলায়। রহিমা এইবার ওজু করিয়া আসরের নামাজটা আদায় করিয়া লইবে। উহার পর অন্যান্য

প্রতিবেশী মহিলাদের সঙ্গে যাইবে সালেহাদের বাড়িতে।

সালেহাদের ঘরের দরজার বাহিরে প্রচুর লোকসমাগম এখন। পুরুষরা সকলেই বাহিরে। উঠানে পাতিয়া দেওয়া হোগলার উপর এক সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছে বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, তরুণ ও কিশোর। দেখিয়া মনে হয়, গ্রামের লোক তো বটেই, ভিন্ন গ্রাম হইতেও মানুষ আসিয়াছে। সকলেই কাহারো না কাহারো সঙ্গে খোশগল্পে মত্ত। কেউ কেউ আবার ইহারই মধ্যে হুক্কায় সুখটান দিতেছে। কেউ পান চিবায়। কাহারো কাহারো হাতে জ্বলন্ত বিড়ি।

ঘরের ভিতরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে সালেহা। তাহাকে ঘিরিয়া জটলা করিতেছে পাড়ার মহিলারা। সালেহা কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছে না। একেবারে ভাবলেশহীন বসিয়া রহিয়াছে। পরনে সবুজ সুতি শাড়ি। তাহার লম্বা কালো চুল পিছনের দিকে টানিয়া আঁচড়াইয়া একটা শক্ত খোঁপায় প্যাঁচানো।

মাগরিবের নামাজের পর পরই সালিশী বসিবে। আকমল মোল্লা চোখে কম দেখেন আজকাল। খদ্দরের পুরানো চাদরখানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়াছেন। নাতির কাঁধে হাত দিয়া ঠক ঠক শব্দ করিতে করিতে রহমতের গোয়ালের পাশ দিয়া চলিয়াছেন আজিকার সভায় যোগ দিতে। খালির পুকুরের পাশের বিশাল মাঠ আর তাল গাছের সারি ভাঙ্গিয়া গোপালদের রান্নাঘরের পিছনে যে বিরাট খাদ, তাহার পাশ কাটাইয়া এদিকেই আগাইয়া আসিতেছে আরও দশ বার জন নারী পুরুষ। আজি বোধহয় কেহই আর নিজের ঘরে রহিবে না। সালেহার ভাগ্য নির্ধারণ করিতে সকলেই আজ অংশগ্রহণ করিবে। পশ্চিম দিকের কালু শেখের কলাই ক্ষেতের আইল ধরিয়া একজনের পিছনে একজন করিয়া হাঁটিয়া আসিতেছে সাত-আট জন। তাহাদের কাহারো হাতে নিবানো কুপি, কাহারো হাতে আলোহীন হ্যারিকেন। রাত্রি বেলা ঘরে ফিরিয়া যাইবার পূর্বপ্রস্তুতি। সকলেরই গন্তব্য সালেহাদের বাড়ি। অবশেষে আসিলেন গ্রামের বৃদ্ধ কাজী। আসিলেন শহরে পড়াশুনা করা মসজিদের যুবক ইমাম। আসিলেন মাদ্রাসার মৌলবী। আসিলেন চৌধুরী বাড়ির মেজ সাহেব। বড় সাহেব পক্ষপাতে পঙ্গু। মেজই এখন সমস্ত গ্রামের মুরুব্বী। সবার শেষে আসিয়া উপস্থিত হইল কাশেম মোল্লা ও তাহার পিছনে পিছনে মাথা নিচু করিয়া কাশেম মোল্লার একমাত্র পুত্র সোবহান। দেখিয়াই বোঝা যায়, সোবহানের হাঁটিতে বেশ কষ্ট হইতেছে।

খানিকটা কুঁজা হইয়া, তলপেটের দিকটা ভিতরের দিকে টানিয়া লইয়া, বুকটা সামনে ঝুঁকাইয়া, ডাইন পা টানিয়া টানিয়া সোবহান আসিয়া উপস্থিত হয় সালেহাদের উঠানে। এইখান হইতেই রক্তাক্ত সোবহান রাত্রের অন্ধকারে চিৎকার করিতে করিতে পলাইয়াছিল গত সপ্তাহে।

সকলেই বসিয়া আছে হোগলাতে। সংবাদপত্রের লোকও আসিয়াছে একজন। পূর্বদিকের কোনায় চুপচাপ বসিয়া আছে। শুধু সোবমানই একা দাঁড়াইয়া থাকে। বৃদ্ধ পিতা কাশেম হাতে করিয়া লইয়া আসিয়াছে একটা উঁচু জলচৌকি। উঠানের এক কোনায় সেই বিশাল কাঠের জলচৌকিটা পতিয়া দেয় সে। তাহার পর হাত কচলাইতে কচলাইতে সমবেত গ্রামবাসীর কাছে আহত পুত্রের পক্ষে মাটিতে বসা অত্যন্ত কষ্টকর এই বিবেচনায় তাহাকে জলচৌকিতে বসিতে দিবার অনুমিত প্রার্থনা করে। ইমাম সাহেব ও মেজ চৌধুরী পরস্পরের সঙ্গে চক্ষু চাওয়া-চাওযি করিয়া কাশেমের অনুরোধ অনুমোদন করিলে সোবহান আস্তে আস্তে জলচৌকিতে উপবিষ্ট হয়। বসিবার সময় বাম হাত দিয়া দুই উরুর মাঝখানে লুঙ্গির কুঁচকানো অংশ চাপিয়া ধরিতে হয় তাহাকে। দাঁত দিয়া নিচের ঠোঁটটিকেই জোরে কামড়াইয়া ধরে সোবহান। উঠানের লোকজনের মধ্য হইতে এই সময় নানানরকম অস্পষ্ট ধ্বনি ও কথা ভাসিয়া আসে। সোবহান মাথা নিচু করিয়া বসিয়া থাকে।

ইতোমধ্যে সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। দিঘলী বাজারের করিম ব্যাপারী তাহার দোকান হইতে আনা একটা হ্যাজাক লাইট জ্বালাইয়া অন্যটিকে জ্বালাইবার জন্য হ্যাজাকের তলার দিকে অবস্থিত কেরোসিনের ভাণ্ডারটিতে অনবরত পাম্প করিয়া চলিয়াছে। হোগলার উপর চাদর মুড়ি দেওয়া এত-গুলো মানুষ। উঠানের এই পাশে একটি গয়া ও জাম্বুরা গাছ, অন্য পাশে দুইটি ছনের ঘর, হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোতে এই সব কিছু—সমস্ত পরিবেশটা কেমন অপরিচিত অবাস্তব মনে হয়।

বিচার

সালেহাদের ঘরের যে দরজা জাগ্রত গৃহবাসীদের নিকট কখনও বন্ধ হয় না, সব সময় যা হাঁ' করে খোলা থাকে, সেখানে আজ লম্বা ভারী কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। পর্দার বাইরে উঠোনের কোণে ঘরের দোরগড়ায় একটা লম্বা বেঞ্চি পাতা হয়েছে। ওখানে এসে একে একে বসেছেন ইমাম সাহেব, কাজী,

মেজ চৌধুরী, মৌলভী ও আকমল মোল্লা। পর্দার ওপারে ঘরের ভেতর চৌকিতে বসে আছে সালেহা। সালের মা ঘরের অন্য পাশে মাটিতে স্থির হয়ে বসে আছে, মাথাটা বেড়ার গায়ে কাত হয়ে হেলান দেয়া। গ্রামের অন্যান্য মহিলারা ঘরের ভেতর থেকে পর্দা ও বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি ঝুঁকি মারছে।

প্রথমেই চৌধুরী সাহেব আজকের সালিশের মূল অভিযোগ এবং এর বাদী ও বিবাদী শনাক্ত করেন। তাঁর নির্দেশে উঠোন থেকে কাশেম মোল্লা ও সোবহান এবং ঘরের ভেতর থেকে সালেহা স্ব স্ব হাজিরার ঘোষণা দেয়। এরপর কাজী সাহেব সালেহা ও কাশেমকে উদ্দেশ্য করে উপদেশ দেন যাতে তাদের যা যা প্রশ্ন করা হবে, সেগুলোর সঠিক, স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় তারা। এই পর্যায়ে সম্পূর্ণ সালিশীর ভার গিয়ে পড়ে মসজিদের ইমামের উপর, যিনি বয়সে তরুণ হলেও জ্ঞানে ও মর্যাদায় সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন। ইমাম সাহেব প্রথমে সালেহাকেই জেরা করা সাব্যস্ত করেন।

ইমাম : আপনের নাম, পিতার নাম, বাসস্থান ?

সালেহা . সালেহা বেগম, পিতা মরহুম ফজলুল মিঞা, বাড়ি তারপাশা বিক্রমপুর।

ইমাম : আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনে গত বুধবার দিবাগত রাইত আটটার সময় কাশেম মোল্লার পুত্র সোবহান আলির পুরুষাঙ্গ একটি বটি দিয়া প্রায় অর্ধেক কাইট্যা ফেলাইছেন। এ অভিযোগ সত্য ?

সালেহা : জ্বি।

বাইরে অস্ফুট গুঞ্জন। কাজী সাহেব হাতের ইশারায় জনতাকে শান্ত হতে বলেন। সোবহান তার জলচৌকিতে একটু নড়ে চড়ে বসে। যন্ত্রণাটা এই মুহূর্তে যেন একটু বেড়ে গেছে তার। কাশেম মোল্লা তার ডান হাতখানা আলতোভাবে একবার ডান গালে, একবার বাঁ গালে ছোঁয়ায় আর আস্তে আস্তে 'তোবা তোবা' উচ্চারণ করে।

ইমাম : এই ঘটনার কোন সাক্ষী আছে ?

সালেহা : না

ইমাম : আপনার আম্মা তখন কই ছিল ?

সালেহা : রেকেয়াগো বাড়িতে ধান বানতে গেছিল।

ইমাম : ক্যান কইরতে গেলেন এই কাম ?

সালেহা : নিশ্চুপ।

ইমাম : হ্যায় কি আপনার শরীরের উপর সবসময় জবরদস্তি করত ?

সালেহা : না

ইমাম : তাইলে ?

সাহেলা . নিশ্চুপ।

ইমাম : যেদিন আপনে তার পুরুষাঙ্গ কাইট্যা দিলেন সেইদিন ছাড়াও কি সে, মানে হেব আগেও কি সোবান আপনার গাযে হাত দিছে ?

সালেহা : হ, দিছে।

ইমাম : কতদিন আগে হেয প্রথম এই কাম করছে ?

সালেহা : তিন বছর আগে। টাউনে পইড়তে যাইবার আগে।

আবার বাইরে তুমুল গুঞ্জন। প্রায় প্রত্যেকের মুখ থেকে 'ওগাস্তাক ফেরুল্লাহ' জাতীয শব্দ উচ্চারিত হয। মৌলবী সাহেব ও মেজ চৌধুরীর ঠোঁট জোড়া ক্রমাগত শব্দহীন নড়াচড়া করে। ইমাম সাহেব একবার গলা খাঁকারি দিযে স্বরটা পরিষ্কার করে নেন। তারপর বাঁ হাত দিযে থুতনির কালো দাড়িতে আস্তে আস্তে হাত বুলান। বৃদ্ধ কাজী জোরে জোরে 'নাউজুবিল্লাহ' আওড়ান।

ইমাম : আপনি এমন কুকর্ম ক্যান্ কইরলেন ?

সালেহা : চুপ।

ইমাম : সোবান কি আপনারে মিথ্যা কথা কইছে ? প্রতারণা করছে ?

সালেহা : না।

ইমাম : সে কি আপনারে বিবাহের লোভ দেখাইছিল ?

সালেহা : না। তবে তিন বৎসর আগে হ্যায় বিযার কথা কোন সময় মুখে লইত না। এইবার শহর থেইক্যা ফিরা আইস্যা কিন্তু বিযার প্রস্তাব করছে কযেকবারই।

ইমাম : বিযা হয নাই ক্যান্ ?

সালেহা : আমি রাজি অই নাই।

ইমাম : ক্যান্ ?

সাহেলা : আমি জানি আমার লগে বিয়েতে কেউ মত দিব না।

ইমাম : সোবান কি আপনারে ডর দেখাইত ? মানে আপনে তার লগে মিলতে রাজি না অইলে সে আপনের ক্ষতি করব, লোকের কাছে সব

বইল্যা বেড়াইব, নিন্দা করব, এমন কথা কইত ?

সালেহা : না।

ইমাম : তাইলে আপনি ক্যান্ এই কাজ কইরলেন ?

সালেহা : চুপ।

ইমাম : আপনে কি ডরাইতে ঐবার সে শহরে যাইবার আগে আপনের যে অবস্থা কইরা গেছিল, আবার ঐ অবস্থায় পড়বেন ?

সালেহা . না। তিন বৎসর আগে আসি অনেক কিছুই জানতাম না। বোকা আছিলাম। আই বিপদে পড়ছিলাম। অখন জানি কি কইরতে অয়। আর ডরাই না।

উঠোনে এবং ঘরে সমস্বরে নানাবিধ ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। কাজী সাহেব বেঞ্চি থেকে উঠে দ্রুত ঘরের পেছনের দিকে প্রস্থান করেন। মৌলবী সাহেব 'নাউজুবিল্লাহ' 'নাউজুবিল্লাহ' বলে দু'হাত দু'কানের পাশে ধরে মাথার টুপিটি সোজা করে বসান। রহিমা ঠেলেঠুলে সুফিয়াকে ঘরের উল্টোদিকে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বলে সে নিজেকে ক্রমাগত দোষারোপ করে।

ইমাম . আপনে ক্যান্ এই কাজ কইরলেন ? যখন সোবান আপনারে ছুঁইতো, আপনের কি খুব খারাপ লাগত ?

সালেহা . না, খারাপ লাগত না। বালই লাগত। বেশির ভাগ সময়েই খুব বাল লাগত।

সমবেত কণ্ঠে আবার 'ওযাস্তাক ফেরুল্লা' উচ্চারিত।

ঘরের ভেতরে মহিলাদের প্রত্যেকের মুখে আঁচল। ইমাম সাহেব এবার শব্দ করে নয়, নিজেকে পাক পবিত্র করার জন্য মনে মনেই কাঙ্ক্ষিত শব্দগুলো আওড়াতে চেষ্টা করেন। তার পাতলা ঠোঁট দু'টো অনিয়ন্ত্রিতভাবে নড়াচড়া করতে থাকে ক্রমাগত।

ইমাম : আপনে কি জানতেন যে কাজ আপনে করতাছিলেন, সেটা জেনা ? জাহান্নামে যাইতে অইব ? দোজখের ডর নাই আপনের ?

সালেহা : দোজখে যখন যাইতেই অইব, ডরাইয়া আর করুম কি ?

ইমাম : যে লোকটা আপনারে বিপদে ফালাইয়া শহরে চইল্যা গেল, আবার তার লগেই মিলামিশা কইরতে আপনার শরম লাগল না ? গিন্না লাগল না ?

সালেহা : লাগছিল। তার পরে বুজলাম আমার আর কোনদিন বিয়া অইব

না। গরু-বাছুর দেখন্, পাককরণ, ধান সিদ্ধকরণ-এই গতর খাটাইয়াই জীবন কাটব। আর মা'র পিছা লাত্থিতো খাইতে অইব সব সময়। সোবান ভাই আমারে পছন্দ করে। আমারে কোন সময় বকাবকি করে না। হ্যায় যখন আইত আমার খুব ভাল লাগত। অনেক আনন্দ দিছে আমারে সোবান ভাই। আর হেইবার শহরে যাইবার আগে আমার বিপদের কথা হ্যায় জানতও না।

বাইরের লোকজনের মধ্যে এবার উত্তেজনাটা আর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কিনা সন্দেহ। কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মন্তব্য করে। মেয়েটির বেহায়াপনায় ঘরের ভেতরের মেয়েরাও স্তম্ভিত, লজ্জিত। সালেহার মা ক্রমাগত মাটিতে মাথা ঠোকে। মহিলারা সকলেই তাদের ঘোমটা আরও বড় করে টেনে দেয়, যদিও ঘরের ভেতর কোন পুরুষ মানুষই নেই। ইমাম সাহেব আবারও নিজেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে মনে মনে দোয়াদরুদ পড়তে থাকেন। সালেহা পরবর্তী প্রশ্নের জন্যে কান খাড়া করে।

ইমাম : সোবান কী করছিল ঐদিন ? হঠাৎ ক্যান্ আপনে এত ক্ষেইপ্যা গেলেন ? আপনারে মারছে ? বকাবকি করছে ? কাইজ্যা করছিলেন আপনেরা ?

সালেহা : না।

ইমাম : তাইলে ?

সালেহা একটু চুপ থাকে। যে কথাটা না বলার জন্যে বহুভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল সে, অবশেষে তা বেরিয়েই আসে। সালেহা আস্তে করে বলে, "আমার হেদিন ইচ্ছা করে নাই"।

কী ? কী বলল সালেহা ? সকলে উৎকর্ণ হয়ে পড়ে। উপস্থিত গ্রামবাসী প্রত্যেকেই শুনতে চায় কথাটা। ভাল করে শোনা যায় নি কি বলেছে সালেহা।

কী ? কী করে নাই ? কি শব্দ উচ্চারণ করল সালেহা ? যারা শুনতে পেয়েছে তারাও নিজেদের কানকে অবিশ্বাস করে আবার শুনতে চায়। যারা শুনতে পায় নি, তাদের আগ্রহ এখন তীব্রতর হয়।

ইমাম : আপনের সেই মনের কথা তারে জানাইছিলেন ?

সালেহা : হ, কইছিলাম।

ইমাম : সে কি কয় ?

সালেহা : পাত্তা দেয় নাই। জোর কইরতে চাইল।

ইমাম : এর আগে আর এমন করছে ?

সালেহা : হ, গত সপ্তায়ই করছিল। আমার ইচ্ছা নাই জাইন্যাও সে জোর করছিল।

ইমাম : তখন আপনি কী করছিলেন ?

সালেহা : তার উপুড করা মুখে স্যাপ ছিটাইয়া দিছিলাম।

আবার সমবেত গ্রামবাসীর মধ্যে মিলিত গুঞ্জন। মৃদু উত্তেজনা। অনেক-গুলো অশ্লীল ও তির্যক মন্তব্য।

ইমাম : সে কি করল তখন ?

সালেহা : স্যাপ মুইছ্যা ফালাইয়া হাইস্যা কইল, তরে রাগ করলে খুব সুন্দর লাগে। তারপর যা কইরতে চাইছিল তাই করল। এইবার তাই আমি ঐ সুযোগ দেই নাই।

বাইরের লোকজন এতক্ষণে অধৈর্য হযে পড়েছে। তারা এখনও শুনতে পায নি সালেহার অপরাধের পেছনের কারণটি কি। বড় আস্তে সে কথাটি বলেছিল সালেহা। শব্দটা শ্রুতিগোচর হয় নি। গ্রামবাসীদের অনুরোধে ইমাম সালেহাকে নির্দেশ দেন কেন সে এই কাজ করেছে সেই জবাবটা জোরে আরেক বার বলতে, যাতে সকলে শুনতে পায়। সালেহা তখন পদা সরিয়ে দরজার বাইরে বেরিযে আসে। তারপর সকলের সামনে দাঁড়িযে বলে, "আমি ঐ কাজ করছি এর লেগ্যা যে, ঐদিন আমার ইচ্ছা করে নাই, তারপরেও হ্যায় জোর করছিল"।

শুধু সোবহান নয়, কাশেম মোল্লা নয়, মসজিদের সদ্যবিবাহিত জোয়ান ইমাম,তার পাশের বৃদ্ধ কাজী, মৌলবী সাহেব বা মেজ চৌধুরীও নয, তামাম গ্রামবাসীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হ্যাজাক লাইটের উজ্জ্বল আলোতে ঘরের দরজার সামনে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে সালেহা। মনে হয সে যেন এ গ্রামের কেউ নয়। যেন মূর্তিমতী এক ইচ্ছাময়ী দেবী অথবা কোন প্রেতাত্মা।
সালেহার কণ্ঠনিঃসৃত অনুচ্চ, ছোট্ট ও মোলায়েম শব্দটি হঠাৎ বেগবতী হইয়া উঠে।

আর তখন ইচ্ছা, একটি স্বরবর্ণের পিছনে পিছনে দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ, যাহা দৃশ্যত ও শ্রুতিগতভাবে খুবই কাছাকাছি, একে অন্যের পিঠে চড়িয়া গ্রামময়, এই প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত, মনের খুশিতে ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে।

ইচ্ছা এখন গাছের ডালে।

ইচ্ছা ঘরের চালে।

ইচ্ছা আকাশে।

ইচ্ছা বাতাসে।

ইচ্ছা মাটিতে, পানিতে, কাদায়, মানুষে।

রাবেয়া আজ স্থির করিয়াছে চুল বাঁধিবে না। এলো চুল পিঠময় ছড়াইয়া দিয়া চুপ করিয়া দরজার সামনে বসিয়া আছে সে। তাহার লম্বা ঘন কালো চুলের কোঁকড়ানো সিঁড়ি বাহিয়া আঁধার চুঁইয়া নামিয়া আসে ধরণীতে। ত্রয়োদশীর বিশাল চাঁদ বুকে লইযাও সুনীল আকাশ সেই গহীন অন্ধকার হইতে এই তারপাশা গ্রামটিকে আলোকিত করিতে ব্যর্থ হয়।

রামতনুর ছোট মেয়েটি আজ নামতা পড়িবে না। কেননা সংখ্যা আর গুণফলে তাহার আসক্তি নাই এক্ষণে। সে জোরে জোরে ছড়া আওড়াইতে থাকে। জোবেদা আজ রাঁধিবে না। তাহার শশুড়ি ও স্বামী গিয়াছে সালিশীতে। সে তাই আজ আয়াস করিতে চায। রান্নায় মন নাই। শেফালী আর গন্ধরাজের কলি আজিকার রাত্রে প্রস্ফুটিত হইবে না। এই ভয়াবহ রাতে, এই বিষাক্ত বাতাসে সুগন্ধ ছড়াইতে শ্বেতশুভ্র পাপড়ি মেলিতে তাহাদের ইচ্ছা করিতেছে না নদীতে আজ জোয়ার ভাঁটা হইবে না। চাঁদের ইচ্ছা হয় নাই তাই। নদীর সহিত সে যুক্তি করিয়া এই সিদ্ধান্ত লইয়াছে। আগামীকাল ভাইফোঁটা। ভাতৃদ্বিতীয়া। ঘাস আর লাউয়ের পাতার উপরে পড়া শিশির, যাহাকে ইহারা ওস বলিয়া সনাক্ত করে এই গ্রামে, সংগ্রহ করিয়া তাহা দিয়া চন্দন বাটিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবে ভগ্নিগণ। সহোদরের সকল অকল্যাণ তিরোহিত হয় তাহাতে। কিন্তু শিশিরও আজ মনস্থির করিয়াছে আর মাটির দিকে ধাবমান হইবে না। আমগাছের ডালের উপর, কড়ুই গাছের পাতার নিকট, খোলা মাঠের অনেক উপরে শূন্য দিগন্তে তাহারা সমান্তরালভাবে খেলা করিতে থাকে।

হোগলার কোনায় নীরবে উপবিষ্ট সংবাদপত্রের স্থানীয় প্রতিনিধিও এইমাত্র মনে মনে একখানি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। গত তিনদিন ধরিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মফঃস্বলের যেই সকল সংবাদ সে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, যেমন, হলদিয়ায় প্রচুর আমের মুকুল ধরিয়াছে, ডুডু মিঞার বেগুনের ভিতর ঐশ্বরিক আরবী শব্দ আবিষ্কৃত, অথবা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার কথিত সন্তানটি তাহার ঔরসজাত নয়, সেইগুলো সকলই তাহার কাছে এই মুহূর্তে কেমন বিবর্ণ ও

গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে। তাহার চোখের সম্মুখে আজিকে রাত্রিতে যাহা ঘটিল, সারারাত ধরিয়া কেবল তাহাই লিখিবে সে। অন্য কিছু নয়।

এতদিন ধরিয়া বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক খালেক সরকার জানিত শরীরের মধ্যে কেবল মুখ গহ্বরেই একটি বিচিত্র ঢাকনি আছে যাহা খাইবার সময় শ্বাসনালীকে এবং নিঃশ্বাস লইবার সময় খাদ্যনালীকে ঢাকিয়া রাখে। আজ সে পরম বিস্ময়ে আবিষ্কার করিল এই রকম আরেকটি শক্ত, চলন্ত ও আজব ঢাকনি রহিয়াছে শরীরের অন্যত্রও যেখানটার প্রবেশপথ সর্বদাই উন্মুক্ত বলিয়াই সে মনে করিত।

খালেক এটাও জানিত পানির গতি নিম্নমুখী। পুরুষ তাহার শারীরিক তেজ-বিক্রম আর প্রত্যঙ্গগত বৈচিত্র্যের কারণে পানির এই ধর্মকে কখনও কখনও অস্বীকার করিতে সমর্থ হইলেও নারীর শরীর-বহিষ্কৃত পানি সর্বদাই নিম্নগামী। কিন্তু আজ সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল তাহা সর্বাংশে সত্য নহে। গ্রামের প্রায় কেহই আজ ঘরে নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। খালেক ও তার স্ত্রী সেলিমা ছাড়া খালেকদের বাড়ির সকল নারী-পুরুষও গিয়াছে সেই সালিশীতে। খালেকের না যাইবার পিছনে যে উদ্দেশ্যটা সবচাইতে বড় ছিল, রাতের অন্ধকারে, বসতবাড়ির এই দুর্লভ নিজনতায় তাহা এই মুহূর্তে তাহাকে পরিপূর্ণভাবে দখল করিয়া লয়। সেলিমার মেয়েলী আপত্তি ও বাধাকে অতিক্রম করিয়া সে বীরের মত প্রচণ্ড দাপটে প্রবেশ করিতে চায় তাহার নিজস্ব ভুবনে—যেখানকার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, সম্পূর্ণ অধিকার কেবল তাহারই আছে বলিয়া সে বরাবর জানিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ইচ্ছা তখন কাঁপিতেছে শুধু খালেকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয়, সেলিমার প্রতিটি জীবকোষে, তাহাদের শুইবার ঘরের বাতাসে-খোলা জানালায়-খাটের বাজুতে-তোসকের তুলায়-বালিশের ঢাকনায়। বাহিরে হিমেল হাওয়া, আকাশে কাস্তের মত চাঁদ, এই নিরবচ্ছিন্ন অবসর, ঘরের ভেতর নিজনতা সব মিলাইয়া আজিকার এই দুর্লভ সন্ধ্যা হইতে সেলিমার প্রত্যাশা ছিল ভিন্ন রকমের। তাহার ইচ্ছার প্রকৃতি ছিল অন্য লয়ে। পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া স্বামীর আলতো আদর গ্রহণ করিতে করিতে একান্ত নিভয়ে নিঃসঙ্কোচে মনের গভীরে অনেক কথা আজ খুলিয়া বলার সুযোগ হইবে সে ভাবিয়াছিল। খালেক সেটা বুঝিতে চাহিল না। তাই তাহার প্রবেশ পথে প্রথমে সে পাথরের মত শক্ত দেওয়াল অর্থাৎ পূর্ব-অপরিচিত ইচ্ছার ঢাকনিতে বাধা পাইল। তাহার পরও

যখন সে থামিল না বরং আরও অগ্রসর হইতে চাহিল, তখন পদার্থবিদ্যায় লিখিত পানির সেই চিরাচরিত ধর্ম অস্বীকার করিয়া সেলিমার শরীর-নির্গত একরাশ গরম ক্রমাগত ছিটাইয়া পড়িতে থাকিল খালেকের সর্বাঙ্গে। প্রথমে তাহার উরু, তলপেটে, পরে বুকে, গলায় ও হাতে সর্বশেষে মুখে, মাথায়—সর্বত্র।

জীবিতা সালেহা

সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও মাথা-ধরা নিয়ে বিছানায় ছটফট করছে সালেহা। তার পিঠে, হাতে, পায়ে, এমন কি মুখেও, কালো এবং লাল লম্বা সরু সরু আঘাতের চিহ্ন। বিধবা মা গরম পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে সেইসব বিচিত্র রেখাগুলো আস্তে আস্তে মুছিয়ে দেয়। তারপর ছেঁচা রসুনের সঙ্গে সরষের তেল গরম করে হাতের আঙুল দিয়ে তার দাগগুলোর ওপর বুলাতে থাকে। পিঠের যেসব জায়গায় লম্বালম্বিভাবে ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছিল, সেখানে কিছুক্ষণ আগে জ্বলন্ত সলতে দিয়ে সেঁকে দিয়েছে মা। পেকে যাবার মত 'কষ্টকর অভিজ্ঞতা এড়াতে এ নিষ্ঠুর ও যন্ত্রণাময় প্রতিষেধক কাজটি করতেই হয় কখনও কখনও। সালেহার গায়ে জ্বরও এসেছে খানিকটা। মাথায় ঠাণ্ডা পট্টি দেবার জন্যে আরও খানিকটা পরিষ্কার তেনা ছিঁড়তে থাকে সালেহার মা। কুপির মৃদু আলোতে চৌকির কোনায় বসে দু'হাত দিয়ে কাজ করছে আর মুখ দিয়ে অনবরত কন্যাকে অভিসম্পাত করছে প্রৌঢ়া। "তুই বৎসর বয়সে লুস্তিতে তো মইরাই গেসিলি। ঘা'ওয়ে শরীল গইল্যা গেছিল। আলু বাটা মাখাইয়া কলাপাতায় শোয়াইয়া রাখতাম। হায় আল্লাহ, তখনও যদি মইরা যাইতি। তুইও শান্তি পাইতি-আমিও পাইতাম।"

শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে আবার বলে, "বংশের মুখে চুনকালি মাখাইলি। লোক হাসাইলি। সাত গেরামের লোকের সামনে এমন কইরা অপমান সইব, তারপরেও ক্যান মরতে পারলি না পোড়ামুখি। বিষ খাইয়া, গলায় দড়ি দিয়া মরলি না ক্যান্?"

সালেহা চোখ মেলে তাকায়। মায়ের মুখের প্রতিটি শব্দই তার কানে গিয়েছে। সে রাগ করে না। নিঃশব্দে হাসে। বলে, "ক্যান্ করলাম না, জানস আম্মা?"

"না, জানি না। জানতে চাইও না। তোমারে আর নকরামি কইরতে

অইব না। জানি তো কবি মইরতে ইচ্ছা করল না, হের লেইগ্যা মরি নাই। নাইলে কবি তরে ছাইড়া যাইতে কষ্ট হইছিল আম্মা।"

প্রবল বিতৃষ্ণায় মা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সালেহা আবার হাসে। মাথাটা ঈষৎ নাড়ায় এ পাশ ওপাশ।

"না লো মা। হেইটাই কোনটাই কমু না। মরি.নাই ক্যান্ জান্স? রোজই গুম থেকে উইঠ্যা ভাবি কাউলকা থেইক্যা সুদিন আইব। আহে না। হের পরও ক্যান জানি বাঁইচ্যা থাকতে ইচ্ছা করে।"

দিন ক্ষণ মন

দিলারা হাশেম

দরজার ত্ব'বার মৃত্ন-টোকা। তারপর চুপ, নিশ্চুপ। আর কোন সাড়া নেই।

দরজা না খুলেই আলীমা বুঝতে পারলো কে এসেছে। সাড়া দিল না। বিছানা থেকে আস্তে মাটিতে নেমে স্লিপারটা গলিয়ে নিল পায়ে। রাত এখন বেশী নয়। সবে সাতটা। শব্বিরের থার্ড ট্রান্সমিশন ডিউটি। সাভার ট্রান্সমিটিং অফিস থেকে ফিরতে এখনও তার অনেক দেরী। সেই রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটার কম নয়। ততক্ষণ রোজই এমন। কেউ না কেউ আসেই। নইলে সময় কাটে কি করে আলীমার!

স্পঞ্জের স্লিপার পায়ে গলিয়ে শব্দ না করেই একপা, ত্ব'পা করে এগুলো আলীমা। দরজার দিকে নয়, দাঁড়াল এসে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে। বিকেল থেকে বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে মুখে চোখে নেমেছে অলস, শিথিল. স্নিগ্ধ মাধুর্য্য। মুখটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এপাশ ওপাশ থেকে বার ত্ব'এক দেখে নিল সে। নিজেই যেন মোহিত হ'ল নিজেকে নিয়ে। অথচ কলেজে পড়ার সময় মেয়েরা ওকে বিশেষ আমল দিত না। বলত ও দেখতে ভাল না, ওর রং কালো, গড়নটা মোটা গোটা—এমনি অনেক কিছু। কিন্তু তখনও ওর ভেতরে কেমন এক ধরনের চাপা বিশ্বাস ছিল যে ও দেখতে ভালই, মেয়েগুলো হিংসে করে অমন বলে। এখন সে ধারণাটা স্পষ্ট, প্রতীয়মান। সে দেখতে ভালো বেশ ভালো—এ সম্পর্কে ওর মনে এখন কোন দ্বিধা নেই। তা নইলে একের পর এক পুরুষগুলো কিসের আকর্ষণে ওর কাছে পতঙ্গের মত এসে ধরা দেয়!

আয়নার দিকে আর একবার তাকাল আলীমা। মুনিরের 'রিমার্কটা'র কথা মনে করে ওর স্ফুরিত পুষ্ট অধরে চাপা হাসি খেলে গেল। উক্তিটা ওর নিজের কাছেও কিছুটা সত্যি মনে হল। মুখখানা গোলগাল ভরাট, ভুরুটা ঠিক মেয়েদের মত সূক্ষ্ম, সরু নয়—মোটা চওড়া আর ঘন। ডাগর ত্বটি চোখ,

(মেয়েরা বলত ভাবলেশহীন) নাকটাও ভারী, ঠোঁট দুটিও একটু স্ফুরিত। হ্যাঁ, মোটা গোটা বইকি সে। কাপড়টা গুছোতে গুছোতে আর একবার হাসল আলীমা। "এ্যাকসেন—চুয়েটেড্ আর্ট"। মুনিরের ভাষায় ও হল নারীত্বের "এ্যাকসেনচুয়েশন", কোন 'ইম্প্রেশনিষ্ট পেইণ্টারের' আঁকা একখানা ছবির মত। আশ্চর্য। কি করে যে ওরা এত বিশ্লেষণ করে!

অদ্ভুত ছেলে এই আজমল। নক্ করেছে সেই চার পাঁচ মিনিট হতে চলল, আর সাড়া শব্দটি নেই। অথচ ও চলে যায় নি, দরজার ও পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, একথা অলীমা ঠিক জানে। ও কি ভাবে যে ওর হাতের ঐ অত মৃদু টোকা শোনার জন্য আলীমা এতই উৎকর্ণ ছিল যে আর সাড়া শব্দ দেবার প্রয়োজন নেই? না হয় আলীমা ওকে একটু বেশীই দাক্ষিণ্য দেখিয়েছে। তাই বলে—। অবশ্য প্রথম বার টোকার শব্দ পেতেই সে উঠে বসেছে, হয়ত বা সত্যিই সে উৎকর্ণ ছিলও। কিন্তু ভাবটা আজমলকে এই মুহূর্তে জানতে দিতে ও মোটেই রাজী নয়। তাই দরজা না খুলেই এই অপেক্ষা।

দুপুরে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়েছে। বিকেলে একলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে অকারণে মনটা গুমোট হয়ে উঠছিল তার। বিশেষ করে কাউকে মনে না পড়লেও কেমন যেন বিষণ্নতার আমেজ লেগেছিল মেঘলা বিকেলের নিঃসঙ্গ অবসরে। বালিশ বুকে চেপে মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাতে গিয়ে গল্পে মন বসে নি। হঠাৎ করে বার দুই যেন ভেসে উঠেছে আজমলের বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ মুখখানা ওর মানসপটে। সে কি আজমলের প্রতীক্ষা করেছে?

খোঁপাটা হাতে করে জড়াতে জড়াতে ইচ্ছে করেই পায়ে শব্দ তুলে আলীমা ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করল। উদ্দেশ্য, আজমল বুঝুক ওর প্রথম বারের টোকা আলীমা শুনতেই পায়নি। খট্ করে রেডিওটা খুলে ডায়াল করতে শুরু করে অকারণ। আরো মিনিট খানেক।

এবার আবার দুটো নক্। তেমনি মৃদু এবং ধীর।

রেডিও বন্ধ করে দরজার দিকে এগুলো আলীমা। আজমলের কি কখনও রাগ হয় না, ওকি কখনও ধৈর্য হারাতে জানে না?

খুট করে দরজাটা খুলে মার্জিতভাবে এক পাশে সরে দাঁড়ায় আলীমা, ততোধিক মার্জিত ভাবে ঢোকে আজমল।

: ওহ্ আপনি? আসুন।

একরাশ বিস্ময় আলীমার মুখে।

: হ্যাঁ, কেন? জানতেন না আমি আসব?

ওর প্রশ্ন খুব সোজা আর সহজ।

আজ মঙ্গলবার। এ দিনে আজমল প্রত্যেক সপ্তাহেই এখানে আসে। আলীমার জানবারই কথা। কিন্তু অপ্রস্তুত হবার মেয়ে সে নয়।

: বাহ্, জানব কি করে? বলে ত যাননি—আজ আসবেন।

এবার আজমল অপ্রস্তুত।

বলাটা রোজই উহ্য থাকে। কিন্তু দুজনেই জানে এদিন ওদের দেখা হবেই। অপ্রস্তুত আজমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পকেটে হাত ঢোকায় সিগারেটের সন্ধানে।

: দাঁড়িয়েই থাকবেন নাকি? বসুন…।

দুজনে এসে বসে অতি মার্জিত রুচির ছাপ-মারা ড্রয়িং-রুমের সুন্দর সোফায়। অন্য কেউ হলে এতক্ষণ ড্রইং-রুমের কোণায় নতুন পদ্ধতির ফুলসজ্জার, দেয়ালের নতুন পেন্টিংএর, আলীমার অপূর্ব রুচির অনর্গল প্রশস্তি গাইতে গাইতে ঢুকত। কিন্তু আজমলের কথা আলাদা। তখুনি আর কথা বলে না সে। সিগারেটে আগুন দিয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দেয় ওর দৃষ্টি, ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ, এক দেয়াল থেকে আর এক দেয়াল, আলীমার পায়ের স্লিপার থেকে নিয়ে ওর গলার সরু চেন আর সুন্দর পেণ্ডেন্টটা পর্যন্ত। আলীমা ওকে কথা শুরু করার জন্য আরো সময় দেয়। তাড়া নেই তার, অথচ আজমলের আছে নতুন বয়সের লজ্জা আর সঙ্কোচ। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অহেতুক 'ব্লাশ' করাটা নাকি রুচির বিরুদ্ধ, চাষাড়ে। কথাটা ও নিজেও বিশ্বাস করে বটে, তবে বলেছিল আলীমাই। চাষাড়েপনাটা লুকোনোর জন্যেই বুঝি কথা শুরু করতে সময় নেয় আজমল। কিন্তু ওর চেহারা দেখলে সেটা আলীমাও টের পায় না। কেমন একটা অতি গম্ভীর, চিন্তিত আর 'সিনিক্' অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে নিজেকে যেন অহেতুক ভার ভারিক্কি দেখাতে চায় সে। বসে বসে সিগারেটে টান দেয়, মাথা ঝাঁকিয়ে মাঝে মাঝে মুখ তুলে চায় ইতস্ততঃ।

আলীমা হেঁটে বেড়ায়। চা চড়িয়ে আসে এক ফাঁকে উঠে। তারপর এসে বসে আজমলের সামনের সোফাটায়। আজমল মুখ তোলে। চোখা-চোখি হতেই হেসে ফেলে আলীমা, আজমলও হাসে। কাঁচের সৌখিন মস্ত এ্যাশট্রেটায় সিগারেটের ছাই ঝাড়ে ঠুকে ঠুকে। এরপর কথা। আলীমাই শুরু করে।

: কি এত ভাবছেন ?

: কই না, কিছু না।

: দেখে মনে হচ্ছে।

: তাই না কি ?

: সত্যি। মনে হচ্ছে আপনার যেন অনেক কথা বলার আছে, অথচ কিছুই আপনি বলতে পারছেন না।

অপাঙ্গে চকিতে একবার আজমল তাকায় আলীমার দিকে। শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ছাইদানীটায় গুঁজে দিয়ে দু'হাত ঘসে তাকায় দু'পায়ের মাঝখানের কার্পেটের সবুজ পাতা লাল ফুলগুলোর দিকে।

: জীবনের কষ্টই ত ওই। সব কথা যদি বলা যেত···সব···

আজমলের মুখে প্রকৃত চিন্তার রেখা। আলীমার চেহারায় সহানুভূতি।

: সব বলা যায় না, কিন্তু কিছু ত বলুন।

: হ্যাঁ কিছু ত বলি। রোজই বলি।

: যেমন –

: আপনি কেমন আছেন, আমি ভাল আছি।

খুব শুকনো একটু হেসে মুখ নিচু করে আজমল। হেসে উঠতে গিয়েও কেন যেন নিজেকে সামলে নেয় আলীমা। তার ডাগর চোখে গভীর দৃষ্টি। আজমলের মনে হয় আলীমার দৃষ্টির সামনে ও এক টুকরো কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আর কিছু না বলেও ওর যন্ত্রণা অনেকখানি বুঝে নিচ্ছে – আলীমা। মন জানাজানির সেই দুর্লভ ক্ষণ কি এই ? মেঘে মাতাল আকাশটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবলো।

আজমলের ওই কথার পর আর কি বলা যায় তাই ভেবে উঠতে পারে নি আলীমা, তাই ও চুপ। ওর মনে হচ্ছে আজমলের বড্ড সাহস বেড়েছে। ওকে আর কতটুকু প্রশ্রয় দেওয়া উচিত, সেটুকু খতিয়ে উঠতে পারছে না সে। অথচ একটা দুর্বার অনুভূতি অকারণ ওকে বেহিসেবী ভাবে সাহসী করে তুলতে চাচ্ছে যেন। কোনদিন কি আজমল তার ভদ্রতা, ভব্যতা, সঙ্কোচের চাদর সরিয়ে তার কাছাকাছি আসতে পারবে না ? আজকের এই মন-কেমন-করা বাদলা সন্ধ্যায়ও না ? আলীমা কথা বলতে পারছে না। তাই এই মুহূর্তে ওর দু'চোখে শুধু সেই প্রশ্ন।

আজমল এখন নিজের মধ্যে ডুবে গেছে, তাই ও কথা বলে, অনেক কথা, আর শঙ্কাহীন হয় ওর অন্তর।

: জানেন, আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয়?

: কি?

: আমার যেন পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

: কেন? পাগলদের ত শুনেছি অনেক কষ্ট।

: হ্যা, কিন্তু আমাদের চেয়ে বেশী। কি? ওরা যখন মন চায় কাঁদে, হাসে যত খুশী, কথা বলে যা ইচ্ছে। সত্যি, আপনি কখনও চিৎকার করে কেঁদেছেন?

: আশ্চর্য! বড় হলে কেউ চিৎকার করে কাঁদে? ছি।

ওর ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেলে আলীমা। যত সব উদ্ভট ভাবনা ওর। বাতাসটা যেন কেমন ভারী হযে উঠেছে ঘরের, আর আজমল কি ভীষণ অস্বাভাবিক। আলীমার কেমন একটা অকারণ ভয় হয়। আজমল কথা বলতে গেলে অমন হয়ে যায কেন? যেন কথার মোড ফেরানোর জন্যেই তরল স্বরে বলে ফেলে কথাগুলো আলীমা, কিন্তু বলেই কেমন যেন বেসুরো শোনায় নিজের কানেই। আজমল সোজা তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে, রুক্ষ আর রূঢ় সেই দৃষ্টি।

: কাঁদেন না। কিন্তু ইচ্ছে হয় না? বলুন, আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

: কি জানি, আমার হয় না। বড হলে মনটাও বড হয়। ছেলেবেলায় পুতুল ভাঙ্গার শোক সহ্য হয় নি। চেঁচিয়ে কেঁদেছি! তাই বলে কি—ওর কথা শেষ করতে দেয় না আজমল। তিক্ততা ছড়িয়ে দিযে বলে—

: হ্যাঁ, বড হলে ঘর ভাঙ্গার শোক, বুক ভাঙ্গার শোকও আমরা বুকে পুষে রাখতে পারি। টুঁটি টিপে আছে রুচিবোধ। আমরা যে ভদ্র।

বলতে বলতে উঠে জানালায় গিযে দাঁড়ায় আজমল।

খোঁচাটা কি আলীমাকেই দিল সে, না নিজের মনকেই ভৎ´সনা করল, বুঝতে পারে না আলীমা। চাযের অছিলায় উঠে যেতে ইচ্ছে হয় সেই মুহূর্তে। আজমলকে সত্যিই কেন যেন ভয় হয়। ওকে উস্কে দেবার, বেহিসেবি করে তুলবার, প্রশ্রয় দেবার, যে সুপ্ত বাসনা তার মনের মধ্যে একটু আগেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তার সত্যিকারের চেহারাটা যেন চিনতে

পারে না। সত্যি কি চায় সে আজমলের কাছে? পেছন থেকে আজমলের সুদীর্ঘ, সুঠাম, ঋজু শরীরটার দিকে অকারণে একবার তাকায় আলীমা। বলিষ্ঠ বাহু দুটি সামনে বিস্তার করে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও। ঘাড়ের ওপর নেমে এসেছে বহুদিন না-কাটা ঝাঁকড়া চুলের স্তবক। কত বয়স হবে ওর? চব্বিশের বেশী নয় কিছুতেই। আলীমার চেয়ে কম করেও বছর চারেকের ছোট। কিন্তু তবু ওকে কেন মাঝে মাঝে ভয় পায় আলীমা নিজেও যেন বুঝতে পারে না। এখুনি যদি কাছে এসে ও দু'কাঁধে হাত রেখে চিবুক তুলে ধরে চোখে চোখ রাখে আলীমার, তাহ'লে সেই মুহূর্তে ওর দুই তীব্র দৃষ্টির মোকাবেলা কিছুতেই করতে পারবে না সে। আর সেই দুর্বল মুহূর্তের বুঝি যে কোন সুযোগ নিতে পাবে আজমল।

একটা গোপন শঙ্কায় শিউরে ওঠে আলীমা। বিদ্যুৎ চমকের মত একটি ছোট্ট মুহূর্তে টের পায় – সে কী চায় ঐ দীর্ঘদেহী সুন্দর যুবকটির কাছে। আর তাই বুঝি কণ্টকিত হয়ে ওঠে সে।

কর্ণমূল পর্যন্ত লাল আর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তার এবং তা অনুভব করেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আলীমা। এ মুখ নিয়ে কিছুতেই আজমলের সামনে দাঁড়াতে পারবে না সে। তার সামনে পুরুষরাই 'ব্ল'শ' করেছে অঢেল এবং তা দেখে অস্বাভাবিক একটা ক্ষমতার আনন্দে গর্বিত হয়েছে আলীমা। আজ নিজেকে আজমলের সামনে এমন করে নগ্ন করে তুলতে পারবে না সে কিছুতেই।

স্লিপারের শব্দ পেতেই হঠাৎ ফিরে দাড়ালো আজমল।

: আলীমা প্লিজ। যেও না বোস। কথা আছে তোমার সঙ্গে।

ভীষণ ভাবে চমকে উঠে ফিরে দাঁড়ালো আলীমা! আশ্চর্য হয়ে গেল আজমলের সাহসে। তার নাম ধরে, তুমি সম্বোধন করে এর আগে কোনদিন ডাকে নি সে। ভীষণভাবে রেগে উঠতে চেয়েও, আশ্চর্য, আলীমা অনুভব করল-তার দেহ মনে যেন সূক্ষ্ম আনন্দের পরাগরেণু ছড়িয়ে পড়ছে। নিজের সঙ্গে ভীষণ একটা বোঝাপড়ার স্পৃহা নিয়ে সে ভাবতে চাইল – 'ঢের হয়েছে। ওকে আর এগুতে দেওয়াটা মোটেই উচিত হবে না। একটু ধমকে দেওয়া দরকার।

কিন্তু মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতেই ওর কথা আটকে গেল। একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিতে তীক্ষ্ণ আর ধারাল হয়ে উঠেছে আজমলের অভিব্যক্তি।

নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রাখার প্রবল চেষ্টায় কঠিন হয়ে উঠেছে ওর মুখের রেখা। দাঁতে দাঁত চেপে থাকার দরুণ উঁচু হয়ে রয়েছে চোয়ালের হাড়টা।

একটি নিস্পন্দ মুহূর্ত পার করে আজমল হঠাৎ ওর কাছে এসে হাত ধরে টেনে ডিভানে বসিয়ে দিল আলীমাকে।

: তোমাদের সংজ্ঞায় আমি কিন্তু 'সিভিলাইজ্‌ড' নই আলীমা! আমি ভীষণ আদিম, অভদ্র, অসভ্য, জানোয়ার। যা ইচ্ছা বলতে পারো। আমি চিৎকার করে কাঁদি, আনন্দে নাচি উন্মাদের মত, ভালবাসতে ইচ্ছে হলে ভালবাসি। আমি—আমি নিজেকে মুখোশ পরিয়ে রাখতে পারি নে। এ কথাটা কি তুমি কিছুতেই বুঝতে পারো নি আলীমা?

বড্ড কাছে ঘন হয়ে বসে পড়েছে আজমল। ওর বড বড উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আলীমাকে স্পর্শ করছে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল আলীমা। কোন জবাব দিতে পারল না। মনে হ'ল—বরং ঠিক তার উল্টোটাই সে এতদিন ভেবে এসেছে আজমল সম্পর্কে—অতি মার্জিত, অতি ভদ্র, অতি পোষাকী। কী আশ্চর্য মানুষের চরিত্র।

: চুপ করে থেকো না আলীমা, জবাব দাও।

: কী জবাব দেব?

যেন শব্দ করে চিন্তা করল আলীমা। প্রশ্ন করল নিজেকেই।

: যা তোমার মন চায় আলীমা তুমি তাই জবাব দাও। ভদ্রতার জবাব আমি চাই না। তোমার মুক্ত মনের জবাব চাই।

: কিন্তু তুমি নিজেও ত মুক্ত নও আজমল।

: কেন?

: তুমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারো নি। তোমার শক্তি ফুরিয়েছে বলেই তুমি নিজেকে প্রকাশ করেছ—প্রকাশ করতে চাও বলে প্রকাশ কর নি। তুমি চাও—তাই তুমি মুক্ত নও, তুমি পার না—তাই তুমি মুক্তির শিরোনামায় পরাজয় স্বীকার কর। বল, সত্যি না?

এবারও যেন কথা বলে বলে নিজের ভাবনাকে মুক্তি দিল আলীমা, আর দেখল, হঠাৎ যেন আজমল তার দৃঢ়তা হারিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। নিজের মনের নগ্নতার প্রকাশে যেন কুন্ঠিত হল। ওকে দেখে সেই মুহূর্তে হঠাৎ ছোট্ট একটা কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করে উঠল আলীমার অন্তরে।

একটা তীব্র অনুভূতির শর বিদ্ধ হয়ে সে ছটফট করল। অসহায় বোধ করল সে। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও বাঁ হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল আজমলের হাত।

: আমরা সকলেই এমন মাঝে মাঝে হার মানি, আজমল।

আজমল মুখ তুলে তার গভীর দৃষ্টি রাখল আলীমার চোখের তারায়। আহত স্পর্ধাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে তিক্ত গলায় বলল—

: তুমি চাও, তাই হার মানো। আর আমি পারি না, তাই হার মানি। ঠিকই বলেছ তুমি আলীমা। একথাটা আমি নিজেও বুঝতে পারি নি আগে। সত্যিকারের মুক্তি তোমার আছে আলীমা, আর আমি আমার অনুভূতির শিকার, অসহায় ক্রীড়নক। আমার এ দুর্বলতা জানতে পেরেও কি আমাকে তুমি প্রশ্রয় দিতে পারো আলীমা?

আলীমা চুপ করে রইল।

হার মানার জন্য সর্বান্তঃকরণে উন্মুখ হয়ে থাকা সত্ত্বেও যে নিজেকে প্রকাশের ক্ষমতা নেই আলীমার, একথা কি আজমল বিশ্বাস করবে। সংস্কার সুরুচির দাবী, শিষ্টাচার, আর জীবনের আর অভিজ্ঞতা তাকে কি ভীষণ বিবেচক করে তুলেছে দিনের পর দিন—সে কথা কি বুঝতে পারবে আজমল? সেই প্রথম বসন্তের সোনালী দিনগুলোয় সে নিজেও আজমলের মতই অনুভূতির শিকার, অসহায় ক্রীড়নক ছিল, অপূর্ব আবেশ আর আনন্দ ছিল সেই স্বতঃস্ফূর্ত হারমানা মুক্তির ক্ষণগুলোতে। কিন্তু জীবন মনের সেই মুক্তিকে বিন্দু বিন্দু ঝরিয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে—সে কথা আজমল জানবে কি করে? চৌদ্দ বছর ধরে ধীরে ধীরে কখন কোন মুহূর্তে তার মনটা পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে গেছে, যেন আজমলের প্রশ্নে আজই প্রথম টের পেয়েছে আলীমা। কিন্তু ওর সেই পঙ্গু মন নিয়ে আজ আর সে কিছুতেই ওর মত উচ্ছল হয়ে উঠতে পারে না—এ উপলব্ধি ওকে যেন বেদনায় বিবর্ণ করে দিচ্ছে। লেখাপড়া শিখিয়ে, প্রতিষ্ঠিত করে, জাগতিক সুখ-সুবিধে দিয়ে পরিপূর্ণ করে, ভালবাসার প্রহসন করে, শব্বির তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে—অভ্যাস আর কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। সেই অভ্যাস আর কৃতজ্ঞতার জালে সে এক ভগ্ন-পক্ষ পতঙ্গ। এখন সে চাইলেও অনেক কিছুই করতে পারে না—এ অক্ষমতাকে কি করে উলঙ্গ করে ধরবে আজমলের সামনে?

জবাব না পেয়ে উঠে সতরঞ্চি পাতা মেঝেতে পায়চারি করতে শুরু করে আজমল। তার ভেতরের উত্তেজনা আর ঝড় তার চলায় ফুটে ওঠে। অস্থির

কম্পিত হাত দুটো পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে কথা বলতে থাকে সে।

: তোমাকে অনেক দিন থেকে বলব বলব করেও বলতে পারি নি আলীমা। গত মঙ্গলবারে যখন তোমার কাছে অকপটে রেণুর কথা বললাম, আর তুমি সমবেদনায় মূর্ত হয়ে উঠলে, তখনই একবার ইচ্ছে হয়েছিল—তোমার দু'টি হাত ধরে বলি—রেণু আমার অন্তরে যে ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে, স্নেহ ভালবাসার প্রলেপে একমাত্র তুমিই তাকে সারিয়ে তুলতে পারো। রেণুর জন্যে আমার মনে একদিন যে ভালবাসার আগুন জ্বলে উঠেছিল তা জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আহত অন্তরে ছাই চাপা হয়ে জ্বলছে এখনও। তোমার সহানুভূতির বাতাস পেয়ে আবার সে প্রজ্বলিত শিখায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু বলতে পারি নি আলীমা। তুমি যেন ধরা দিয়েও কোন মুহূর্তে অনেক দূরে সরে গেছ তোমার সৌখিন ভব্যতা আর পোষাকী ব্যবহারের আড়ালে। কিন্তু আজ আমি সত্যিই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি নি। আমি জানি আলীমা, তুমি শব্বির সাহেবকে ভালবাসো না।

শিউরে উঠে ওর দিকে তাকাল আলীমা।

অন্যের মুখে নিজের মনের চিন্তার উলঙ্গ প্রকাশ শুনে ও যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। শব্বিরকে সে ভালবাসে না, ভালবাসতে পারে না, একথা সে নিজে যেমন অনুভব করে তেমনি জানে শব্বির নিজেও। তবু সেই চরম সত্য কথাটা স্পষ্টভাবে শুনে এমন অত্যাশ্চর্য ভয়ানক মনে হল কেন তার? একটা গোপন ব্যাধির প্রকাশে যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে। ইচ্ছে হল উঠে মুখে হাত চাপা দিয়ে আজমলের কথা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু শরীরটা যেন স্থাণু হয়ে গেছে। ডিভানে কাত হয়ে থেকে ও শুধু নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইল আজমলের দিকে।

: শব্বির সাহেব দেখতে সুন্দর নন, এ জন্যে তাঁর সঙ্গে বিয়েতেই মত ছিল না তোমার, বাপ মার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে বিয়ে করেছিলে—এসব কথা আমি এর ওর মুখে শুনেছি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—বিয়ের চৌদ্দ বছর পরেও তুমি মা হতে পারো নি। এর জন্যেও কি শব্বির সাহেবই দায়ী নন? মুনিরের তাই ধারণা। মুনিরের কেন, আমারও তাই ধারণা।

ঠিক এই ভয়ই বুঝি করছিল আলীমা, ওকে যেন একটি একটি বসন উন্মোচন করে ধীরে ধীরে নগ্ন করে দিচ্ছে আজমল। এ নগ্নতার কঠিন লজ্জা তার অসহ হয়ে উঠছে। প্রথমে সে ভয়ে পাণ্ডুর, তার পর রূঢ়, রুক্ষ হয়ে উঠল। ডিভান

থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

: এ সব কথা তোলার সাহস তোমায় কে দিয়েছে ?

আজমলও ঘুরে দাঁড়ালো ওর মুখোমুখি। সেই তীব্র দৃষ্টি-বাণে ওকে দুর্বল করে দিতে দিতে নিজের সবল সুঠাম তরুণ বাহু রাখল আলীমার কাঁধে। বলল—

: সাহস দিয়েছে আমার ভালবাসা। সাহস দিয়েছে আমার পরাজিত মনের মুক্তি। তোমার ক্ষমতা থাকলে তুমি কেড়ে নাও আমার সাহস। তাড়িয়ে দাও, আমাকে। কিন্তু চুপ করে থেকো না।

হ্যাঁ তাড়িয়েই দেবে আজমলকে আলীমা। আর এক দণ্ডও তাকে সে সহ্য করবে না। ওর সাহস কেড়ে নিয়ে ওকে বাতাস ছাড়া বেলুনের মত চুপ্‌সে দেবে সে। কিন্তু কেন মুখে কথা যোগাচ্ছে না ? বরং কি যেন একটা ঠেলে উঠে কণ্ঠনালীতে চাপ দিচ্ছে, আর বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠতে চাইছে তার দু'চোখ।

: আমি জানি আলীমা, তোমার চাটুকার অনেক, স্তাবকের অভাব তোমার নেই। কিন্তু সেই স্তাবকদের দলে আমি ঠাঁই চাই নে। তাদের একজন হয়ে, তোমার হাতের এক পেয়ালা ধূমায়িত চা, কিছু সূক্ষ্ম রুচিশীল আলোচনা, বন্ধুত্বপূর্ণ একটি নিটোল সন্ধ্যার লোভে আমি তোমার কাছে দৌড়ে আসি না। শব্বির সাহেবের সঙ্গে তোমার বিবাহিত জীবনের তিক্ত ফাঁকটুকু আনন্দঘন সন্ধ্যার মোহ দিয়ে ভরিয়ে তোলার মত উদারতা আমার নেই। আমি ফিলানথ্রপিষ্ট নই আলীমা, ভীষণভাবে স্বার্থপর। আমার এখানে দৌড়ে আসার আকর্ষণ স্বতস্ফূর্ত। নারীর জন্যে পুরুষের আদিম কামনা। আমি তোমাকে ভালবাসি আলীমা। শব্বির সাহেবকে তুমি চাও না, ভালবাস না। তবু কেন তুমি তাকে আঁকড়ে থেকে জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিতে চাও ? চল আলীমা, আমরা দু'জনে কোথাও চলে যাই। নতুন করে সংসার পাতি। তোমার আমার সংসার, আমাদের দুজনের ভালবাসার সন্তান· —

আর বুঝি প্রলোভনকে উপেক্ষা করতে পারে না আলীমা। দুই তীব্র দৃষ্টি দিয়ে আজমল কি তাকে সম্মোহিত করছে ? আজমলের প্রশস্ত সুঠাম বুকে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে কেন আলীমার ? তাদের দুজনের সংসার, সন্তান। একী স্বপ্ন-নীল হয়ে উঠছে তার চোখে ? তার মনও কি হারিয়ে যাবে এই ক্ষণে ?

হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতার মত ছিট্‌কে দূরে সরে যায় আলীমা। অহেতুক জোরে চিৎকার করে ওঠে যেন নিজের অনুভূতিকে অস্বীকার করতেই।

: তা হয় না, তা হয় না আজমল।

: কেন হয় না, কিসের বাধা ?

: বাধা শব্বির, আমার স্বামী।

: তাকে তুমি ভালবাস না। আর আমাকে তুমি ভালবাস। আমার চোখের দিকে চেয়ে বল—তুমি আমায় ভালবাস না ? অস্বীকার করতে পার ? তোমার চোখ বলছে তুমি আমাকে চাও। তোমার অশ্রু বলছে তুমি আমার হতে চাও…

দু'হাতে গণ্ডের উপর গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দু মুছে নিয়ে আলীমা ধারালো চিৎকারে থামিয়ে দিল আজমলকে।

: না, না, আজমল, না। আমি তোমায় ভালবাসি না তুমি চলে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ওর কঠিন চিৎকারে যেন প্রকৃতিস্থ হল আজমল। দ্বিধাময় দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। ফ্যাকাশে শুকনো ঠোঁট দু'টো দাঁতে কামড়ে ভাবলেশহীন চোখ দুটো তুলে ধরল আলীমার মুখের দিকে।

: এই তুমি চাও আলীমা ?

: হ্যাঁ, হাঁ। এই আমি চাই। এই মুহূর্তে চলে যাও তুমি, আর এক দণ্ডও দাঁড়িয়ে থেকো না।

পর মুহূর্তের জন্যে নিজেকেও যেন বিশ্বাস নেই আলীমার। চোখ বন্ধ করে ডান হাতের তর্জনী তুলে দরজার দিকে নির্দেশ দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। চোখ খুলে তাকাতেও বুঝি ভয়।

: বেশ, তাই যাচ্ছি।

অমোঘনিয়তির মত অনিবার্য কথাক'টি উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল আজমল। চোখ বন্ধ করে থেকেও অনুভব করে আলীমা—ঘরের ভেতর উত্তাপ যেন কি এক অলৌকিক উপায়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কবরের মত তুহিন শীতলতা ঘিরে ধরছে চারদিক থেকে। আজমলের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, আরো দূরে। আজমল চলে যাচ্ছে। আর কখনও আসবে না, কাছে বসবে না, তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি-বাণে দুর্বল করবে না ওকে—এ কেমন করে

সহ্য করবে আলীমা ?

কিছুতেই যেন তা সম্ভব মনে হয় না তার এবং তার সেই ভাবনা সেই মুহূর্তে যেন একটি আর্ত চিৎকারে বাঙ্ময় হয়।

: আজমল যেও না, ফিরে এসো। তোমাকে না পেলে আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে।

কিন্তু আজমল তখন বহু দূরে চলে গেছে। শূন্য ঘরে ওর নিজেরই কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে।

খোলা দরজাটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে আলীমা। তারপর হঠাৎ টিপয়ের ওপর রাখা কাঁচের এ্যাশ্‌ট্রেটা উঠিয়ে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে।

জয়-জয়ন্তী

রাজিয়া খান

মঞ্চের ওপর ছড়ানো ময়ূর-নীল আঁচল, কপালে সোনালী টিপটা জ্বলজ্বল করছে। এ নীলাকে চিনতে কষ্ট হয়। চোখ ঝলসে যায়। তার কণ্ঠ-নিঃসৃত সুরে সমস্ত জগত নেশায় বুঁদ। কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। অসীম একাগ্রতায় শ্রোতৃবৃন্দ একাত্ম গায়িকার সঙ্গে। প্রচণ্ড নৈঃশব্দে নৈবেদ্য দিয়ে সুরের সূক্ষ্ম কাজগুলো তারা নীরবে আপ্যায়ন করছে। কী অসম্ভব সৌভাগ্য-বতী শিল্পী। কি প্রগাঢ় আত্মিক সম্বন্ধ শ্রোতার সঙ্গে।

পরিশুদ্ধ উচ্চারণ, গ্রীবার অনবদ্য ভঙ্গিমাটি, হাতের নীল পাথরের আংটি থেকে নীলাভ আলোর বিকিরণ—সবকিছু মিলিয়ে নীলা অতীব আকর্ষণীয়। এই আনন্দময়তার মধ্যে কেবল আমানের গলার মধ্যে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা—কান্নার ঢেউগুলো গিলে খেতে হচ্ছিল বলে। তিনশো টাকার আরামদায়ক সীটে বসেও সে ঘামছে। অথচ তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একবারও কি ঐ নিবেদিত-প্রাণ সঙ্গীতার দৃষ্টি তার ওপর পড়েছে; কে জানে।

পাঁচ বছর আগে কি আমান স্বপ্নেও ভেবেছিল প্রেক্ষাগৃহে বসে নির্নিমেষে নীলার মুখের দিকে এভাবে চেয়ে থাকতে হবে। আর একটু পরেই আসবে সঙ্গীতা। আঁচল গুটিয়ে ইন্দ্রাণীর দৃপ্ত ভঙ্গীতে নীলা হেঁটে চলে যাবে। উঠবে নিজের গাড়িতে। তারপর তার পথ আমানের পথ থেকে ভিন্ন। চোখ দুটো মুদে আসে আমানের। সে দাতে দাঁত চেপে প্রার্থনা করে: ও যেন এক্ষুণি চলে না যায়। আরেকটু-আরেকটু চেয়ে থাকি। প্রাণভরে দেখা হয় নি আমার। আমানের প্রার্থনা পূর্ণ হল। শ্রোতাদের তুমুল করতালি আর 'এনকোর' ধ্বনিতে মিষ্টি করে হাসল নীলা। স্বরলিপির পাতা ওলটাল। তারপর কোলের ওপর এস্রাজটাকে শক্ত করে চেপে ধরে আবার শুরু করল তার অনবদ্য সঙ্গীত। চমকে উঠল আমান।

নীলা গাইছে জয়-জয়ন্তীর সুরে। কথাগুলি হিন্দী। শাশুড়ি-ননদের যাতনায় প্রিয়তমের কাছে যেতে অপারগ বিরহিনীর পুঞ্জীভূত ব্যথা ঝরে ঝরে পড়েছে সুরে। বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে উঠল আমানের। এই গান-টাই তো ও গাইছিল সেদিন। চোখ বুঁজে নীলার সেই ভীষণ আহত মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল আমান। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বিয়ের পরের সেই মত্ত দিনগুলি—কী অসম্ভব প্রাপ্তির আনন্দে ভরপুর হয়েও হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করল নীলার অপ্রসন্ন মুখ। রাগ করে বলল : কি হ'ল। আমাদের পছন্দ হচ্ছে না ?

: বড় শব্দ। আমি একটু একা হতে চাই। রেয়াজ করব।

: বিয়ে হয়েছে মোটে পনের দিন—এর মধ্যেই··· ?

কেমন ব্যথিত চোখে চাইল নীলা। আমান জানত গান নীলার নেশা—এমন সাধনার দৃষ্টান্ত বিরল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এ নেশা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে এ আশঙ্কা সে করেনি। বিয়ে উপলক্ষে কয়েকদিন যে অনিয়ম আর হৈ-চৈ হয়েছে তাতে নীলা গাইতে পারেনি—গলা সাধা তো দূরের কথা। তাছাড়া কালামদের বাড়িতে এতটুকু নির্জনতা-একটুখানি সঙ্গীতচর্চার অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পাওয়া দায়। আমানের তিনজন বিবাহিত বোনের স্বামী-সংসার এখানেই। বড় ভায়ের পাঁচ ছেলেমেয়ে। চাচারা তিনজন, স্ত্রী-পুত্রসহ তাদের সংখ্যাই পনেরো। ভৃত্য, আশ্রিত মিলে আরো দশজন। প্রত্যেক বছর বাড়ির পরিবর্ধন হচ্ছে। একতলা ইমারত এখন এসে ঠেকেছে ত্রিতলে—তবু স্থান-সংকুলান হওয়া দায়। এরই মধ্যে প্রচণ্ড হৈ-চৈ করে কাটায় সবাই। কথালাপে, চিৎকারে বাড়ি সরগরম। এই সশব্দ, সানন্দ পরিবেশকেই শৈশব থেকে ভালবেসে এসেছে আমান। এ বাড়ীতে এই ভিন্ন মেজাজের মেয়েটিকে বড় বেমানান লাগতে লাগল।

ঘরে ভিড় হলেই সে ছাদে গিয়ে বসে থাকে। গেঁয়ো ভৃত্যের দল সে গান গাইবার সময় হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে সে অস্বস্তিতে ছটফট করে। নীলা চায় ছিমছাম, নিরিবিলি পরিবেশ। সে বিশ্বাস করে বেশী বাচাল হলে, স্বভাবে তারল্য এসে গেলে, ভাব-গম্ভীর-রাগ-রাগিনীগুলো কাছে ঘেঁষতে চাইবে না। ইমন, পুরিয়া ধানেশ্রী, বাগেশ্রীর মত ক্রন্দসী রাগিনী অভিমানে দূরে সরে থাকবে। তাই প্রত্যুষে সস্নাত নীলা নিজের হাতে তোলা কিছু বেলফুল এস্রাজের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে গলা সাধতে বসে।

শাশুড়ী ও ননদেরা অব্যক্ত বিরক্তিতে ব্যবধান টেনে দেয় তাদের ও নীলার মাঝে। আর ছুটির দিনে যখন আমানের বাল্যবন্ধুরা, অফিসের সহকর্মীর দল, চাচাতো মামাতো ভাইবোন ভাগ্নে-ভাগ্নীরা স্রোতের মত আসতে থাকে – নীলাকে এস্রাজ নিয়ে রেযাজ করতে দেখে প্রথমে তারা বিস্মিত এবং পরে অসন্তুষ্ট হয়। আর নীলা ভাবে একটা দিনও এরা নিজের মত করে কাটাতে পারে না কেন, ঘর ছেড়ে যদি বেরোতেই হয়, আছে বন-বাদড পার্ক, প্রকৃতির শোভা-আরেক বাড়ি গিযে অবেলায় আজে বাজে নাশতা খেযে, অর্থহীন বাক্যালাপে ঘণ্টা-চারেক অপচয করে এরা যখন নিজের বাড়িতে ফেরে সব কিছু ঠিক থাকে কি ? নাকি নিজেদের বিশৃঙ্খল সময় অপচযের মত তাদের বাড়িঘর, যাবতীয কর্মকাণ্ড অগোছালো হয়ে পড়ে থাকে ?

নীলা চায় মন দিয়ে সকালবেলাটা গলা সাধতে। বিয়ে হওযা পর্যন্ত তাই করেছে সবসময়। বিয়ের আগে সবাই আশ্বাস দিয়েছে আমান অত্যন্ত মার্জিত ও শিক্ষিত, নীলার গানের অকৃত্রিম ভক্ত। তাই গোল বাধার অবকাশ কেউ ছাখে নি। এস্রাজের ওপর নীলার মুখটা আনত ছিল, চোখ তুলে আমানের বাড়ির লোকের অসন্তুষ্টির ছবি নীলা দেখতে পেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরো নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরল তার এস্রাজ। শিশিরসিক্ত বেলফুলগুলো অশ্রুসিক্ত হ'ল।

মাসখানেকের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ির এই যুগপৎ অসন্তুষ্টি এক প্রলযঙ্কর রূপ ধারণ করল। আমানের মোটা বেতনের চাকরি, শ্বশুর বাড়ির মান, এসবের চাইতে সঙ্গীত যে নীলার অনেক বেশী প্রিয এটা বুঝতে কারো বিলম্ব হ'লনা। ভোরে উঠে নীলার ঐ বেপরোযা গলা সাধায আমান নিজেও বিরক্ত হযেছে কয়েকবার। নতুন বউ নিযে মানুষের কত রকমের সাধ আহ্লাদ থাকে – এই সঙ্গীত সাধনার যন্ত্রণায় সব মাটি। নিজের পাশে সে চেযেছিল এমন একজন স্ত্রী যার গ্ল্যামার আছে, আছে কিছুটা চটক। তাই মা-বাবা বেছে আনলেন রেডিও ও টি. ভি. আর্টিস্ট। বিযের আগে একবার হঠাৎ এক আত্মীয়ের বাড়িতে নীলার সঙ্গে দেখা হযে গিয়েছিল, মুগ্ধ হয়েছিল আমান। কথা বলে কম, কিন্তু কী চুল, কী চোখ, কী বঙ্কিম ঠোঁটের রেখাগুলো। বিয়ের দিন তার নিজেকে মনে হয়েছিল রাজাধিরাজ। টি ভি র পর্দায যার রূপের ঝলক, কণ্ঠের মধুময় সঙ্গীত তাকে এতকাল পাগল করেছে সে এখন তার বাহুবন্ধনে। সেই অতি কাম্য বধূ যে বিয়ের পর এমন সুদূরিকা হয়ে ভিন্ন এক জগতে সমর্পিতা হয়ে

রইবেন তা আমান স্বপ্নেও ভাবে নি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমানের সঙ্গে একচোট বচসা হয়ে গেছে নীলার। তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না করে ঘরে বসে গাইছিল নীলা। পরদিন টিভি প্রোগ্রাম। এই জয়জয়ন্তী রাগিনী। আমান ক্রোধে অন্ধ হয়ে এস্রাজটা তুলে নিয়ে আছাড় দিতেই সেটা নিমেষে দু'টুকরো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সেদিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল নীলা। তার পর ধীরে ধীরে নগ্ন পায়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর অনেক সাধাসাধি, পীড়াপীড়ি, ক্ষমা-প্রার্থনা সত্ত্বেও নীলাকে আর ফেরাতে পারে নি আমান। তাকে এড়ানোর জন্যেই যেন নিজের বাবার সাহায্যে ছ'মাস দিল্লীতে কাটাল নীলা।

বাংলাদেশ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তার গানের খ্যাতি। সঙ্গীতে আরো পারদর্শী হল। তার প্রতিষ্ঠার এক একটা কিংবদন্তী কাঁটার মত বিঁধতে লাগল আমানদের বাড়ির সকলের গায়ে। ও নাম তারা ভুলতে পারলে বাঁচে। কিন্তু ভোলার কি উপায় আছে। টেলিভিশন খুললেই নীলা। বেতারেও তথৈবচ। পত্রপত্রিকার পাতা জুড়ে নীলার ছবি। আর সে কী ভুবনমোহিনী রূপ।

দক্ষিণ ভারতীয় পত্রিকায় তাকে তুলনা করা হয়েছে শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে। মার্কিন জার্নালে তাকে বাংলাদেশের ম্যারিয়ান আন্ডারসন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর এদিকে নীলা চলে যাবার পর প্রকৃতির কি আকস্মিক আর বিস্ময়কর অনুকল্পে আমানকে পেয়ে বসেছে ঐ সঙ্গীত—রোগ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ড জমা করা তার বাতিক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ঝোঁক তার আশাবরী আর জয়জয়ন্তী রাগের ওপর। এ দুটো রাগিনীর প্রতি নীলারও ছিল অনলজ্জ পক্ষপাতিত্ব। রেডিও টেলিভিশনে জয়জয়ন্তী পরিবেশিত হলে এখন আমান সব ফেলে একাগ্র হয়ে শুনতে থাকে। ভাই-বোনেরা দূরে গিয়ে মুখ টিপে হাসে।

এরপর কত চিঠিই না আমান লিখেছে নীলাকে। উত্তর পায় নি। ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নীলা অংশ গ্রহণ করবে জেনেও সে নিজেকে সেখানে টেনে নিয়ে যেতে পারে নি প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। তারপর ধীরে ধীরে পাঁচ বছরে ব্যথা ভোঁতা হয়েছে—নীলার জায়গায় এনেছে আরেকজনকে। আজ নতুন সঙ্গিনী আমানের পাশে বসে। রান্না-বান্নায়, আতিথেয়তায়, স্বামী

সোহাগে অদ্বিতীয়া—শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর-ননদের চোখের মণি। তার প্রবল বিতৃষ্ণা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি। আজ আমানের পীড়াপীড়িতে এসেছে বটে কিন্তু মুখখানা ভাদ্রের আকাশের মত আঁধার। তার মন পড়ে আছে শ্বশুরালয়ে—বড় ননদের সঙ্গে সিনেমার প্রোগ্রাম করেছিল—আমানের ধমক খেয়ে দায়ে পড়ে এসেছে এই গানের আসরে।

সিনেমার টিকেট কুটি কুটি করে ছিঁড়ে চীৎকার করে উঠেছিল আমান, ঐ সব যাচ্ছে তাই ছবি না দেখলেই নয়? তোমাব মধ্যে একটু ভাল রুচির পরিচয় পেলাম না।

লাল শিফন আবৃতা অর্ধাঙ্গিনী নীলার প্রতি কয়েকবার বিতৃষ্ণ দৃষ্টি হেনে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। আমান পাত্তা দেয় নি। তার নিজের সমস্ত অন্তরাত্মা, দু'চোখের তারা নীলার মুখের ওপর আবদ্ধ। অবশেষে থেমে গেল সেই মর্মভেদী সুর। নীলা উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে শ্রোতাদের অভিবাদন করল। তারপর বিপুল করতালি। ফোটোগ্রাফারদের অস্থির আনাগোনা, চাঞ্চল্য। আর তখন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল নীলা। এক পলকের জন্য আমানের তপ্ত চোখদুটোর সামনে অগ্নিশলাকার মত ঝলসে উঠল তার ময়ূর-নীল নীলাম্বরীর আঁচল। ঠিক তক্ষুনি আমানের বাহু আকর্ষণ করল উচ্ছল রক্তবসনা। তার হাত ধরে নতুন কেনা মার্সিডিজে বসল আমান। চোখের পাপড়ি, গাল দুটো, শার্টের সামনেটা আর্দ্র। সেখানে ঘাম আর অশ্রুর লবণাক্ত মিশ্রণ। তার আস্বাদে চমকে উঠে ছিটকে দূরে সরে গিয়ে বসল যৌবনোচ্ছল রক্তাম্বরী লীলাসঙ্গিনী।

মাতৃত্ব

তসলিমা নাসরিন

১

আমার বিয়ে হয়েছে সাত বছর। আজও বাচ্চা হয় না। বাচ্চা হয় না কেন এ নিয়ে শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে কম কথা শোনান না। বলেন—কী যে পাপ করেছিলাম, ছেলের জন্য বাঁজা বউ ঘরে এনেছি।—আহা রে সোনার টুকরো ছেলে, বাঁজা বউ নিয়ে সংসার করছে।—বাঁজা বউ ঘরে, লোকের সামনে মুখ দেখানো যায় না।—অন্য কোথাও বিয়ে হলে ঘর ভরে ছেলে হত।

এখন আমার নানা কাজে ওঁরা ভুল ধরেন। আমার রান্না নাকি মুখে দেওয়া যায় না, কাপড় ধুলেও নাকি অত পরিষ্কার হয় না, ঘর গোছাতেও মন নেই আমার, এসব। আমাকে ওঁরা আত্মীয়-স্বজনের বিয়েবাড়িতে নিয়ে যান না, আমি গেলে অমঙ্গল হবে—তাই। সকালে ঘুম ভেঙে আমার মুখ দেখলে শাশুড়ি আঁতকে ওঠেন। ভাবেন কোনও বুঝি দুর্ঘটনা ঘটবে। বাড়িতে যে লোম ওঠা নেড়ি কুকুর থাকে, সেটিও আমার চেয়ে বেশি মর্যাদা পায়। বাড়িতে কুটুম্ব এলে নেড়িটিকেও চোখের সামনে থেকে এত বিদেয় করতে হয় না, যত করতে হয় আমাকে।

এসব দেখে আমার বড় মন খারাপ হয়ে যায়। বাবার বাড়িতে খবর পাঠিয়েছিলাম আমাকে যেন ওঁরা নিয়ে যান। একদিন বাপ ভাই এসে বলে গেলেন—'এটাই তোমার সংসার। এই সংসারেই তোমার বাকি জীবন থাকতে হবে। স্বামী শাশুড়ির পায়ে পড়ে কাঁদো, এই বাড়ির দাসী হয়েও তোমাকে থাকতে হবে। মনে রেখ স্বামীর পায়ের নিচে তোমার বেহেস্ত।'

স্বামীকে অনেক দিন বলেছি—'আমার কি দোষ বল, আমি কি ইচ্ছে করে বাঁজা হয়েছি?

স্বামী গলা ভারী করে 'হুম' বলেন।

ঝাঁড়ফুক, পানি পড়া কম হল না নেওয়া। গলায় কোমরে সারা বছর কালো সুতোয় তাবিজ ঝুলিয়েও দেখি বাচ্চা হয় না। থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ডাক্তার এলেন একদিন। সমস্যা শুনে বললেন—'পরীক্ষা করতে হবে।'

—'পরীক্ষা? পরীক্ষা আবার কী?' স্বামী প্রশ্ন করলেন।

—'স্বামী স্ত্রী দু'জনের পরীক্ষা।'

—'পরীক্ষা করলে বাচ্চা হবে?'

—'হতেও পারে।'

এরপর স্বামীকে বলে কয়ে হাসপাতালে নিই। যদি বাচ্চাকাচ্চা কিছু হয় আমার, যদি বাঁজা হওয়ার যন্ত্রণা কিছু ঘোচে। স্বামী মোটেও যেতে চায় না। বলে—'আমাকে আবার কি পরীক্ষা করবে। পুরুষমানুষের আবার পরীক্ষা কি।'

—'তবু। চলো। একবার অন্তত আমার মুখের দিকে তাকিযে চলো।' এরকম প্রেমে ভেজা কথা বলে নিযে গেলাম তাকে ডাক্তারখানায়। ওখানে আমার মল মূত্র রক্ত নিল। আর স্বামীকেও গোপনে এক ঘরে ডেকে নিয়ে পরীক্ষা করল। স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কি পরীক্ষা করল তোমার। স্বামী কপাল কুঁচকে রাখল। কিছু বলল না।

দশ-পনেরো দিন পর রিপোর্ট দিল। সেই রিপোর্টে কি আছে কে জানে, স্বামী ছিঁড়ে ফেলল সব! বলল-'ফালতু।'

'ফালতু? ডাক্তারের রিপোর্ট ফালতু?' ভযে আমার দম আটকে আসে। 'হ্যাঁ ফালতু। শালারা বলে বাচ্চা হওয়ার ক্ষমতা নাকি আমার নেই? যত্তসব। আমি কি আর খবর রাখি না কার কি অবস্থা কোথায়? আমার বযসের লোকেরা পাঁচ মিনিটেই ফুরিযে যায়, সেখানে আমি টিকে থাকি তিরিশ চল্লিশ মিনিট। আর বলে কিনা আমার নাকি ক্ষমতা নেই।' আমি বুঝে পাই না কি করব আমি। শাশুড়ি তো এবার আর ক্ষমা করবেন না আমাকে। ঠিকই কনে দেখতে বেরোবেন ছেলের। ছেলের যে খুব আপত্তি হবে এতে, তা আমার মনে হয় না। আজকাল স্বামীও রাতে রাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। একদিন নিজে থেকেই সুফিয়ার কথা তুলল। বলল—'সুফিয়ার তিন ছেলে জানো তো? বড় সুখে আছে।'

—'সুফিয়ার সঙ্গে তো তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল, তাই না?

স্বামী হেসে বলল—'হ্যাঁ।' খুশিতে চোখ হাসল স্বামীর। ঠোঁট হাসল।

সুফিয়ার সঙ্গে বিয়ে হলে আমার স্বামীর তিন ছেলে হত, ভেবে আমারও ভাল লাগল। বাড়ির মানুষগুলো অন্তত সুখে স্বস্তিতে দিন কাটাতে পারত। আসলে বাচ্চা কাচ্চা হওয়াটা যে খুব জরুরি তা আমার আগে কখনও এত তীব্র করে মনে হয় নি। স্বামী এবং শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন বাচ্চা হওয়া ছাড়া মেয়েদের জরুরি কোনও কাজ নেই। মাঝে মাঝে নিজের জন্মকে আমার বড় অনর্থক মনে হয়। মনে হয়, যদি বাচ্চা জন্ম দেওয়াই আমার আসল কাজ, বাচ্চা না হলে আমার প্রতি যদি সবার ভালবাসা সব উবেই যায়, তবে কী দরকার বন্ধ্যাত্ব রোগ নিয়ে জগৎসংসারে এমন দুঃসহ বেঁচে থাকবার।

২.

আমি সারাদিন মন খারাপ করে আনাজ কুটি। রান্না চড়াই। স্বামী শাশুড়িকে ভাত বেড়ে দিই। থালাবাসন মাজি। ইচ্ছে করেই বেশি বেশি কাজ করি। যেন বন্ধ্যাত্বের গ্লানি কিছুটা কমে। আমারই রান্না করা খাবার খেতে খেতে শাশুড়ি পড়শি ডেকে গল্প করেন কোথাও কোনও মেয়ে আছে কি না ছেলেকে বিয়ে করাবার। পড়শিরা মাথা নাড়ে। টের পাই খুব শিগগির বোধহয় বিয়েও করবে আমার স্বামী। অনুমান করি আমার বাবা মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে একদিন বলবেন—'মেয়েদের জীবনে স্বামীই হল সব। সতিনের ঘর কর মা। এতে কোনও লজ্জা নেই। কত মেয়েরা সতিন নিয়ে থাকছে না! আর তোমারই দোষে তো লতিফ বিয়ে করছে। অন্যায় তো কিছু করছে না।'

আমার এমন মন খারাপ করা সময়ে বাড়িতে হৈ হৈ রব উঠল একদিন। সকলে বলাবলি করল এবার সব সমস্যা ঘুচবে। কী সমস্যা? বাচ্চা যাদের হয় না তাদের এখন বাচ্চা হবে। কে এক মেদেনীপুরি পীর এসেছে, তার নাকি এই অসম্ভব ক্ষমতা। আমার বিশ্বাস হয় না। ডাক্তার বলেছেন বাচ্চা হবে না। তবে কি করে বাচ্চা হবে? ডাক্তারের কথা তো আর উল্টে দিতে পারবে না ওই পীর। আমার স্বামী বলল—'চলো। শেষ চেষ্টা করে দেখি। বারো বছর বাচ্চা হয়নি সলিম চাচার। এই পীরের দোয়া নিয়ে আসার পর এখন চাচীর বাচ্চা পেটে।' শাশুড়ি পানের বাটা সামনে নিয়ে গল্প করতে

বসলেন তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে যাদের পাঁচ সাত বছর বাচ্চা হচ্ছে না তারাও নাকি এখন অন্তঃসত্ত্বা।

অতঃপর আমাকেও যেতে হয়। শাশুড়ি আমাকে সেদিন সকালে গা মেজে গোসল করতে বললেন। পীরের কাছে যাবার আগে পয়পরিষ্কার হয়ে যেতে হবে। সঙ্গে একটি ডিম নিলেন তিনি, বললেন – কাঁচা ডিম নিলাম। এটিকে তিনি হাতের তালুতে নিয়ে সেদ্ধ করে দেবেন। সেদ্ধ ডিমটা খেলেই বাচ্চা পেটে আসবে।'

আমি হেসে উঠলাম। বললাম – কী যে বলছেন ডিম খেলে বাচ্চা হবে কেন ? ডিমে কি বাচ্চা হওয়ার কিছু থাকে ?

শাশুড়ি চোখ ছোট করে বললেন – 'তুমি এসবের কি বুঝবে ! পীর সাহেব হচ্ছেন আল্লার ওলি। আল্লাহতায়ালা তাঁকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন।'

'তাই বলে বাঁজা মেয়ের পেটে বাচ্চা ধরবে ?'

– 'আল্লাহর আদেশে কী না হয় ?'

শাশুড়ি পান মুখে দেন। আঙুলে করে চুন লাগান জিহ্বায়। তাঁর খুশি ঝরে পড়ে গাল বেয়ে।

৩.

পীরের বাড়ি থই থই করছে বাঁজা মেয়েমানুষে। তাদের চোখের তারায় স্বপ্ন নাচে। আমার কেমন ভয় ভয় লাগে। আমরা দু'জন বারান্দার টুলে বসে অপেক্ষা করছিলাম। ডাক পড়ল। শাশুড়িও সঙ্গে ঢুকলেন। পীর বসেছিলেন দু'পাশে বড় বড় দুটো কোলবালিশ নিয়ে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। পীরের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন শাশুড়ি; আমাকে বললেন করতে। আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। শাশুড়ির আদেশ আমাকেও মান্য করতে হল। পা ছুঁতে গিয়ে দেখি আমার হাতের দিকে পা-খানা খানিকটা বাড়িয়ে দিলেন পীর ! ধবধবে শাদা পা। ধুলো-ময়লা নেই।

সামনে ফরাস পাতা। ওতে বসতে হবে। দু'জন বসলাম। ক্যাশবাক্স সামনে নিয়ে একজন দাড়িঅলা বসেছিল। সে বলল—'কথা বলার আগে পাঁচ হাজার লাগবে।'

শাশুড়ী প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। বোরখার তল থেকে টাকা বের করে ক্যাশে বসা লোকের হাতে দিলেন। লোকটি টাকা গুণে বললেন—'ঠিক

আছে'। ঠিক আছে বলবার পর পীর মুখ খুললেন। বললেন—'কয় বছর বাচ্চা হয় না ?'

শাশুড়ি উত্তর দেন। আমি চোখ নামিয়ে বসে থাকি। যেন খুনের আসামী এসেছি। বড় অপরাধ আমার। অপরাধ মেটানো হচ্ছে টাকা দিয়ে। পীর হেসে বললেন—'আমাদের বৌমা খুব লাজুক নাকি ?'

মুখ তুলে দেখলাম হাসছেন তিনি। শাশুড়িও হাসছেন। আমারও বোধহয় হাসা উচিত ভেবে হাসতে গিয়ে দেখি ঠোঁট বাঁকছে বেদনায় বিষাদে।

—'কি, মাসিক কবে হয়েছে বৌমার ?'

মাসিকের কথা উচ্চারণ করায় আমার কান গরম হয়ে উঠল লজ্জায়। কোনও উত্তর দিলাম না। শাশুড়ির পক্ষেও সম্ভব হল না উত্তর দেওয়া। পীর আবার গমগম গলায় বললেন—'মাসিকের বারোদিন পর আসতে হবে বৌমা। তখন ডিম নিয়ে এস। ডিম খেলে আল্লাহর রহমতে বাচ্চা হবে।'

শাশুড়ি আবার তার পা ছুঁয়ে বেরিয়ে এলেন। হাতের ডিম হাতেই রয়ে গেল। দর্শনার্থীর ভিড় বারান্দা উপচে উঠোনে গিয়ে পড়েছে। সবার হাতে একটি করে ডিম। আমি বিস্মিত চোখ নিয়ে পীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। শাশুড়ি কলকল করে সারা পথ কথা বললেন। বললেন—'বিয়ে হয়ত ঠিকই করাতে হত ছেলেকে। পীরবাবা এসে পড়ায় তোমার ভাগ্য খুলল। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় কর।'

শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলাম—'মাসিকের বারোদিন পর ডিম খেতে হয় কেন ? যে কোনও সময় খেলে কি বাচ্চা হয় না ?'

শাশুড়ি বললেন—'আল্লাহ যে নিয়ম বেঁধে দেন সেই নিয়মেই ডিম খেতে হয়।'

—'আল্লাহ কি মাসিকের হিসেবে সময় বাঁধেন ?'

শাশুড়ি ফোঁস করে ওঠেন। বলেন—'আল্লাহ নিয়ে কথা বলবে না বৌ।'

স্বামী রাতে জিজ্ঞেস করলেন—এবার তো বাচ্চা পেটে আসবেই। কী বল ?'

আমি হেসে বলি—'মাসিকের বারোদিন পর যেতে বলছে।'

—'ডিম কি সেদিনই খেতে হবে ?'

—'তাই তো বলল।'

—'দেখেছ কাঁচা ডিম কি করে সেদ্ধ করে দেন! আল্লাহর কুদরত দেখেছ ?'

—'আজ আমাদের ডিমে করে নি। করবে বলল। আসলে কি জানো এইসব পীর-টিরে আমার বিশ্বাস হয় না। চলো, ভাল ডাক্তার দেখাই। এই দেশে যদি চিকিৎসা না হয় চলো বিদেশ যাই।'

স্বামী ধমকে উঠলেন—'আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো। এত লোক যাচ্ছে পীরের কাছে। দলে দলে কোটিপতিরা ভিড করছে, তারাও পায়ের ধুলো নিয়ে আসছে পীরের। বড বড শিক্ষিত লোকেরা কি না বুঝেই তাঁর কাছে যায়? তাঁদের কি বোকা ভাবো? কলেজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা? মন্ত্রীরা? সেক্রেটারিরা? কে না যান? দেশের প্রেসিডেন্টও গিযে পীরের পাযে পডে থাকেন।'

৪.

মাসিকের পর বারোদিন কবে আসবে, শাশুডি তারিখ হিসেব করে রাখেন। বারোদিনের দিন স্বামী শাশুডি দু'জন মিলে নিযে গেলেন আমাকে। সারি সারি ঘর পীরের। কোথাও পোলাও মাংস খাওয়া হচ্ছে। কোথাও আল্লাহু জিকির হচ্ছে। কোথাও হাসি হাসি মুখ করে বসে আছে কিছু টুপি পাঞ্জাবি পরা লোক। কোথাও ঝাঁক ঝাঁক মেযে বসে আছে মুখ ভার করে। আমার স্বামী মুগ্ধ চোখে তাকান চারদিকে। দু'ঘণ্টা অপেক্ষার পর পীরের দেখা মেলে। পীরের ডিম-সেদ্ধ খেতে হবে আজ। শাশুডি বোরখার তলে ডিম নিয়ে এসেছেন আজও। ঘরে ঢুকবার পর সেদিনের মত বাডতি লোকটি ধাতব কণ্ঠে বলল—'পাঁচ হাজার।'

স্বামী দ্রুত পাঁচ হাজার টাকা দিল লোকটির হাতে। ডিমটি দেবার পর পীর হাসলেন। হাতের মধ্যে ডিমটি নিয়ে নাডাচাডা করতে করতে বললেন—'আল্লাহর কাছে চাওয়ার মত চাইতে হয়। ঠিক কি না?'

স্বামী মাথা নাডল। ডিমটি হঠাৎ একটি বাটির কিনারে এক টোকায় ফাটিযে পীর বললেন—আল্লাহর নাম করে খেয়ে ফেলো তো বৌমা।'

ডিম সত্যি সত্যি সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমার মনে হল এ নিতান্তই যাদু।

ছোটবেলায় আমাদের পাশের বাড়িতে দুষ্টু এক ছোকরা ছিল। তাকে ইটের একটি টুকরো দিলে সে দু'হাত পেছনে নিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলত, ব'লে ইটের টুকরোর বদলে আস্ত একটি পেয়ারা হাতে নিয়ে হাত প্রসারিত করত। পরে তার চালাকিটি আমরা ধরতে পেরেছিলাম। সে প্যান্টের পেছনে একটি পেয়ারা গুজে রাখত। পেছনে হাত নিয়ে ইটের টুকরোটি কায়দা করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে গুঁজে রাখা পেয়ারাটি বার করে নিয়ে আসত। আর বিড়বিড় করে যা বলত তার কোনও অর্থ ছিল না। আমার কাছেও, যখন পীর বিড বিড় করে কি কি সব বলে ফুঁ দিয়ে দিলেন ডিমে, মনে হল কোনও অর্থ নেই এইসব বিড়বিড়ের। আমার স্বামী ডিমটি ডান হাতে তুলে বিসমিল্লাহ বলে আমার মুখে একরকম ঠেলেই দিলেন।

খাওয়া শেষ হলে পীর বললেন—'এবার ফুঁ দিয়ে দিতে হবে বৌমাকে। ঘরে এখন আত্মীয়-স্বজন থাকা চলবে না।'

স্বামী শ্বাশুড়ি বেরিয়ে গেলেন। পীর তার কালো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন – 'কি গো মেয়ে ডিম খাওয়া হল ?'

মাথা নেড়ে বললাম – 'হ্যাঁ'।

– 'তুমি তো খুব সুন্দরী। ঠোঁটজোড়া কমলালেবুর কোয়ার মত। স্বাস্থ্যও মাশাল্লা। বয়স কত ?'

– 'সাতাশ।'

– 'তুমি তো কচি মাল। এখনই বাচ্চা পাডতে হবে ?' খিক খিক করে হাসলেন পীর। দাঁতগুলো মুলোর মত শাদা।

আমি মাথা নামিযে বললাম – 'আমার শ্বশুরবাডি থেকে চাচ্ছে…'

– 'এই এক মুশকিল। ধ্বজভঙ্গ স্বামীরা ঠিক বুঝতে চায় না প্রবলেম-গুলো।'

পীরের চোখে চমকে তাকালাম, এসব কী ধরনের কথা তিনি বলছেন। দেখি পীর আমার সর্বাঙ্গ দেখছেন। জুলজুল চোখ তাঁর। হাতে একটি তসবিহ ছিল, সেটি নেই। পা পর্যন্ত শাদা আলখাল্লাহ ছিল, সেটি ক্রমশ উপরে উঠছে। পীর বললেন—'পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আল্লাহর ওহি আসবে।'

– 'আল্লাহর ওহি ?'

অবাক হলাম, একালে আল্লাহর ওহি আসে এরকম কথা আগে শুনি নি।

পীর যা বললেন, তাই আমাকে শুনতে হবে কারণ আমার যে করেই হোক একটি বাচ্চা হতে হবে। আমারও কৌতূহল হচ্ছিল কী করে ডিম খেয়ে বাচ্চা হয় দেখবার।

পাশের যে ঘরটিতে অপেক্ষা করতে বলা হল, সেই ঘরটির দেযালে চারটে তলোয়ার ঝোলানো। মেঝেয একটি চৌকি পাতা। টাকা-নেওয়া রোবট-লোকটি দুটো শাদা কাপড়ে আমার মুখ আর চোখ বেঁধে আমাকে শুযে পড়তে বলল বিছানায়। কানে কানে সে ধাতব কণ্ঠে বলে গেল—'নডা চড়া চলবে না।'

কাঠ হয়ে পড়ে আছি। হঠাৎ আমার শরীরের ওপর ভারী একটি শরীর চড়ে বসল। ভারি শরীরটি আমাকে দশ থেকে পনেরো মিনিট ধরে কিছু একটা করল আর বাধা দিতে গেলে বলল—'এই কথা ফাঁস করলে আমার কিছু হবে না, তোমার বিপদ হবে। স্বামী তোমাকে তালাক দেবে। তার চেযে কিছুই বলো না। চেপে যাও। একটা বাচ্চা পাবে। তোমাকে পছন্দ হযেছে বলে আমি নিজেই তোমাকে ওষুধ দিলাম। অন্যদের জন্য অন্য লোক আছে। বোকা মেয়ে, এইসব ছাড়া বাচ্চা হয নাকি?'

আমি গোঙাচ্ছিলাম। লোকটি উঠে চলে গেল। ধাতব লোকটি আমার চোখ ও মুখের বাঁধন আলগা করে বলল—'ব্যাস চলে যান।' আমি শাড়ি ঠিক করে বাইরে এসে দেখি স্বামী আর শাশুড়ি বসে আছেন। ঘৃণায আমার থুতু আসছিল। পীরের মুখে ছুঁড়ে আসতে পারি নি। আমাকে দরজা দিয়ে পার করে দিয়েছে লোকটি। দৌড়ে আমার কাছে এল স্বামী। বলল—ফুঁ দিয়েছে?'

হ্যাঁ না কিছুই বলতে ইচ্ছে হল না আমার।

স্বামী খুশিতে হাসছিল। মুখের একদলা থুতু স্বামীর দিকে ছুঁড়ে মারতে গিয়ে দেখি তার গায়ের পাশ দিয়ে সেটি উড়ে গেল।

নারীবাদী

নাসরীন জাহান

সে স্পষ্ট দেখে, আসমান দু'ভাগ হয়ে নেমে আসছে কালো কুচকুচে ডানাওয়ালা এক প্রাণী, যার লেজের জায়গায় আছে দুটো শিশু পা, মাথাটা বৃদ্ধ মানুষের মতো। শূন্য তালুর চারপাশটায় এমনই সাদা কালো ঘাসের চুল যা দেখলে আরব্য রজনীর কোন এক অজানা পৃথিবীর কথা মনে হয়।

কোন অজানা প্রাণী

মাঠ

বামুন মানুষ।

শঙ্কাশঙ্কুলতা ভর করে থাকে প্রাণীটির চোখে। আকাশ দু'ফাঁক করে কেউ যখন তাকে ধাক্কা দেয়, তখন সে এমনই জবুথবু হয়ে তার বারান্দায় এসে পড়ে, এমনই ভয়ার্ত নিঃশব্দতা, কেউ শব্দটি পর্যন্ত পায় না।

কিন্তু চন্দ্রমুখী গন্ধ পায়।

মনে হয় নারকেলের পোড়া ছোবড়ায় কেউ বিচিত্র গন্ধসহ ধূপ গুঁড়ো মিশিয়েছে। সেই গন্ধের মধ্যে থাকে দূরবর্তী বনের বাঁশির সুরের মাদকতা।

মোহগ্রস্ত সে খিড়কী খোলে।

এবং ভয়ার্ত মায়াময় চোখগুলি দেখে। কিন্তু

সকাল হলে সেই প্রাণীর কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

খ.

সন্তান মরে যায় অপুষ্টিতে। দূর গাঁয়ের ডাক্তার আরও বলেছে এই শিশু-মহিলা কী ক'রে ধারণ করবে আরেকটি শিশুকে? প্রস্ফুটিত পেট নিয়ে বছর বছর কচ্ছপের মতো হাঁটে চন্দ্রমুখী। বছর বছর—কম কথা?

এ কী ধরনের বাক্যি গো? বছর বছর গেলেও মেয়ের গর্ভিণী হওয়ার বয়স

হয় না ? তারপর দেখো না নিতম্বের বাহার। ইচ্ছে হয় গরম খুন্তিতে নুন ভরিয়ে ছ্যাকা দেয়।

এইভাবে চন্দ্রমুখীর চারপাশের সার সার মুখ আবর্তিত হয়। অস্পষ্ট কুয়াশায় বর্শার ফলার মতো উর্ধমুখী বিঁধে থাকে মন্দিরের চূড়ো। রক্তস্রোতে ঘোর শোরগোল তুলে মাজারের কোরাস বাড়তে থাকে।

চন্দ্রমুখীর ফাঁপা ওষ্ঠ থর থর কম্পনে প্রলম্বিত হয়ে ওঠে। রাজ্যির লবণ জড়ো হয় চক্ষু-কোণে।

লাল কাপড়ের নিচে কি নিঃশব্দ হিম।

যুবতী হওয়ার বাসনায় মোমবাতি মানত হয়। সেই অদৃশ্য মোমবাতির লকলকে জিহ্বা টানটান নাভির ছিদ্র ফুঁড়ে গুহা ঘরে প্রবেশ করে।

চতুর্গ্রাম পার হয়ে ভ্রাতা এসেছে গতকাল। এত বিশাল পথের দীর্ঘতা, বেচারা উঠোনটা পার হচ্ছিলো খুঁড়িয়ে। বারান্দা'র কাছে উপবিষ্ট ডালিম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে যখন তার শুকনো মুখ হা হয়ে আসছিলো – তার চারপাশ ঘিরে ধরলো এ বাড়ির মানুষেরা।

খাঁচার শিকের যে ন্যূনতম ফাঁক আছে তার ভেতর দিয়েই চন্দ্রমুখী চোখ বাড়িয়ে রেখেছিলো। সন্ধ্যার আকাশটা কাঁপিয়ে গম্ভীর মেঘপুঞ্জ গর্জে উঠতেই মানুষগুলো যেন শক্তি পায়।

তারা ভ্রাতার পোশাক হাতড়াতে থাকে। অপমানে বেচারার মুখমণ্ডল কেমন নীলাভ্র হয়ে উঠছিলো।

একজনের চোখ চাকতির মতো ঘুরে উঠলো – পাইছি।

সমস্ত মুখ ঘনীভূত হয় একজনের হাতের মধ্যে। রূপালী ছায়ায় ঝলসে ওঠে কিছু। একটি গোল পিণ্ড।

চন্দ্রমুখী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

তার শত সহস্র অক্ষমতার সাথে নতুন কিছুর সংযোজন হয় নি তাহলে ?

গ.

সমস্ত গ্রামে কিলবিল করে বাচ্চারা। সন্তানের প্রতি কোন আকুতি নেই চন্দ্রমুখীর। কেমন সর্পছানার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে হামাগুড়ি দেয়। বৃক্ষের ফল, নদীর পানি, মাটির ধান সব গিলে খেয়েও খিদার জন্য হা করে। অথচ এ রকম একটা রাক্ষসছানাই ফি বছর পেটে নিয়ে ঘুরতে হয়। চন্দ্রমুখী স্বপ্নে দেখে—

আকাশ উজ্জ্বল হয়ে এসেছে। ভূমিষ্ঠ হয়েছে তাজা শিশু। কিন্তু সেই শিশুর কী বীভৎস ক্রুদ্ধ রূপ। হুবহু তার পিতার মতো। তেজী শিরাগুলি সারাক্ষণ দপদপ করে। সে সন্তান বেরিয়েই কোদাল দিয়ে চন্দ্রমুখীর পেট খুঁড়তে থাকে।

এসব স্বপ্নের ফলে শিশুর প্রতি বীতশ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমের বাড়ির শিশুটাকে দেখো না, জন্মেই কেমন ব্যবসা শুরু করেছে। সারা মুখে একটিই চক্ষু। টানা চামড়ায় খাওয়ার জন্য একটি ছিদ্র আছে শুধু। হাতের স্থানে পা গজিয়েছে। পায়ের স্থানে কিছু নেই। নল দিয়ে জল টেনেই কেমন দিব্যি বেঁচে আছে। বরং তার জন্মের পর গ্রামে ফসল ভালো হওয়ায় বড় কারবারী হয়ে উঠেছে সে। লোকজন এই পয়মন্ত শিশুকে ঝাঁক বেঁধে টাকা দিয়ে যায়। কী সব সুফল মেলে।

বেশ বড় সামিয়ানা টাঙানো। আশপাশে দোকান-পাট বসে গেছে। সেই জায়গার হাওয়াই গেছে পাল্টে। চন্দ্রমুখী স্বপ্নের মধ্যে এমনই একটি শিশুকে কামনা করে। এর জন্মের পর লুকিয়ে গ্রাম থেকে গা ঢাকা দেবে সে। বেঁচে থাকার আর সমস্যা থাকবে না। কিংবা অন্য রকম আজব শিশু।

ধুলো-জমা চোখে মূর্তিমতী বসে থাকে চন্দ্রমুখী। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আত্মীয়েরা দল বেঁধে অত্যাচার করে। চন্দ্রমুখী ভেবে পায় না এই কুৎসিত দেহটাকে কি করে মায়াময় করে তুলতে পারলে সে সবার সহানুভূতি পাবে। কিছু বুঝতে না পেরে সে প্রায়ই হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শাশুড়ি তো নয়, ঠাকুরমার ঝুলির রাক্ষুসী। দশটি পুরুষ ছা বিইয়ে মহিলার বিশাল বপু কেমন ঝুলঝুলে হয়ে উঠেছে। ঘুমাক্রান্ত চক্ষুর মধ্যে আগুন জ্বল জ্বল করে। ত্যানার মতো পেঁচিয়ে থাকা শরীর বুক থেকে মাটিতে বসে হা করে দম নেয়।

তার শনের মতো চুলে তেল ঘষতে ঘষতে চন্দ্রমুখী কেমন কাঁপতে থাকে। মহিলার কিছুতেই আরাম হয় না। ঝটকা দিয়ে চন্দ্রমুখীর হাত গতরে নামিয়ে আনে।

চন্দ্রমুখী টিপতে থাকে।

মহিলা বাজখাই কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠলে ওর হাত চলে যায় মহিলার পদযুগলের সেবাকার্যে। কিন্তু মহিলা উশখুশ করে। ভুস্ করে নিঃশ্বাস ফেলে এমনভাবে নিজের দেহটাকে উল্টে দেয়, তক্তপোষ মড়মড় করে ভেঙে পড়ার

উপক্রম হয়। চন্দ্রমুখীর প্রাণ সঞ্চালন স্তব্ধ হয়ে আসে। অসহিষ্ণু মহিলা তাকে সজোরে ধাক্কা দেয় – আকামের মাগী, যা মরদের তলে শুইয়া থাক্ গিয়া।

ঘ.

সে সব মুহূর্তেই চন্দ্রমুখীর চেতনায় নেমে আসে বাজপাখি শিশু। তার আলোকময় দৃষ্টি দিযে চন্দ্রমুখীকে ঘোরগ্রস্ত করে রাখে। গর্ভভারাক্রান্ত দেহে স্বামী যখন বিদঘুটে মজা নিযে ঝাঁপাতে থাকে, শোণিত স্রোতে শিরশির চলতে থাকে কালিজিরার দানা। গরম খুস্তি দৃষ্টির সামনে নানা কায়দায় ঝুলতে থাকে, যখন দশপাণ্ডবের ত্রাসের রাজত্বে দাঁত কপাটি লাগার উপক্রম হয, গর্ভের শিশু ক্ষুধায চিৎকার করতে থাকে, তখন দ্রুত চন্দ্রমুখীর বিশ্বে রাত্রি নেমে আসে।

বারান্দায় চিত হযে সে প্রাণী এমন ঘোর চোখে চন্দ্রমুখীকে ডাকে, সে জগৎ সংসার ভুলে যায়।

ভাবে, প্রাণীটিকে আড়ালে ভরে দূর পথে পাড়ি জমাবে সে। কিন্তু যখনই তার দুর্নিবার পা বাইরের পথে সঞ্চালিত হয – পেছনে এসে দাঁড়ায স্বামী।

নিঃসীম অন্ধকার জমে চন্দ্রমুখীর চামড়ার নিচে। সবুজ কলিজা ছিন্ন করে ঢুকে যায় বর্ষার ফলা। এক্ষুণি সবাই একত্রিত হযে প্রাণীটির অস্তিত্ব নাশ করবে।

কিন্তু সে ব্যাপক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে, সে ছাড়া এই প্রাণীটিকে আর কেউ দেখে না।

অসম্ভব মজায় কেমন শাণিত হয়ে উঠে চন্দ্রমুখীর শরীরের আগুন! ইচ্ছে হয় – সব ভস্ম করে দেয়।

হিঃ হিঃ হাসতে থাকে সে।

ঙ.

আসলে এর উৎপত্তি হয়েছে আরও আগে থেকেই। চতুর্থ মৃত সন্তান প্রসবের পর বাড়িতে দরবেশ এসেছিলো। এর আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিলো চন্দ্রমুখীকে বিতাড়িত করা হবে এই বাড়ি থেকে।

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো মা। দশ পাণ্ডবের তা-ই মত। প্রথম পাণ্ডবের পর বিস্তৃত ফাঁক। তারপর ক্রমান্বয়ে ন'জনের জন্ম হয়। এই বাড়ির একমাত্র বধূ, যার কুৎসিত চেহারা দেখে সবার বুকের আলো নিভে যায়, তার পিতা কিছু

নগদ, কিছু প্রতিশ্রুতিসহ এ নারীকে বিদায় করেছিলো।

প্রতিশ্রুতির ঘানি নিরন্তর টেনে চলেছে তার ভ্রাতা।

দ্বিতীয় পাণ্ডবের বিবাহ স্থির করার আগে চন্দ্রমুখীর ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার অভিপ্রায়ে মাতা বাড়িতে দরবেশ ডেকে আনেন। জয় বাবা···এ রকম গগন—ছিদ্র চিৎকারে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে সেই মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে নানা নামে ডাকতে থাকে—হে মালিক, ভগবান-আল্লাহ্‌-ঈশ্বর···শেষে বলে সব ধর্মই আমার ধর্ম। এই রকম অতিপ্রাকৃত মানুষের আবির্ভাবে পুরো সংসার বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সামনের জলচৌকিতে উপবিষ্ট চন্দ্রমুখী।

রমণীভুক মানুষের মতো সেই ব্যক্তি নাসাছিদ্র দিয়ে চন্দ্রমুখীর ওপর ময়না-তদন্ত চালায়।

শেষে স্তব্ধ হয়ে যায়।

সমস্ত পরিবেশ টানটান, স্থির।

চন্দ্রমুখী দেখে তার সমূহ বিনাশ। ধারালো নখ ঢুকে যাচ্ছে কণ্ঠনালীতে। উজানো কান্না গিলে সে সাক্ষাৎ মূর্তিমতী। এর মধ্যে দশ চক্ষু বিস্ফারিত করে গনগনে কণ্ঠে সেই আজব পীর জানায়—নারীর মইধ্যে আছে দুই জাত।

সুজাত। কুজাত।

এরপর সে সুজাত নারীর বিশ্লেষণে বসে। এত হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা, যেন নারী নয়, ডানাওয়ালা ফেরেশতার বর্ণনা চলছে। সেই নারী যেন মলমূত্র কিছু ত্যাগ করে না। সর্ব শরীরে সারাক্ষণ গোলাপফুলের গন্ধ। পদক্ষেপে শব্দ নয়, কম খায়, কম ঘুমায়। তার হৃদয় উৎসারিত কর্পূরের গন্ধে বাতাস আমোদিত। সে নারী কখনো প্রেয়সী, কখনো দাসী, কখনো মাতা। যার শক্তির জন্য যে ভূমিকা প্রয়োজন, সেই নারী সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

শেষে আসে কু-জাত নারীর প্রসঙ্গ।

সেই বর্ণনায় চন্দ্রমুখীর ফাঁপা দেহ তুলো হয়ে বাতাসে ওড়ে। মরা ইঁদুরের মতো গন্ধ ছড়ায়, থাক থাক সাজিয়ে রাখা মাংসপিণ্ড হয়। চিত্রার্পিতের মতো তাকিয়ে থাকে চন্দ্রমুখী।

দরবেশ বলে—কুজাত নারী ডাইনীর বংশধর। প্রাচীনকালে যে ডাইনীদের পুড়িয়ে মারা হতো তাদেরই অনেক বংশধর সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এরা মনুষ্যরূপী। কিন্তু এদের সমস্ত শরীরে লক্ষ করলে দেখা যাবে জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ। শ্রীহীন এদের আচরণ, চলা ফেরা।

যা হোক শেষমেশ দরবেশ এই মর্মে সিদ্ধান্তে আসে, চন্দ্রমুখী যদি সুজাত নারী হয়, তবে আগামী মাসের নির্দিষ্ট তারিখে তার হায়েস হবে না। কেননা আগামী মাসের একটি বিশিষ্ট সময়ে পূর্ণচন্দ্রের সময় যারা বন্ধ্যা, অকালমৃতা কিন্তু সুজাত সম্পন্ন তারা গর্ভিণী হবে। চন্দ্র এবং মাসের হিসেবে এই মাসই অসম্ভব ফলবান মাস।

নারী কুজাত হলে সেই মাসে হায়েস হবে।

অরণ্যমূলে গর্ত খুঁড়ে প্রবেশ করে ইঁদুর। ঠোঁটের ওপর বসে থাকা আঁচল গাঢ় নীলবর্ণ। চন্দ্রমুখীর বর্তমান, ভবিষ্যৎ, দিন মাস একটি বিন্দুতে স্থির।

শরীরের মরা ডাল বেয়ে পিঁপড়ে ওঠে। অবশ স্নায়ু ছিন্ন করে প্রহর অতিক্রান্ত হয়। বিবর্ণক্লিষ্ট কাঁপা ওষ্ঠ গড়িয়ে নির্বিকার লালার নিম্নমুখী পতন।

অবশেষে চন্দ্রমুখী ঋতুবতী হয়।

চ.

এর পরের স্মৃতি স্বপ্নেও আনতে চায় না চন্দ্রমুখী। চারপাশ কেমন আঁধার হয়ে আসছে। প্রকৃতি কারও থাবলা দেওয়া মুঠোর মধ্যে পড়ে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছে। রক্তস্রোতে মাতলামি করে ঘনছায়া কুয়াশা। পাশের কক্ষে জোর বৈঠকের শব্দ আসছে। দূর গাঁ থেকে আগত ভ্রাতার মুখে দানাপানি পড়েনি। তাকে রেখে চতুষ্পার্শে অসহিষ্ণু কোরাস কেন্দ্রবিন্দুতে চন্দ্রমুখী নির্জনে কান পাতে।

তোমার এই চাকতি স্বর্ণেরই যে, তার গ্যারাণ্ট কি ?

না না, শালা চাপাবাজ।

স্বর্ণের বালা তুমারে গলায় কে আনতে কইছে ? ধাপ্পাবাজের গোষ্ঠী—

এসবের পর সিদ্ধান্ত হয় স্বর্ণকারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তবে মেহমানকে জল স্পর্শ করতে দেওবা হবে। মানুষরূপী রাক্ষসীকে নিয়ে যে তারা সংসার করছে তাই হিসেবে এতেই তার পরিতৃপ্ত থাকা উচিত।

চন্দ্রমুখী চক্ষু বুজে বাজপাখির পিঠে চড়ে বসে। সেই মায়াবী চাহনি, বুড়ো মস্তক, সেই শিশু পা বিদঘুটে আকৃতি তাকে এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে নিয়ে চলে।

চতুষ্পার্শ্ব প্রকম্পিত করে বৃষ্টি পড়ছে। চন্দ্রমুখীর হৃদস্পন্দনের ওপর স্তম্ভের মতো বরফ চাপা। ধাতব শীত ওর যন্ত্রণাকাতর দেহে মৃত্যুর মতো প্রবেশ

করে। রাত্রি বাড়ছে। বৃষ্টির কারণে স্বর্ণকারের কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। পাশের কক্ষে নিশ্চল পড়ে আছে ভ্রাতা।

ভেজা লাকড়ির মধ্যে প্রাণান্তকর ফুঁ দিতে দিতে বুকে ব্যথা জমতে থাকলে পেছনে দাঁড়ানো স্বামীর দীর্ঘাবয়বের দিকে তাকায়। ঘাড় কাত করেও অত উঁচুতে স্থাপিত তার মুখের নাগাল পাওয়া যায় না।

চন্দ্রমুখী ডাইনির বংশধর এটা জানার পর এই মানুষটির মধ্যে থেকে চিঁটেফোটা মমতাও উঠে গেছে। পুনরায বিবাহের জন্য তৈরি হওয়ার মৌজে প্রায়শ সে উদ্দীপিত থাকলেও চন্দ্রমুখীর উপস্থিতিতে সেই মুখ বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

চন্দ্রমুখীর মধ্যেও এক সময় এই ভাবনা দৃঢ় হয়, সেই এক চক্ষু শিশুটির তহবিলে কিছু দান করলে তার অকল্যাণ দূর হবে। কিন্তু তেমন পুণ্যস্থানেও ডাইনির বংশধরের প্রবেশ নিশেধ। এই নিষেধ নির্ধারিত হয়েছে এই পরিবারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে।

এসবের মধ্যে পেটে পুনরায় জন্ম নিয়েছে রাক্ষস – শুধু শুধুই ন'মাস একে বহন করা, পেলে পুষে বড় করা, জন্ম নেবে ঠিক এক মরা হাড্ডি। এ কী নিযতি। আজীবন এই ঘানি টেনে যেতে হবে চন্দ্রমুখীকে?

তুই যদি জানিসই আমি ডাইনি, তবে তারপরও আমার ওপর চড়ে বসিস কেন? স্বামীর উদ্দেশ্যে বিডবিড় করে চন্দ্রমুখী। এতো চড়ে বসা নয়, মাটির মধ্যে বীজ পুঁতে দেয়া। অথচ কি ঘেন্না শরীরে। জলত্যাগ করতেও মানুষ এত কম সময় নেয় না।

লোকটির মুখে থুতু ছুঁড়ে চন্দ্রমুখী ভাতের ফেন গালতে বসে।

ছ.

দরবেশের ভবিষ্যৎবাণীর পর যখন চন্দ্রমুখী ঋতুমতী হলো, এ বাড়ীর বাইশ চক্ষুর সে কি লেলিহান শিখা। সেই শিখার মধ্যে ধোঁয়া, আতঙ্ক। প্রতিটি মানুষের মধ্যে মৃত্যুছায়া নেমে এলো। এই বাড়ির বাজখাঁই শাশুড়ি, পুরুষের মতো ভরাট কণ্ঠ দিয়ে যে সারাক্ষণ এই বাড়িতে সোচ্চার তার কণ্ঠেও স্তব্ধতা নেমে এলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা কেবল অস্থিরভাবে হাঁটছিলো।

চন্দ্রমুখী রান্না করার জন্য ডেকচিতে হাত দিতেই শাশুড়ি এত তড়িৎ লাফ

দিয়ে ডেকচি উল্টে দিলো, মনে হলো রোস্টের পাতিলে মরা ছুঁচো ফেলছে কেউ।

চন্দ্রমুখীর পদচ্ছাপের দাগও অশুদ্ধ। স্বামীর চক্ষে একই সাথে ভয়, বেদনা, ঘৃণা। বাড়িটা নরকে পরিণত হওয়ার আগেই শাশুড়ি চন্দ্রমুখীকে নির্জন কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখলো।

এই না হলে মুসলমানের নাম কেউ চন্দ্রমুখী রাখে? হায় হায়···শাশুড়ির কান্নায় সীমাহীন বেদনা—আমার বড পুত্র, হায় বড় পুত্র, তোর কপালে, কি চলার ধরন, হাসি দেখলে মনে হয় শিম্পাঞ্জির ছাও কানতাছে, ডাইনী, হায় বড পুত্র, হায় বংশ—মাগী তোর মুখে বিষ, বিষ,—।

সেই নির্জন ঘরে নিশ্চল বসে থাকে চন্দ্রমুখী। তার কুৎসিত মুখের কারণেই কি তার পিতামাতা নামের আড়াল দিয়ে সব কালি ঢেকে রাখতে চেয়েছিলো? পিতামাতার মুখ শ্বেত কুযাশায ঢাকা।

সে এক দুর্দান্ত প্রহর গেছে চন্দ্রমুখীর। সমস্ত দিন, সকাল, রাত্রি, মধ্যরাত সমস্ত আসমান, টিনের দেয়াল, মৃত্তিকা, টিকটিকি, স্বপ্ন, অবসন্নতা সমস্ত চন্দ্রমুখী, ঘুটঘুটে গন্ধ—একাকার, স্থির। ছিদ্র দিযে তাকালে আস্ত পৃথিবী চোখের ওপর নেমে আসে। কী ঘুম। নিশাচর দীর্ঘ রাত।

সেই বিমূর্ত সময়ের মধ্যেই চিন্তার গ্রন্থিগুলি বল্গাহীন ছুটতে শুরু করে। এক রাতে কি ঝাঁঝালো গন্ধ, নেশায বুঁদ চন্দ্রমুখী ঘোরগ্রস্ত চোখে চারপাশে তাকায। মাকড়সা দোল খায সহস্র দড়ির পাকে। উৎস শনাক্ত হয না। অন্ধকারেও সমস্ত ঘরে কেমন আলো জ্বলে উঠেছে। যেন আকাশ বেয়ে সহস্র ফেরেশতা নেমে আসছে। চন্দ্রমুখী সারা ঘরে পাগলপ্রায় চক্কর খায। ক্ষুধাক্লান্ত দেহ অবশ হয়ে আসতে থাকলে জানালার ফাঁকে চক্ষু রাখে। এ কি! বারান্দায পড়ে আছে এক আজব প্রাণী। তার ডানা··· পা মুখটা····।

সেই চোখ দেখে চন্দ্রমুখী কেমন টানটান হযে ওঠে। শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা অন্তর্হিত।

সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। তার সারাক্ষণ প্রজ্বলিত অগ্নিদেহ শীতল হয়ে কী স্বস্তির ঘুম।

এক চক্ষু ছেলে তার কোলে দোল খায। শাশুড়ির গজিয়ে ওঠা গোঁফ কেমন লম্বা হয়ে উঠছে। দশ পাণ্ডব এক সমান্তরালে হাউমাউ করে নাচছে। চন্দ্রমুখী অবারিত মাঠ ধরে দৌড়ায়।

দৌড়ায়।

দৌড়ায়।

ঘুম ভাঙলে তার চোয়ালের হাড় কেমন শক্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত ঘরে থুথু ছুঁড়ে। এক সময় তার ক্ষিপ্র হাত স্পর্শ করে নিষিদ্ধ রক্ত। জিভের ডগায় রক্ত ছুঁইয়ে হাঃ হাঃ করে বড় স্বস্তির হাসি হাসে।

তেমন মুহূর্তে প্রতিবেশী বিধবা আসতো পেছন জানালায়। অপেরা দিদি। নিঃশব্দ পায়ে দাঁড়াতো। পৃথিবীতে এই একটি মানুষের মুখেই মমতা দেখেছে চন্দ্রমুখী। মানুষ একা থাকলে তার মুখে কেমন স্বস্তি নেমে থাকে সারাক্ষণ— অপেরা দি-কে দেখেই সে বুঝেছে। ভীত কণ্ঠে মহিলা ফিসফিস করে কথা বলতো চন্দ্রমুখীর সাথে। জানালার ফাঁক দিয়ে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে যেতো। তার চুলে জট, কণ্ঠার প্রস্ফুটিত হাড় দেখে মহিলার চোখ জলার্দ্র হয়ে উঠতো। বলতো তুই পলায়া যা। এইডা যমপুরীরও অধম। ধিক এই জীবন।

কয়েকদিন সেই গুহায় কাটিয়ে চন্দ্রমুখীর ভেতর তৃতীয় চক্ষুর উত্থান ঘটে। স্বামীকে তার বিষাক্ত, ক্লেদাক্ত, পিচ্ছিল প্রাণী মনে হয়।

শেষে দরবেশ পুনরায় আসে। ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, পীরের সাথে পরামর্শ করে চন্দ্রমুখীকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু দরবেশ তখন আজব ফতোয়া দেয়, এই ধরনের জীবকে তাড়িয়ে দিলে পরবর্তীতে তারা বদ জীন হয়ে অদৃশ্যভাবে এই বাড়িতে ক্ষতি করতে পারে। নিম্ন জাতের দাসী পরিবারের জন্য ক্ষতিকর নয়। একে এ বাড়ির দাসীর মর্যাদায় রাখা যেতে পারে।

চন্দ্রমুখীর চক্ষে দপদপ আগুন জ্বলতে থাকে।

কিন্তু এক সময় সেই দাসীর ওপরই চড়াও হয় স্বামী। চন্দ্রমুখী সমস্ত পরিবারের ঘৃণিত তিক্ততার মুখে পুনরায় গর্ভবতী হয়।

এর মধ্যে সে রাত্তিরে কি সব আজব প্রাণী দেখতে পাচ্ছে এ তথ্য সমস্ত বাড়িতে সঞ্চারিত হয়। স্বামীর ঘর থেকে মধ্য রাতে গর্ভিণী নারী বেরিয়ে আসে। কেউ কিছু দেখে না। চন্দ্রমুখী দেখে। তার এই মস্তিষ্কের বিভ্রম এ পরিবারের মধ্যে নতুন যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেউ কেউ। কিন্তু চন্দ্রমুখী সর্বক্ষেত্রেই দিনদিন ভাবলেশহীন হয়ে উঠেছে। পদ শব্দের জোর বাড়ছে। কেমন চিৎকার করে হাই তুলছে। রান্না ঘরে বসে একা-একাই হেসে মরছে। এইসব কাণ্ড দেখে চোখ মুছতে মুছতে ভ্রাতা বিদায় হয়।

জিনিস খাঁটি, এটা পরখ করার পর পরিবারে নতুন স্বস্তি নামলে দুঃসহ পর্যায়ে চলে যায় চন্দ্রমুখীর আচরণের স্পর্ধা। শাশুড়ির চোখের দিকে সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছে—এই কারণে এক সন্ধ্যায় গর্ভবতী চন্দ্রমুখীকে বেদম প্রহার দিয়ে দড়ি দিয়ে একদিন বেঁধে রাখা হলো। এইভাবে দিন যায়।

স্বামী তাকে পুরোপুরি ত্যাগ করার পর এক রাতে চন্দ্রমুখী একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। এরপর সে প্রাণপণে হাতড়ায এর দুটি ডানা, বৃদ্ধ মুখ। না, এ স্রেফ শিশু।

জ.

অন্ধকারের গাঢ়তা বাড়তে থাকলে পরদিন সন্ধ্যায় তুমুল বৃষ্টি। মুহুর্মুহু মেঘের তীক্ষ্ণ গর্জন। সেই মাদক ঘ্রাণ। চন্দ্রমুখী অবসন্ন পায়ে বেরিয়ে আসে। না, বারান্দায় আজব প্রাণীটি নেই। অথচ কি অদ্ভুত ধূপঘ্রাণ। ঘোর অন্ধকারের বৃষ্টির পথে নেমে পড়ে সে। কি ঘোর, ঘোরাচ্ছন্ন নেশা। ঠাণ্ডা বরফের টুকরো ছিদ্র ফুঁড়ে আত্মায় প্রবেশ করে। তার কঠিন হাত অপেরা দিদির দরজা স্পর্শ করে—দিদি গো, ওই পুরুষদের ঘর আর করবো না। দরজা খোলো আজ থেকে আমি তোমার ঘর করবো।

রূপময়ীর ছয়টি হাত

শাহ্‌নাজ মুন্নী

সে রূপময়ী পিতা যার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি, আর স্বামী সেনাপ্রধান, বসবাস করে হেমনগরে। হেমনগর অতিশয় ক্ষুদ্র সফেদ শ্যামলিম রাষ্ট্র এইরকম জনশ্রুতি আছে। রূপময়ী প্রাচীর-ঘেরা বালিকানিবাসে পাঠ ও বাসকালীন সময় এইরূপ শুনেছে, বিবাহপরবর্তী মধুচন্দ্রিমাকালে এইরূপ দেখেছে।

রূপময়ীর রূপ ও রান্নার খ্যাতি আছে আর খ্যাতি আছে সুখ সংগ্রহের। বাতাসে এমত ছড়িয়েছে যে রূপময়ী বড় বড় ছিপি-আঁটা বোতলে সুখ সংগ্রহ করতে জানে। তার সেনাপ্রধান স্বামী যখন মধ্যাহ্নভোজ বা নৈশ ভোজে অন্দরে আসে কিংবা যখন নিদ্রিত হতে বা বিশ্রাম নিতে আসে তখন সে বোতলের ছিপি খুলে দেয়, কিছু সুখ খাবার টেবিলে ছড়ায়, যদিও শরীর মেদহীন রাখতে তার স্বামী পরিমিত আহারেই তৃপ্ত, কিছু সুখ শয্যায় ছড়ায়, যদিও তার স্বামী ছ'ঘণ্টার বেশি নিদ্রা যায় না, কিছু সুখ বাড়তি হলে সে তা জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দেয় আর তাই তার জানালার নিচে ভিড় করে থাকে অসুখী লোকেরা, কাড়াকাড়ি করে তুলে নেয় ফেলে দেয়া সুখ।

বাস্তবিক রূপময়ী সুখী বটে, তার রাষ্ট্রপতি পিতা ভুবনমোহিনী শিক্ষার সুগন্ধ তাকে শুঁকতে দিয়েছে, বলেছে—

'মনে রেখো মাগো, বংশের সম্মান আর ধর্মবয়ান, তুমি রাজার কুমারী চোখ তোলা, জোরে কথা বলা, সবেতে সাবধান।'

'বাস্তবিক রূপময়ী সুখী বটে, তার সেনাপ্রধান স্বামী পরিশ্রান্ত কর্মক্লান্ত, ফিরে এসেও হাসে, রূপময়ীর কপোলের তিল, চোখের পাপড়ি রেশমী চুল ও চাঁপাকলি আঙুলের স্তুতি করে, মনোযোগ দিয়ে শুনে সকল কথা।'

'তোমার দাঁড়ে ময়না পাখি আজ নতুন কি কথা বলেছে? অথবা, চোখে

অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করে।

'কি করে রেঁধেছো সখী এই শাহী খানা'?

রূপময়ী স্বামীর আগ্রহে মুগ্ধ হয়, খুঁটিনাটি কয়, হরিণ চোখ তুলে শুধোয়,

'এতো কি কাজ করো প্রিয়ে ?

'কতো কি, দেশরক্ষা, সীমান্ত প্রহরা হুঁহুঁ, সহজ তো নয়, নানা চিন্তা, ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা'।

'আমারে বলা যায় না ?'

'যাবে না কেন ? তবে কিনা আমার দুশ্চিন্তা তোমারে গ্রাস করুক কালো করুক ভীরু করুক এ যে চাই না। রূপ বরং তুমি ক্লান্তিনাশিনী হও আমার সুখদায়িনী হও।

রূপময়ী আনন্দে খুলে দেয় সুখের ছিপি। সুখ সুবাসে শয্যাগৃহ মউমউ করে জানালার ফোকর গলে উপচে পড়ে বাড়তি সুখকণা অসুখী লোকেরা তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, রাত ভোর হয়, রূপময়ী তার জানালার নিচের খবর রাখে না। খবর রাখে না দেশ পরিচালনার কেননা সে কাজ বড় কঠিন কাজ, যেখানে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ যোগায় সেনাপ্রধান শ্বশুর-জামাতারে সন্তুষ্ট রাখে জামাতা শ্বশুররে। তারা দেশশাসন নিয়ে গোপন বৈঠক করে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত বড়ই গোপনীয় কেউ যেন না জানে এমনকি তোমার স্ত্রী আমার কন্যা রূপময়ীরেও বলা যাবে না এ সম্বন্ধে। নারীর পেটে হজম হয় না আতপ চাল পর্যন্ত। অবশ্য রাষ্ট্র ও সেনাদলের কথা রূপময়ী জানতেও চায় না। কেননা এ সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা গর্হিত পাপ, সে সাজ ঘরে রূপচর্যা করে, শাহী রান্নায় টেবিল সাজায়, প্রেমকাহিনীর বই পড়ে কাঁদে, হাসে, সপ্তাহান্তে ঝলমলে সম্মিলনে সেনাপ্রধানের স্পর্শে ভাসে আর বোতল ভরে সংগ্রহ করে সুখ।

ওদিকে কখনো মতানৈক্য দেখা দেয়। শ্বশুর ও জামাতার কথা কাটাকাটি হয়। তর্কাতর্কি হয়, আবার মিটেও যায় সব যেন স্বাভাবিক নিয়ম। এইসব গোপন ভাঙাগড়া জানে না কেউ। দেশবাসী ক্রমান্বয়ে হতে থাকে রূপময়ীবৎ নির্লিপ্ত, নির্বিকার অথচ যেন সুখী যেন ধনবান যেন অভাবী।

২

হেমনগরের গহন কোণে বাস করতো হিংস্র শত্রুরা, যারা খু-উ-ব ধীরে ধীরে সংখ্যা ও আকৃতিতে বাড়ছিলো, ঝাঁক বেঁধে প্রস্তুতি নিচ্ছিল যুদ্ধের তরে।

এক ভয়াল রাতে অতর্কিতে হামলা এলো। স্বেচ্ছায় এ যুদ্ধে প্রথম গেলেন রাষ্ট্রপতি। নিশিসন্ধ্যায় নিদ্রাহীন যুদ্ধ চলে, ছিটকে পড়া চশমা, নিরেট বর্ম ভেঙে যায়, সিঁড়িতে গড়ায় লাশ, দেয়ালে বুলেটের জখম, রক্ত, গুহ্ আলোক-কুসুম। প্রাণহীন সকাল আসে। আসে দুঃসংবাদ। সমস্ত নগর নিশ্চুপ। রাষ্ট্রপতি নিহত সপুত্রক। রূপময়ী কষ্টে শোকে পুড়ে অর্ধেক ছাই হয়। ছোট থেকে ছোট হয় তার রূপ ও দেহ।

হেমনগরের ভার নেন সেনাপ্রধান। আবার যুদ্ধ শুরু হয়। গোধূলি দুপুরে নির্ঘুম যুদ্ধ চলে। রক্ষীদেরা দুভেদ্য অবস্থান ভেঙে যায় যায় প্রায়। অবিরল কালো যুদ্ধ দেখে কোমলাঙ্গী রূপময়ী। আর বলো কে না জানে যুদ্ধের অন্তর্গত রক্তের উল্লাস, রুগ্‌ণ রুদ্র যুদ্ধের পিপাসা ক্ষুব্ধ রোষ, বাবলকাঁটা সকলেই জানে যুদ্ধ কেমন অকূলভাসা।

একদিন সেনাপ্রধানও রক্তাক্ত দুঃসময়ে ঝাঁঝরা হয়ে মিশে যায়। রক্তে ও আঘাতে ডুবে যায় অবয়ব, সমস্ত চিহ্ন। রূপময়ী ক্ষুদ্র হয়, সুখের কলিগুলো ঝরে যায়, সুখহীন বোতলেরা যুদ্ধের উত্তাপে শব্দ করে ফেটে যায়। রূপময়ী প্রগাঢ় আর্তনাদে, পরিপূর্ণ রোদনে জ্ঞান হারায়।

সকলেই দেখে রূপময়ীর দেহের বদলে পড়ে আছে একমুঠো ছাই। সেনা-প্রধান ও রাষ্ট্রপতির অনুসারীরা সেই ছাই সযত্নে গোপনে তুলে রাখে নিজেদের বসতিতে।

তাণ্ডব শেষ হয় অথবা পূর্ণোদ্যমে শুরু হয় অন্যকিছু। ক্ষতি নিয়ে লাভ নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকে হেমনগর। ম্লান বিবর্ণ।

নগরের এক কোণে ছাই ঘিরে বসে থাকে একদল লোক, ছাই ঘিরে সংগঠিত হয় তারা, প্রাচীন নক্ষত্রের নিচে বসে দেবতারে ডাকে শব্দহীন।

একে একে উৎসর্গ করতে থাকে যার যার প্রিয় ধন।

এই আমি চক্ষু দিলাম, রতন অগাধ তেজ ও শক্তি দিলাম ওগো দিলাম জীবন, আমার দুটি পা দিলাম। আমি দিলাম হাত ও মনন ক্রমে বুঝি দয়াময়ের কৃপা হয়।

ফাল্গুনি পূর্ণিমা রাতে অলৌকিক বাতাস বহে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা বিহ্বল আলোড়নে আকাশ হাতড়ায়।

ছাই থেকে জন্ম নেয় মহিয়সী তেজময়ী অনন্ত সুন্দর রূপময়ী। বিশ্বাসী অনুসারীরা জয়ধ্বনি দেয়।

অবশেষে রূপময়ী দাঁড়ায়, দাঁড়ায় তার ছয় হাত প্রসারিত করে পুনর্জন্মের উজানী ধাক্কা রূপময়ীকে ক্লান্ত করে সে দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠে দর্পণে নিজেরে দেখে সদ্য যুবতী যেমন অগাধ বিস্ময়ে দেখে নিজ দেহ, তেমনি রূপময়ী দেখে তার চেহারায় নব্য দীপ্তি, দেখে নতুন হস্তসমূহ…।

একজোড়া হাত সে সহজেই সনাক্ত করতে পারে, এ তার পূর্বেকার অতি চেনা, নিত্য কর্ম সাববাব, বাকি দু'জোড়া? সংশয়ে সন্দেহে টের পায় যে, এই পুরুষালী লোমবহুল একজোড়া হাত তার বাবার কেননা এই হাতের স্নেহস্পর্শ তার জানা, অন্য জোড়া গম্ভীর, শক্ত, কঠোর তার সেনাপ্রধান স্বামীর হাত — যে হাত ছুঁয়েছিলো তার সমস্ত কিছু।

রূপময়ী চমকায়, শিহরায়। যুগপৎ আনন্দিত ও বিব্রত হয়।

ওদিকে আবার শুরু হয় অস্থির বুনো যুদ্ধ, ফুঁসে ওঠে শত্রু, অগণিত অনুসারী উচ্চকিত চিৎকারে ডাকে, 'এসো মাতা, এসো করুণাময়ী, এ ঘোর আক্রমণ করো প্রতিহত, রক্ষা কর মা, রক্ষা করো।'

নববিকশিত রূপময়ী সমতলে নেমে আসে যুদ্ধংদেহী, বহমান রক্তে মাটি ভেসে যায়, যে রক্ত গর্জন জানে, যে রক্ত অর্জন করতে জানে। সাহসী নেতৃত্বে শত্রু দমন করে জয়যুক্ত হন রানী রূপময়ী, সর্বময়ী, শক্তিমতী। প্রকাশ্যে নেমে আসে আনন্দিত জনতার সারি, কোলাহলে উৎসবে খোঁজে তাঁদের স্বপ্নবিশ্ব সুখী নগরী।

প্রথম প্রথম রূপময়ীরও এইরূপ মনে হয় যে, 'এই জয় আমারই আনা, আমাতেই যত প্রতিরোধ, আমাতেই বিজয়।'

রূপময়ী যুদ্ধের স্মৃতি মনে আনে। ইস্, কতো ত্যাগ কত নামহীন ঘাম, মৃত্যু জলন্ত রক্ত। কতো কান্না, শ্রম, কতো আত্মদান। তাছাড়া মনে করো দেখে, যুদ্ধের অসম্ভব দীর্ঘ তরোয়াল যখন অতর্কিতে ছুঁতে চায় রূপময়ীর গলা তখন সেখানে কে সাজায় ঢালের বাঁধা? কে বাঁচায় রূপময়ীর পূর্ণ জীবন?

ওই দেখো সে তো তার পিতার হাত, সে তো তার স্বামীর হাত, যদিও পুরুষালি তথাপি রক্ষক তথাপি মোহন অথবা না চাইতেই দায়িত্ববান।

সদ্য যুদ্ধজেতা রূপময়ী জনতার ইচ্ছায়, পবিত্র বসনে বসে রাষ্ট্রক্ষমতায় রাজদণ্ড ধরে নিরস্ত্র চেনা হাতে, তার নামের সামনে পিতার পদবি পেছনে স্বামীর। তার ঝলমলে কাপড়ের আড়ালে স্পষ্ট নড়েচড়ে তার স্বামী ও পিতার

হাত। রূপময়ী শপথে দৃঢ় হয়। হেমনগর চলে ঢিমেতালে।

রূপময়ীর সমালোচনা হয়, কখনো প্রশংসা, নিন্দা কখনো, প্রথম দিকে রূপময়ী এমত ভাবে যে এ সমস্তই তার কর্মের ফলাফল তার যোগ্যতার মূল্যায়ন, অবশেষে সপ্তাহ মাস ও বছর শেষে এক রাতে সে ক্রন্দনে বুক ভিজিয়ে বোঝে—হায়, তারই নামে তার সমস্ত কর্ম পরিচালনা করে দুই জোড়া পুরুষালী লোমশ, কঠোর হাত রূপময়ী কিছুতেই যাদের এড়াতে পারে না। তার সম্মুখ ও পশ্চাৎ ঘিরে অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘিরে অতিশয় তৎপর দুই জোড়া হাত।

অতঃপর ঘোর ঝড, একাকী ঘূর্ণি ও বিপুল শূন্যতা পেরিয়ে রূপময়ী উজ্জ্বল সিদ্ধান্তে স্থিরতা পায় যেমন প্রহরাহীন ব্যাপ্ত হবে এইবার তার স্বাভাবিক যাত্রা সফল ডিঙা।

রূপময়ী রাষ্ট্রীয় চিকিৎসককে ডাক পাঠায়।

'চিকিৎসক আমাকে দেখো, আমার শরীরে এই দেখো' রূপময়ী বলতে থাকে, 'দুর্বিষহ হাতগুলো, আমি স্বস্তি ও স্ফূর্তি চাই, আমি চাই আমার এই বাড়তি অকারণ হাতগুলো কেটে ফেলতে, তুমি ব্যবস্থা করো।'

'কিন্তু' চিকিৎসক ইতস্তত করে 'এটি বেশ বিপজ্জনক মহোদয়া, আপনার ক্ষতস্থান আর নাও শুকোতে পারে, রক্তক্ষরণে আপনার মৃত্যুও ঘটতে পারে। সমস্ত অস্ত্রপ্রচারটি অশুভ ও ক্ষতিকর। আমি আপনার জীবনের কোন নিশ্চয়তা দিতে পারি না।'

নির্বিকার রূপময়ী জানায়, 'যতো ঝুঁকিই থাক অস্ত্রোপচারটা তোমাকে করতেই হবে চিকিৎসক, এ ব্যাপারে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এমনকি জীবন হারালেও আমার কোন কিছুই আসে যায় না। তুমি ব্যবস্থা করো, গোপনে—'

চিকিৎসক ছুটোছুটি করে ব্যবস্থার প্রয়োজনে, রূপময়ী যতখানি পারে গুছিয়ে নেয় কাজ। একান্ত সহচরদের কেবল জানায় আসন্ন রক্তপাতের সংবাদ। তারা কেউ কেউ বিস্মিত হয়।

'তুমি কি তবে ভালবাসতে না তোমার পিতা ও স্বামীকে?'

'তুমি কি চাও না স্বামী ও পিতার রক্ষাবর্ম?'

'তুমি কি তবে স্বামী ও পিতা বিরোধিতায় আক্রান্ত?'

রূপময়ীর এসকল প্রশ্নকে নিতান্তই অবান্তর মনে হয়, সে এখন জানে—

ভালবাসা কোন বিড়ম্বনা নয়, ওটি নিভৃত খোলা হাওয়া অতিশয় অতল, যা স্রেফ অনুভবযোগ্য, হৃদয়ে, হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে, এবং মানুষেরে রক্ষা করে তার কর্ম, এবং বিরোধিতা ও স্বাধীনতা এক নয়।

রূপময়ী কাঠের টেবিলে অনিশ্চিত শুয়ে পড়ে। এক দিবস এক রজনী অতিক্রান্ত হয় চিকিৎসকদের অহরহ পরিশ্রমে। লক্ষ্য সুসম্পন্ন হয়, অপসারিত হয় অনভিপ্রেত দুই জোড়া হাত। কিন্তু রূপময়ীর জ্ঞান ফিরে না। অন্তরে অস্ফুট হৃদয়ধ্বনি বাজে কি বাজে না। পৃথিবীর মলিন আলোতে নিস্তেজ পড়ে থাকে রূপময়ী।

কাটে তিন দিবস তিন রজনী।

এবং রূপময়ী চেতনায় আসে বিবর্ণ ফ্যাকাশে তথাপি কেমন উৎফুল্ল দৃঢ়। শরতের রোদ ও মেঘ ছুঁয়ে দ্রুত সেরে ওঠে সে। পুনরায় বসে সভাকক্ষে, অবলম্বনহীন সোজা, আপন হাতে সারে দেশকার্য। প্রথম দিকে অনভ্যস্ততার কিছু হোঁচট সইতে হয়, খালি খালি লাগে পিতা ও স্বামীর অঙ্গের অনুপস্থিতিতে, ক্রমশ সব নজরদারী কালিঝুলি ঝেড়ে ফেলে ঋজু ও দীপ্ত হয় রূপময়ী— হেমনগরের শাসনকর্ত্রী।

৩

ওদিকে কানে কানে খবর ছড়ায়। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাষ্ট্রপতিরা, যারা একদা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল রূপময়ীর পিতা ও স্বামীর, ক্রমে ক্রমে অবগত হয় ঘটে যাওয়া ঘটনা। তারা বিস্মিত হয়, নারীটির তো বিরাট দুঃসাহস। শিগগিরই খোঁজ কর কী ঘটায় সে, কোন পথে চলে খোঁজ করো সত্বর। খোঁজ চলে, হেমনগরের ইদানীং নাকি সমস্ত পাখিরা মুক্ত, জানা যায়, বিশুদ্ধ বাতাসে ইদানীং নাকি রংবাহারী বৃক্ষেরা সতেজ থাকে, শোনা যায়, সবুজ বসন্তে নাকি প্লাবিত হেমনগরের চৌচির ভূমি আর কুয়াশা সরিয়ে সমস্ত হেমনগরে রূপময়ীর বিপুল স্নিগ্ধতার সহজ বিস্তার, দ্যুতিময় শব্দময়।

না তো, এসব তো ভালো কিছু নয়, চিন্তার ছাপ পড়ে পিতা ও স্বামীর বন্ধুদের কপালে। রুখো ওরে। তাড়াতাড়ি রুখে দাও।

তারপর একদিন শীতের এক প্রফুল্ল দুপুরে হেমনগরে দেখা দেয় সে, তির্যক তীক্ষ্ণ নিঝুম বিষণ্ণ ও ছন্নছাড়া মানুষটি, যার জিহ্বায় সর্বক্ষণ গুণকীর্তন এক ছয়হস্ত-সমৃদ্ধ দেবীর, তার জামার নিচে বুকের কাছে লুকানো দেবীর সুসজ্জিতা স্বর্ণমূর্তি

আর তার ধ্যানে ও কর্মে সর্বদা দেবীর জয়গান, জনতা টের পায় দেবীর চেহারা ঠিক যেন আমাদের রানী রূপময়ী — ।

আরো কি অবাক কাণ্ড দেখো, শুধু কথা কয়ে সেই দেবীপূজারী ভালো করে দেয় বদ্ধ উন্মাদ, যৌনরোগী, পুরনো আমাশয়, পেটের পীড়া, শুধু হাতে ছুঁয়ে নিকেশ করে দেয় বাত—বেদনা, হাঁপানি ও মৃগী রোগী।

এতো শক্তি কি করে ধরে এই মানুষ ?

কোথা থেকে পায় সে এমন ক্ষমতা ?

প্রকাশ্যে মানুষটি মুখ খোলে না, জানায় না শক্তি উৎস, 'তবু জনতা যেন টের পায় এইসব আর কিছু না, দেবীর দয়া এবং এই দেবী তো আর কেউ নন আমাদের মহামাননীয়া রূপময়ী। জনতা আরো রব তোলে, যে ভাগ্যবান স্বচক্ষে রূপময়ীর অলৌকিক দুইজোড়া হাত দর্শন করে সে পায় অশেষ পুণ্য, আর যে সৌভাগ্যবান সেই হস্তস্পর্শ লাভ করে তার ইহ ও পরকাল কণ্টকমুক্ত, ফুরফুরে—এবং রূপময়ী কিছু বুঝে উঠার আগেই জনতা জোর দাবী তোলে—'ছয় হস্তের দেবী তোমার দর্শন চাই, স্পর্শ চাই।

রূপময়ী বিরক্ত, ভীত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও বিমূঢ়। সেই-সময় দূত আসে, রূপময়ীর পিতা স্বামীর বন্ধুদের সহৃদয় পত্র হাতে। আহা, তাহারা সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করে, ভৎর্সনা করে মূর্খ জনতার, অতঃপর সাহায্যের হস্ত প্রসারণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, অনুমতি চায়, হাজার হইলেও আমরা হেমনগরের বন্ধু বটে, আজ্ঞা করেন তো রক্ষী পাঠাই, শান্ত করুক জনতা, রক্ষা করুক আপনাকে, সেবা দিক, দেশবাসীরে।

রূপময়ী অনুভব করে চতুষ্পার্শ্বে চেপে আসছে কুণ্ঠিত দেয়াল, বৃত্ত ছোট হচ্ছে, বিজ্ঞ পরিষদ সভাসদ নিস্তর পরামর্শ দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের পরিণতি নিজেই নির্ধারণ করে রূপময়ী। নিজেকে পূর্ণ বিকশিত করে সে অগণিত জনতার সম্মুখে—

প্রিয় দেশবাসী, আমি দেবী নই, মানবী মাত্র, সকলের মতোই আমার হাত দু'টি এতোদিন তোমরা জানতে ভুল রূপময়ীরে, আমি নির্ভুল এখন—

রূপময়ী নির্ভীক একে একে বলে যেতে থাকে সমুদয় বৃত্তান্ত, নিজের সিদ্ধান্ত, কাজের অসুবিধা ও হস্ত অপসারণ পর্যন্ত সব—সব—কিছু—

সমবেত জমায়েত নির্বাক যেন বোঝে না সত্যের সারল্য।

কোলাহলটা ওঠে জনতার পেছন দিক থেকে—

'তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি আমাদের পুণ্য অর্জনের বাধা, তুমি আমাদের পুণ্য দিতে চাও না, তোমাকে চাই না'।

মুহূর্তে জমায়েতে দ্বিধার বাতাস এঁকেবেঁকে বয়ে যায়। স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরগুলি একত্রিত ও শক্তিশালী হয়ে ফেটে পড়তে চায়। হিংসার ঢিল ছুঁড়ে মারে কেউ, রূপময়ীর কপাল ভাসে রক্তে, সে কপাল ছুঁয়ে রক্ত নেয় হাতে,

—আহ, এ রক্ত আমার,

এই আঘাত একান্তই আমার।

একটি ইঁদুর ও কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা

জুবাইদা গুলশান আরা

'পোলাডার কষ্ট হইতাছে।'

গলার স্বরে মায়া ঝরিয়ে বলে ওঠে জলিল মিয়া। একটু আগে তারই আনা ঝাল ঝাল গোস্ত আর নান রুটির ভারী গ্রাসটা আরাম করে খায় মিঠু। এ কথার জবাব দেয় না। রাত দশটা বাজার পরে এ কথাটা কয়েকবারই বলেছে জলিল মিয়া। অর্থাৎ, বিদায়ের ইঙ্গিত।

মিঠু কথাটা শুনেও শোনেনি। কারণ লোকটা দারুণ ধূর্ত। প্রথম যখন এই এলাকায় মিঠু মস্তানি করে, তখন একদিন লাথি মেরে ওর হোটেলের জিনিসপত্র ভেঙে দিয়েছিলো। একতো চাঁদা দেয়নি আবার আইনও দেখিয়েছিল, সেই রাগে। সেই থেকে জলিল মিয়া একেবারে মাটির মানুষ। সর্বদা আপ্যায়নে মুখর। আতিথেয়তায় ভরপুর। আজ বিকেলে, আকস্মিক-ভাবেই মিঠু এসে পড়েছে। জলিল মিয়া খবর দেয়নি। লোক মুখের ছাঁকনিতে কেমন করে যেন গলে বেরিয়ে খবরটা মিঠুর কাছে পৌঁছালো। প্রথমটা গা করেনি মিঠু। জলিল মিয়া নাকি তার বহুকালের পুরনো চুন-সুরকির ঘরটা ভেঙেছে। নতুন করে বাড়ি করবে। আর ঘর ভাঙতে গিয়ে মাটিতে কোদাল ছোঁয়াতেই বেরিয়ে এসেছে হাজার হাজার ইঁদুর। আর সেই সঙ্গে নাকি...

জলিল মিয়া দোকানে বেরিয়ে গেলে মিঠু মৃদু গলায় জানতে চেয়েছে...

চাচায় নাকি সোনার ট্যাকা পাইছে?

—স্বর্ণের ট্যাকা? আয় হয়, কি যে কন মিঠু ভাই। চায়ের পেয়ালা টুলের ওপরে রেখে কমলা রঙের ঢেউ দিয়ে চলে গেল শরবতী।

মেয়েটাও বাপের মতো। আপাত ভাবলেশহীন মুখ দেখে মনের ভিতরের কথা বোঝাবার উপায় নেই। কিন্তু শরবতী খেলা জানে। গত তিন চার বছরে শরবতী বেড়ে উঠেছে কলাগাছের মতো, দেখে লোভ হয়। কিন্তু মিঠু

সামাল দিয়ে আছে। এই এলাকার ওয়ার্ড কমিশনারের ডান হাত। মিঠু। যখন তখন যার তার অন্দরে মুখ বাড়ানো তার পক্ষে এমন কিছু ব্যাপার নয়। কোথায় কি ঘটেছে, কে কি করছে, এসব খবরই তার নখদর্পণে। তবে মিঠুর আক্কেল আছে। ফস্ করে যা-তা করে বসে না। দু'চারটা খুনের অভিযোগ অবশ্য তার বিরুদ্ধে আছে। কিন্তু প্রমাণ নেই। দু' একবার জেলে হাজতে গেলেও "মিঠু ভাইয়ের মুক্তি চাই" শ্লোগান দিয়ে পুলিশকে বিব্রত করার জন্য লোকের অভাব নেই। এ হেন মিঠু ভাই আজ বিকেলে এসে পড়লে জলিল মিয়া অথবা শরবতী, কারো বুঝতে বাকী থাকে না যে ব্যপারটা কি। জলিল মিয়া চুনের বোঁটায় কামড় দিয়ে বলে,

—পুরানো বাড়ি তো বুঝলা না? আমার দাদায় বলে কিনছিলো কোন উর্দুযালা ব্যাটার কাছের থন।' একপাশে ডাঁই করে রাখা ইট চুন সুরকির দিকে আঙুল দেখিয়ে জলিল মিয়া বলে—হায়রে হায়। ইঁদুর যে বাইরাইয়া আইলো, তা কওয়া যায় না। শতে শতে ইঁদুর। ব্যাটারা য্যান মাটির তলে কল্লোনী বানাইছে। আর এই গর্তডায় এই...এই একটা ব্যাটারে কিছুতেই মারতে পারতাছি না। বোঝলা? সামনের সরু কালো গর্তটার দিকে নির্দেশ করে সে।

—দেহি, আমি মাইরা দিতাছি আপনের ইন্দুরের বাচ্চারে। কৌতুকের সুরে বলে মিঠু। যেন এর চেয়ে মজার ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। একটা লাঠি সে চেয়ে নেয় জলিলের কাছে। তারপর কাঁঠাল কাঠের জল চৌকিটায় আরাম করে বসে। গর্তে পানি ঢেলে দিলে হয়তো ইঁদুর বেরিয়ে আসবে। কিন্তু না, মিঠু সরাসরি মোকাবিলায় বিশ্বাসী। তাছাড়া ইঁদুরটা বেশ ভাল খেলোয়াড়। মাঝে মাঝে বিরক্তবোধ করলেও বেশ একটা ভালো খেলার মতো লাগছে মিঠুর কাছে। তাছাড়া জলিল চাচা দোকানে চলে গেলেও শরবতী তার হাতের কাছে ঠিক যুগিয়ে দিচ্ছে চা, পান, সন্দেশ। অতএব অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত করে। নড়েচড়ে জুৎ করে বসলো মিঠু। ধেড়ে ইঁদুরটা দারুণ চালাক। বারবার মুখ বের করছে গর্ত থেকে। খুব সতর্ক সে। খুব চতুর। বহুবার চেষ্টা করেও লাঠি বসানো যাচ্ছে না। লাঠি হাতে বসে বসে অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে উঠেছে মিঠু। হাতে লাঠি থাকলেই যে হাতটা নিশপিশ করতে থাকে, তা সে জানে না। সে শুধু জানে লাঠিটা চালু রাখতে হবে। চড়াস করে কারো উপর ফেলে দেখতে হবে, ফলাফল

কি রকম দাঁড়ায়। সে ইঁদুরই হোক অথবা মানুষ।

মিঠুর জীবনে তেমন কোন সমস্যা নেই। শুধু এই তিল পরিমাণ একটা ব্যাপার ছাড়া এই মুহূর্তে হাতে কাজকর্মও নেই। এমনিতে মিঠুর চেহারাখানা দেখার মতো। লম্বা চওড়া। চুলটা পাট করে আঁচড়ানো সত্ত্বেও বে-আদরের মতো চোখের ওপরে এসে পড়ে বার বার। সামান্য লালচে চোখ। অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টা কোন না কোন খারাবির সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেই নাকি কে জানে, ঘোলাটে লাল রংটাই মোটামুটি স্থায়ী হয়ে গেছে। মহল্লার সবাই চেনে তাকে। এমনকি মন্ত্রীমহোদয়রা কেউ এলেও সে বুক ফুলিয়ে ঘোরাফেরা করে। কেউ যেন হাততালি দিতে ত্রুটি না রাখে, আদব-কায়দার খেলাফ যেন না হয়। এসবই দেখাশোনা করে মিঠু। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু একবার ডাক দিলেই হলো – চাচা···কারবার টারবার কেমুন চলতাছে ?

সঙ্গে সঙ্গে কাবাব পরোটা, এমনকি একবাক্স স্টারের প্যাকেট পর্যন্ত এসে পড়ে সামনে।

পিছনে যাই বলুক, সামনে সামনে তার যথেষ্ট ইজ্জত আছে। আচ্ছা তা না হয় হল।

কিন্তু ইঁদুরটা তো বড্ড জ্বালালো তাকে। ব্যাটাকে এক বাড়িতে তো খতম করা যাচ্ছে না। মহা বদমায়েশ। যেন লুকোচুরি খেলছে ব্যাটা। বিষয়টা কি ? আঁ ? শালার বিষয়টা কি। বাপের জমিদারী পেয়েছে ? গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে।

আসলে জায়গাটা ভীষণ স্যাঁৎসেতে। শ্যাওলা ধরা দেওয়াল। জলিল চাচা নামের লোকটা তার পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি ওঠাবে। লোক লাগিয়ে বাড়িটা ভাঙা হয়েছে বটে, কিন্তু তারই সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে অজস্র ইঁদুরের এক মস্ত কলোনী। ইঁদুরগুলো দেখতে গিয়ে তো সবার চোখ ছানাবড়া। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কোথায় গেছে ইঁদুরগুলো। হাজার হাজার অলি-গলি ভরা এক আণ্ডারগ্রাউণ্ড শহর যেন। দু'দিন ধরে কামলাগুলো ইঁদুর মারতে মারতে হয়রান। ওরা যেন মিছিল করতে করতে নেমেছে। নেমেছে ষড়যন্ত্রে। মানুষের হাতে গড়া এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়িগুলোর তলায় ঠিক এমনি করে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে নাকি কে জানে। আসলে, বহুদিনের পুরনো এই বাড়িটা খুঁড়তে গিয়ে জলিল মিয়াও একটা অদ্ভুত জিনিস পেয়ে গেছে। কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা। একজোড়া কানফুল। সোনালী রঙ দেখে ত্বরিত-

গতিতে জলিল মিয়া জিনিসগুলো গায়েব করে দিয়েছে। দু'একজন কামলা ছাড়া অবশ্য আর কেউ দেখেনি ব্যাপারটা। জলিল মিয়াও ঘুঘু লোক। কামলা দু'টোকে মিষ্টি খেতে দশটা করে টাকা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। মানুষকে বিশ্বাস করে না জলিল মিয়া। যদিও অনেক লোকের সঙ্গেই সে গোলমেলে ধরনের বন্ধুত্ব রেখে চলেছে আগাগোড়া। দু'টো ট্রাক আছে তার। মাল নিয়ে দূর-দূরান্তে যাতায়াত করে। একটা ছোট হোটেল আছে। সবদিক বজায় রাখতে কিছু কিছু লোকের সঙ্গে একটু জটিল বন্ধুত্ব তাকে রাখতেই হয়।

আমি কি এমুন আছিলাম? আমারে হগলে বানাইছে। মেয়ের উদ্দেশে প্রায়ই ক্ষুব্ধ গলায় অভিযোগ করে জলিল মিয়া। শরবতী জবাব দেয় না। সেই বানের বছর বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে ঢাকা শহরে এসে উঠেছিল তারা। বাবার সম্পর্কিত চাচার বাড়ি এটা। আজীবন চিরকুমার চাচা খবর দিয়ে পঠিয়েছিল। অসুখে ধরেছে। বাঁচবে না। তাই রক্তের সম্পর্ক ধরে ভাতিজাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। নইলে মারা যাবার পরে লুট হয়ে যাবে এই বাড়ি, জমি, দোকান। তা মোজাম্মেল মিয়া তো শান্তিতেই মাটি নিয়েছিল, কিন্তু শরবতী আর তার বাপ দিনে দিনে বুঝতে পেরেছিল যে গ্রামের জমির দখল আর শহরে নিজের জায়গা নেয়া দু'টোই এক ধরনেরই যুদ্ধ। উপরন্তু এখানে ইস্কুলে যাওয়ার সময় গায়ে এসে পড়ে শিসের টুকরো, অশ্লীল চাউনি। কানে আসে, হিসেব-নিকেশ হচ্ছে কার মেয়ে যাচ্ছে কোন এলাকার সম্পত্তি সে। প্রথম প্রথম শরবতী লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতো। গ্রামে যেমন পায়ে ল্যাপটানো কাদা ধুয়ে ফেলা যায়, এখানে তা যায় না। তীরবেগে হোণ্ডা চালিয়ে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যখন স্পীড কমিয়ে লোকটা বলে—যাও, যাও···কেউ তোমায় ডিসটার্ব করবে না। তখন উপযাচকের অনাহূত করুণায় গা রি রি করে ওঠে। এই গায়ে পড়া উপকার প্রত্যাখ্যান করবে সে সাহস কারো নেই। অতএব কলেরা এলার্জির মতোই এর উপস্থিতিকে মেনে নিতে হয়েছে। সমঝোতায় আসতে হয়েছে। ক্রোধকে দমন করতে হয়েছে। এখন শরবতীও তার বাবার মতোই, মিষ্টি-মধুর। বিছানায় পড়ে থাকা রুগ্ন মায়ের সেবায় সদাতৎপর। বাবা মাঝে মাঝে বিয়ের কথা বলে। শরবতী রাজী হয় না। এখন বাবাকে ফেলে সে কোথাও যাবে না। শরবতী তার বাবাকে বোঝে। এইতো আজই বিকেলে বারান্দায় বসে যখন গাড়ির হিসেব বুঝে নিচ্ছিলো, মিঠুকে আসতে দেখে খুব খুশী হয়ে উঠেছিল জলিল মিয়া। মেয়েকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দিয়েছিল,—

–শরবতী; তোমার মিঠু ভাইজানের জইন্য নাস্তা আনো।' তখনই বুজেছে শরবতী।

তা, সেই নাস্তা খাওয়ার পর থেকেই এই আধ রাত অবধি বসে আছে মিঠু। ইঁদুর কিছু মারা পড়েনি তা নয়। কিন্তু আসল যে গর্তটা, সেটা চলে গেছে অনেক দূর। আর বুড়ো ইঁদুরটাও বারবার মুখ বের করে যেন প্রলোভিত করছে মিঠুকে। রোখ চেপে যাচ্ছে তার। যেন ঐ ইঁদুরটাকে মারতে পারলেই তার করায়ত্ত হবে লুকানো ধনরত্ন। কিন্তু, সাহস দেখ, তাকে লাঠি ধরিয়ে দিয়ে জলিল মিয়া দোকানে গিয়েছিল। দিব্যি নিশ্চিন্তে। ঘরে রুগ্না স্ত্রী। একমাত্র মেয়ে শরবতী সব দেখাশোনা করে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, সাহসীও বটে। নইলে কি আর জলিল মিয়া···

–চাচা, ইঁদুরটা তো ধরতে পারতাছি না। রাত এগারটাতক্–হালকা গলায় বললো মিঠু।

–থাউক নাইলে। কাইল না হয় দেখা যাইবো। কি কও? পান চিবাতে চিবাতে কথা বলে জলিল মিয়া। বুকের ভেতরে অস্বস্তি। শয়তানটা কেন এসেছে জানে। স্প্রিংয়ের চাকু বের করে নাড়িভুঁড়ি বের করে দিতে ওর একটুও বাধবে না, তাও জানে। তাই মোলায়েম হাসিটা ধরেই রাখে জলিল মিয়া। মেয়েকে ডেকে বলে, মিঠুরে একটুক পান দে শরবতী। বাড়িতে যাইবো। রাইত হইতাছে। না, আর অপেক্ষা করা যায় না। মিঠু চট করে বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে পড়ে।

–চাচা। আপনে বলে স্বর্ণের ট্যাকা পাইছেন? কই দেখি?

–কি যে কও বাবাজী! মুখের পেশীগুলো কেঁপে ওঠে জলিল মিয়ার। হাঁটতে থাকে উঠানের কোণের দিকে। তালা দেয়া ঘরটা খুলে বারান্দায় রাখা শাবল, কোদাল, তাগাড়িগুলো তুলতে থাকে। মিঠু বলে,

চাচা, আমি তামাশা পছন্দ করি না সেইটাতো আপনে জানেন।

হঠাৎ করে দৃশ্যপট বদলে যায় যেন। জলিল মিয়ার মুখের হাসিটা যেন মলিন হয়ে আসে।

নিজের হাতটা মিঠুর শক্ত মুঠি থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে এবং অবরুদ্ধ গলায় ডাকে শরবতী···মা ··

শরবতী বেরিয়ে আসে। চুল বাঁধছিল বুঝি। কালো একটা ফিতা দাঁতের ফাঁকে ধরে চুলের গুচ্ছ পেঁচিয়ে বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে এসেই বাপের

অবস্থা দেখতে পেল সে। একটা আর্তনাদ গলার কাছে দৌড়ে এলো। কিন্তু শরবতী শব্দ করলো না। মিঠুর চোখে রক্তের ছিটে। বারান্দায় জলতে থাকা কম পাওয়ারের বাল্বটায় আরো বেশী ঘোলাটে দেখায় পুরো দৃশ্যটা। হ্যাঁ, এই কুখ্যাত গুণ্ডাটা ঐ সোনার টুকরোগুলো চায়। যেন ওটা ওরই পাওনা। যেমন অনায়াসে ও অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে, যেমন অনায়াসে অন্যের সম্ভ্রমকে তাচ্ছিল্য করে, নষ্ট করে, তেমনই অনায়াস অধিকারে ও ছিনিয়ে নেবে ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলো। চীৎকার করে সাহায্য চাইলে কেউ এগিযে আসবে না। কি করবে ভেবে কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট করে শরবতী। তারপরেই দু'পা এগিযে আসে। খোঁড়া-খুঁড়ির ফলে স্তূপ হয়ে আছে ইট আর মাটি। সেখান দিয়ে পেরিয়ে আসতে গিয়ে একটা ছোট্টো চীৎকার দেয় শরবতী,

—বাজান, সাপ। কালা কুচকুইচ্যা। উই যে…উই যে…

মুহূর্তের অন্যমনস্কতা। সেই সুযোগে বুঝি সাপটাই দুলে ওঠে চোখের সামনে, আর পেঁচিযে ধরে মিঠুর গলা। ফাঁস ফাঁস করে শব্দ ওঠে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায়। কিন্তু মিঠু বুঝতে পারে না, ঐ কোমল, আতিথেয়তায় তৎপর হাতে দুটোর সাঁডাশি চাপ সে কিছুতেই ছাডাতে পারছে না কেন। ভরপেট নানরুটি আর কাবাব খাওয়া মিঠুর শরীরটা এক সময় আর প্রতিরোধ করতে পারে না। জলিল মিযা তার শিথিল মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। হতবাক হয়ে তাকালো নিজের অন্য হাতের দিকে, যা দিয়ে সে এতক্ষণ মিঠুর মুখ চেপে ধরেছিল। বাপ আর মেয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। বিহ্বল এবং হতচকিত। তারপর বাপের কাঁধে মাথা রাখলো শরবতী। দীর্ঘদিনের অবদমিত নিরুপায ক্রোধ ও ঘৃণায় কান্নায় ফুলে ফুলে কাঁদলো শরবতী।

রোজকার মতই নৌকো বোঝাই তাজা সব্জি নিয়ে বুড়িগঙ্গা দিয়ে এপারে আসছিল মদন মাঝি। লগি দিযে দিয়ে কচুরিপানার একটা বিরাট স্তূপ সরিয়ে দিতে গিয়ে আঁতকে উঠলো মাঝিটা।

—কি দেখছস্? অ্যাঁ? জানতে চাইলে মদন মাঝি। নিরুত্তরে ভাসমান বস্তুটা দেখিয়ে দিল ছেলেটা। কোথা থেকে ভেসে এসেছে কে জানে। ফুলে উঠেছে শরীরটা। সর্বনাশ। এ যে একটা আস্ত মানবদেহ।

—তাডাতাড়ি বাইয়া চল্। ফিইরা চাওনের কাম নাই।

মাঝিটা অল্পবয়সী। কম্পিত গলায় বলে উঠলো-চাচা গো।

—কি কস্?

—মায় কইছে, সক্কালে উইঠ্যা লাশ দ্যাখলে ক্ষতি অয়! চোখ ছলছল করে ছেলেটার। মদন মাঝির মায়া লাগে। সে বলে,

—ভয় পাইস না। ওইডা কি লাশ নাকি? ওইডা তো মানুষ। আমাগো মতন মানুষ। ডরাস ক্যা।

—তয় ওইডার বুকের ওপর যে ইন্দুর দ্যাখলাম! চক্ষু দুইডা খাইয়া ফালাইছে। আঙ্গুলডি নাই···চাচা গো!

নদীর ওপরে ছড়িয়ে থাকা আবছা আলোর দিকে দৃষ্টি মেলে দেয় মদন মাঝি। হঠাৎ তার মনে এক অদ্ভুত বৈরাগ্য জেগে ওঠে। মানুষ! কিন্তু একি বীভৎস পরিণাম। কার ছেলে, কোথা থেকে ভেসে এসেছে, কে জানে। হ্যাঁ, মদন মিয়াও দেখেছে বৈকি। দু' দুটো ধেড়ে ইঁদুর লাশটার বুকের ওপর হাঁটছে।

—আল্লাহ মাফ কর। দূরে ভেসে যেতে থাকা কচুরিপানার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে মদন মিয়া। তারপর ছেলেটার দিকে চেয়ে মৃদু গলায় বলে—বুঝলি রে ফজল আলী। দুনিয়াডা এই রকমই কঠিন। কহনও আমরা ইন্দুরগুলারে মাইরা শ্যাষ করি, আবার কহনও ইরগুলা আমাগো পাইলে ছাড়ে না। বুঝলি? এইডারে কয় মানবজেবন।

নদীতে রোদের ছোঁয়া লাগে। স্রোতে ভেসে যায় মানুষের জীবনের লুব্ধতা, ঘৃণা আর অপচয়িত মূল্যবোধ। জলিল মিয়ার উঠোনের গর্তে ধেড়ে ইঁদুরটা বুঝি নিশ্চিন্তে গর্ত খোঁড়ে। সেকি নিরাপত্তা চায়, নাকি প্রতিশোধ? কে জানে!

সরোজিনীর ছবি

হোসনে আরা শাহেদ

: একটু ঘুরে বসুন –

: আরও একটু –

: উঁহু হলো না, বেশি ঘোরা হয়ে গেছে –

: ঠিক আছে, এবার হয়েছে –

: নড়বেন না। হাসুন। হাসতে হবে। নড়বেন না, রেডি –

: থ্যাঙ্ক ইউ।

ক্যামেরাম্যান গুটিয়ে ফেললেন তাঁর ক্যামেরা। যাঁর ছবি নিলেন, যাঁকে উদ্দেশ্য করে এতোক্ষণ এতোগুলো কথা বললেন, তিনি কিন্তু তখনও তেমনি বসে আছেন। সত্যি সত্যি আর নড়ছেন না। ঐ 'থ্যাঙ্ক ইউ' মানে যে ক্লিকের শেষের রেশ, তা তাঁর বোধগম্য না। তাই তিনি বসেই আছেন একইভাবে, না নড়েচড়ে, হাসি হাসি মুখ করে, হাত দু'টো কোলের ওপর আলতোভাবে ছড়িয়ে রেখে।

'ও দাই-মাসী, উঠে পড়ো এবার, তোমার ছবি তোলা হয়ে গেছে—'

একদল কিশোরী সশব্দ হাসিতে উপচে পড়ে।

'অইয়া গ্যাছে? না কইলে বুজুম ক্যামনে?' বলতে বলতে চট্ করে উঠে পড়েন তিনি। তাঁর বসা চেয়ারটাকে সরিয়ে বারান্দায় তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দেহ যতো দুর্বলই হোক, হাত যতোই কাঁপুক অমন ভারী কাঠের চেয়ারটিকে টেনে টেনে তিনি নেবেনই। যেন তিনি ছাড়া আর কেউ নেই ওটা গোছানোর।

বয়স কতো হবে তাঁর?

তা কি তিনি নিজেই জানেন? নাকি সে কথা কখনও ভেবেও দেখেছেন? কিংবা কখনও কি ভাববার কথা মনেও হয়েছে?

কোনও হিসেব চাইলেই তো দু'হাতের দশ আঙুলের দাগগুলো ধরে ধরে টানা অঙ্ক কষতে থাকেন। ঘটনার রোমন্থনেও তাই। সেই 'আকালে'র অথবা কোনও 'যুদ্ধের' কাল। 'প্লাবন', 'মহামারী', 'রায়টে'র সূত্র ধরেও হিসেব চলে তাঁর মুখে মুখে। হিসেব বলতে তিনি তাই বোঝেন। এ দিয়েই তিনি দিন গুজরান করে চলেছেন। টাকা, আনা, পাই, পয়সা, সিকি, আধুলি এসব বোঝেন বটে, কিন্তু তাও ঐ চিহ্ন ধরে ধরে। নিজেই বলেন, 'হঃ, 'ছিন্' দিযাই ঠিক ফাই। না অইলে গোলাইযা ফালাই।' ওজনের ক্ষেত্রে হাল-আমলের যে রকমফের, তা-ও তিনি থোড়াই কেযার করেন। কথা উঠলে সিধা বলে দেন, 'অত সোজা নাহি? মা'র প্যাটের থনে পইড্যা সেই সের পোযা ছটাকের কারবার করতাছি, অহনে এক কতায় তা ক্যাম্নে গিলবার পারি?' অবশ্য পাল্টা প্রশ্ন তুলতে চাইলে তিনি রণে ভঙ্গ দেবেন। কপাল কুঁচকে বললেন, 'কি জানি! অত কি আর লেহা পড়া হিক্ছি। যা বুজি, হেই লইযাই যাইবার ফারলে বাঁছি! কিন্তুক্ হেই পতও তাড়াতাড়ি পাম্ নাহি? আইজকাল খালি ভুল করি। রাম কইলে রহিম হুনি। সিদা কইলে উল্টা বুজি। বেযানবেলার কতা হাইন্ঝে গিল্যা ফেলি—চাইর আঙ্গুলের এই কপালে কী আছে—কি জানি।'

যে স্মৃতি বা বোধশক্তিকে তিনি আজকাল ঠোকেন আপন মনে, তার দোষ নেই। তাঁর বযস তিনি না জানলেও তাঁকে দেখে অনুমান করতে না পারার কারণ নেই। কুঞ্চিত চামড়া, কম্পিত অবযব, ক্ষীণদৃষ্টি—মনে করিযে দেয তাঁর বযস সত্তর ছুঁই ছুঁইও হতে পারে, আবার সত্তর পেরোতেও পারে। গোলাকার তোবড়ানো মুখ, মাড়ির সঙ্গে মিশে থাকা দাত, একটু বেঁকে আসা মেরুদণ্ড—তাঁকে জীবনের শেষ প্রান্তে টেনে আনার ইঙ্গিতই বহন করছে।

জীবনের বিরুদ্ধে তাঁর নালিশ নেই।

বলেন তিনি সুযোগ পেলেই, 'আছি সুক্কেই। আমাব ছাইতে বালা অবস্থায আছে আরও বহুতজন, হেইডা বুজি—বুজবার পারি। কিন্তুক আমার থনে দুঃকি যারা, হ্যারাই তো বেশি।' তাঁর হাতে যদি সময থাকে, তবে তিনি কথা বলেন অনর্গল। দেযাল ঘেঁযে পাযের ওপর ভর করে বসে শাদা শনের মতোন চুলগুলো পিঠময় ছড়িয়ে নিজেই বিলি কাটতে কাটতে বলে চলেন

আপন মনে, 'কতোক কতোক মাইনসে দিনরাত ভাইস্যা আইতাছে। আমি তো দুইবেলা নদী পার অই, দেহি হগ্‌গলডিরে নিজের চক্ষে। কুত্তার ছাওর লাহান মাইন্‌সেও হুইযা থাহে রাস্তায রাস্তায় কুণ্ডলি দিয়া—আহারে! আমি বালাই আছি। রাইতে মাতা কাইত করার জাযগা পাইছি—দুইবেলা গতর ঠিক রাখনের লাইগা আটা চাইল খাইবার পাইতাছি।'

কথার কথা না। এ আত্মতৃপ্তি সত্যি সত্যি তাঁর অন্তরের অভিব্যক্তি। তিনি সেই কিশোরী বযস থেকে কাজ করছেন। করছেন একটি ইস্কুলে। মেযেদের ইস্কুলে। পিছু-দিনের উল্লেখে আজও মধুর হাসি ফুটে ওঠে তাঁর শুকনো ঠোঁটে, 'রাস্তা দিযা আইতে কতো সময লাগ্‌ছে। এতো ব্যাডারা, মনে অইতো ব্যাগডিই বুজি ড্যাব ড্যাবাইয়া ছাইয়া আছে।'

: তা সত্যি সত্যি কেউ কি তাকাতো না দাই-মাসী?

: দূর, হেইযা কি আর দেক্‌ছি? মাথায ঘোমডা দিয়া ঘোডার লাহান্‌ ছুইড্যা আইছি।

: দাই-মাসী, কি রঙের শাড়ি পরতে তখন তুমি?

: কী কয? অত মনে আছে নাহি? তয ডুইরা শাড়ি পরতাম বেশি।

: সেই ডোরা কাটা কী রঙেব হতো? লাল কালো? নাকি সবুজ লাল? অথবা কমলা-সবুজ?

: ধ্যাৎ। অত জানি না। গরের মানুষটা যা আনতো, হেযাই পরতাম।

: তোমার নিজেব কোনও পছন্দ ছিল না?

: আছিল। হ্যাঁর যা বালা লাগতো, আমারও তাই লাগতো।

. মাসী, চুড়ি আনতো না? রেশমী? রূপালি? নাকে নথ পরতে না? কপালে টিপ কেমন পরতে? ছোট না বড?

: কি জানি, অত কি আর মনে আছে। কেবল মনে আছে—কোনও কোনও দিন বেইন্যাবেলা মানুষডা কইতো, আইজ কামে যাইও না, আমিও যামু না—আমি কইতাম, তয চলবো ক্যামনে? আমনে কামে গ্যালে রাইতে বাজার অইবো ক্যামনে? আমি না গেলে ব্যাতন কাটবো। মাস শ্যাষে পইসা কম আইলে গরবাডা দিমু কুইথনে?

: তারপর কী কবতে মাসী? জোর করে চলে আসতে? ইস্‌, তুমি এতো বেরসিক!

: মা, তোরা পোলাপান্‌। ক্যামনে বুজবি, গরীবের রস্‌ প্যাটে—

মনে না।

: বারে, এটা কোনও কথা হলো ? ভালোবাসার জন্য মানুষ ঘর ছাড়ে, তুমি বুঝি একদিন কাজও ছাডতে পারো নি ?

: হ'রে মানিক। তোরা তো এইডাই কবি। তরা কি জানস যে মানুষডা আমারে এমন আদর করছে, হেই গরে খাওন না থাকলে আমারে দইরা কত পিডাইছে।

আনমনা হয়ে যান তিনি। পরক্ষণেই সামলে নেন। 'মারুক, কাটুক, তবু তো আছিল। মানুষডা আছিল। দিনবর কাম কইরা রাইতে এক লগে সুক দুঃক ভাগ করার মানুষ আছিল। আইজ কতদিন অইয়া গেল—আমি একলা। আমারে কেউ থাকতেও কয় না, যাইতে দেরী অইলেও উতলা অয়না'—তাঁর দৃষ্টি যেন নিথর হয়ে পড়ে। তিনি চেয়ে থাকেন কোন দূর আকাশের দিকে। কিন্তু বেশিক্ষণ না। কর্মের তাগিদে ফের উঠে পড়েন তিনি। চেঁচিয়ে ওঠেন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে। কোনও আগন্তুককে বিনা নোটিশে ভেতরে ঢুকতে দেখলে, 'এ্যাই, এ্যাই যে, ঐ গরটায় বহেন। লোক আছে থ্যাকবেন। সিলিপ লেইখ্যা দেন। হ্যার ফরে দেহা করবার ফারবেন।'

এক মুহূর্ত তাঁর বিশ্রাম নেই। ঘুরে ঘুরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার তদারক করেন, দরকার হলে নিজেই হাত লাগিয়ে ঝাঁট দেন, ঝরা পাতা মরা পাতা জমলে মালীকে বকুনি দেন, ঘড়ি দেখে দেখে ঘণ্টা দেন। এই ব্যাপারে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। ঘড়ির ছোট বড় কাঁটার সম্পর্ক না, অবস্থান দেখেই তিনি অন্তত ক্লাস শেষ-শুরুর পালাটি বোঝেন। দেয়াল ঘড়ির ভেতরের দোদুল্যমান বস্তুটির দোলা দেখে তিনি ঘড়ির সচলতা ধরে ফেলেন। ওটা বন্ধ হয়ে গেলেই তিনি দৌড়ে ডেকে আনেন তাঁর ভাষায় 'আপিস থনে কেরাণী সাররে।' ডেকেই ক্ষান্ত হননা, তড়িঘড়ি টুল এনে দেন। তারপর সেই তরুণ ভদ্রলোকটি যখন টুলে দাঁড়িয়ে ঘডির কাঁটা ঠিক করতে থাকেন, তিনি পরম মমতায় দু'হাত দিয়ে একটু ঝুঁকে নড়বড়ে টুলটি চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। শেখাতে হয় না। কোথায় কখন কী করতে হয়, সব তাঁর জানা। 'পঞ্চাশ বচ্ছরের ছাক্‌রী, এক দিনের নাহি !' কথায় কথায় তিনি বলেন। তাঁর বলা কেউ যদি নাও শুনতে চায়, তবু তাঁর কিছুই যায় আসে না। অনেক কথা তিনি মনে মনে বলেন।

যেন নিজের সঙ্গেই নিজে বোঝাপড়া করেন। চাকরির স্থল 'এই ইস্কুলটাকে ঘিরেই অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন এমন কি এরই সুবাদে তুলনা করেন পরিবেশ পরিস্থিতিকেও। সাত সকালে যখন সব খুলে জানালা দরোজার পর্দা টেনে টেনে দেন, ভাবেন, 'ইস্কুলটা যে বচ্ছর পইলা শুরু অইলো, মাত্তুর পাইত্তা পাইত্তা কেলাস অইতো। ঐ মাত্তুরের হিসাব রাহন আর গোছগাছ কইরা থোওন আমার কাম আছিল।' পুরনো টুক্‌রো কাপড় দিয়ে যখন আসবাবপত্রগুলো মোছেন, তাঁর মন কথা কইতে থাকে, 'এই টুল বেঞ্চি আলমারি চেয়ার টেবিল তাক সবই তো আমার চক্কের সামনে আস্তে আস্তে আইলো। অহন কত মাল ঠাসাঠাসি—গরে গরে রঙ-করা লোহার আলমারি। ছাদের লগে আঙটা দিয়া বিজলি-পাঙ্খা লাগান অইছে। কত বড় মেশিন আইছে। এক গরে বইয়া কতা কইলে বেবাক মাইয়ারা যে যেখানে আছে, হোনবার পারে।'

অনেক সময় হেসে ফেলেন আপন মনেই। 'ঐ যে চাইর কোণা কালা যন্তরডা, এইডার নাম টেলিফোন। জনজন্ কইরা বাইজা ওডে। পইলা পইলা মাগো কত্তো ডর খাইছি। অহন তো ঐডা বাজলে আমারই আগে কতা কওন লাগে। সুবিদা আরও বাডছে। আগে আগে এই গরের দুয়ারডায় বইয়া থাহন লাগতো। কহন আমার ডাক আইয়ে। অহন বেল্ টিপ্ দিলে জোরে বাইজ্যা ওডে। যেখানে থাহি, আইয়া ফড়ি।'

অভিজ্ঞতাই তাঁকে জ্ঞানী করে তুলেছে। এ দিয়েই তিনি বুঝে নিচ্ছেন প্রগতির ধারাকে তাঁর মতো করে। না, লেখাপড়া তিনি শেখেন নি। মাত্র ক'বছর আগে নিরক্ষরতা নিয়ে যখন দেশময় তোলপাড় আরম্ভ হলো, শোনা গেল বেতন নিতে সই লাগবে—'টিপে' আর চলবে না, তখন তিনি সযত্নে ইস্কুলে মেয়েদের কাছে শিখে নিয়েছেন তাঁর নামের চারটি অক্ষর লেখা আকার ইকার ওকারসহ—স-রো-জি-নী। এখন তিনি আর বুড়ো আঙ্গুলে প্যাডের কালি লাগান না। লিখে দেন 'সরোজিনী'—দেখে মনে হবে যেন কাগজ নয়, পাথরের বুকে খোদাই করেছেন নিজের নামটি। কিন্তু দুষ্টু মেয়েরা যখন আরেকটি কাগজে এই নামটিই লিখে তাঁকে পড়তে দেয়, বলে, 'মাসী, কি লিখেছি, পড়ে দাও', তিনি পারেন না। আসলে তিনি নামই লিখতে

শিখেছেন, অক্ষর না।

সরোজিনী, সরোজিনী দাসী। মোটা জমিনের গাঢ় সবুজ রঙের খাটো, শাড়ি পেঁচিয়ে পরা, মাথায় সর্বক্ষণ ঘোমটা। গায়ের ব্লাউজটি সাদা। শীত পড়লে একটি খদ্দরের চাদরই ভরসা। মেয়েদের টিচারদের কাছ থেকে কতো সুন্দর সুন্দর শাড়ি পান, জামাটামাও পান—কিন্তু সবই পুত্রবধূ, কন্যা, নাতি-নাত্‌নীদের বিলিয়ে দেন। যদি রাগ করেন কেউ, নরম করে বোঝান, 'কী করুম কন্, অগো বালা কিছু দিবার তো মনে কয়।'

থাকেন তিনি নদীর ওপারে। কোন্ আঁধারে তিনি যাত্রা শুরু করেন, কেউ জানে না, তবে সবাই দেখে কাক-ডাকা ভোরে তিনি এসে ইস্কুলের গেটে ঢুকছেন, চাবি নিয়ে এসে বড আপার ঘর খুলছেন। ঋতুর বদল হয়, সূর্য ওঠা সূর্য ডোবার সময় বদলায়—সরোজিনী দাসীর সময় যেন অব্যয়, অক্ষয়। ইস্কুলের ঘড়িটিও মাঝে মাঝে ভুল সময় দেয়—সরোজিনীর সময় কখনও ভুল হয় না। সরোজিনী এখনও দ্রুত হাঁটেন। কলিং বেল বাজলেই উল্কার বেগে কাছে এসে দাঁড়ান, বেশিক্ষণ না বাজলেও খামোখাই গিয়ে একান্ত প্রশ্ন শুধোন, 'একটু চা আনি আফা?' মনের কোনও বিক্ষিপ্ত মুহূর্তে যদি তাঁকে খামাখাই অভিযোগ করা হয়, বকুনি পর্যন্ত দেয়া হয় কর্কশ ভাষায়, তিনি নত দৃষ্টিতে চুপ থাকেন, বড জোর ঠোঁট কাঁপে থরোথরো, কিন্তু অশ্রু গড়িয়ে পড়ে না কখনো। ওপর-ওয়ালাকে তিনি দেবতা জ্ঞান করেন। চাকরি তাঁর কাছে জীবনের মোক্ষ। কর্তব্য পালন তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ উপাসনা। কাজেই প্রতিবাদমুখর বা অভি-যোগকাতর হওয়া তাঁর নীতিতে মানা।

সরোজিনীর আবেগ অনুভূতির খোঁজ কেউ নেয় না। তিনশ পঁয়ষট্টি দিন-ই সরোজিনীর যেন সমান—সাঁঝের কালে যখন প্রণতি জানিয়ে বিদায় নেন, জানা কথা পরদিন ভোরেও এসে একইভাবে প্রণতি জানাবেন। তিনি নিজেই হাসিমুখে থাকেন, তাঁকে হাসাতে কেউ ব্যস্ত হয় না। তবু কচি কাকলি-ভরা কিশোরীরা তাঁকে নিয়ে মাঝে মাঝে মেতে ওঠে—যেমন বছরে একবার করে স্পোর্টস ময়দানে। তাঁকে ধরে নিয়ে দৌড়াতে বলে। হার-জিৎ যাই হোক—পুরস্কার একটি অবশ্য তাঁর ভাগ্যে জোটে। সরোজিনী দাসীর মুখে তখন শিশুর হাসি ফুটে ওঠে।

তোলপাড় হলো। এই সরোজিনীর জীবনেও একদিন মহাতোলপাড় হয়ে গেলো।

একদিন।

বেলা তিনটে বাজে তখন। নভেম্বরের অপরাহ্ণ। বাগানের ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টি রোদের মেলা। লনে ছাত্রীদের সমাহার। ঠিক শালিক পাখির কিচির মিচির ওদের কণ্ঠে—চঞ্চলতা একেবারে হলদে পাখির ছা'-এর। হঠাৎ তিন-চারজন দৌড়ে এলো,

: দাই মাসী, এসো, এসো? তোমার ছবি তোলা হবে।

: ছবি? ক্যা?

: আমাদের প্রথম পত্রিকা বের হচ্ছে। সবার ছবি যাবে।

: কি করণ লাগবো?

: কিছু না। রোদ চলে যাচ্ছে – শুধু মুখটা আঁচলে মুছে ফেলো।

: শচী, ফুলজান, ফুলবানু, সিরাজ, রাজ্জাক, অরা আইবো না?

: দাই-মাসী, তুমি কিছু বোঝো না। ওদের তো সকলের গ্রুপ ছবি হবে। তোমারটা-ই হবে আলাদা –

: ক্যা?

: ওমা, তুমি কতোদিন ধরে আছো। ইস্কুল মানেই তো তুমি। তুমি হচ্ছো আমাদের কাছে যাকে বলে কালের সাক্ষী –

কি বুঝলেন, কে জানে। তবে আর কথা বাড়ালেন না। ঘোমটা আরও টেনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালেন এসে ক্যামেরার সামনে। কিন্তু বড় বিপদে পড়লেন যখন ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাকে ঐ চেয়ারটায় বসতে হবে।' তিনি অসহায়ের মত চারদিক তাকালেন। সবাই ছবি তুলেছে এতোক্ষণ। অনেক চেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মাঠে। কিন্তু ওসব তো তাঁর মতোদের জন্য না। তিনি যেন অকূল সাগরে পড়লেন।

: কন কি? ছেয়ারে বওন লাগবো?

মেয়েদের জেদাজেদি, টিচারদের পরামর্শ, ফটোগ্রাফারের অনুরোধ, এতো কিছু এড়ানো সম্ভব হলো না। তিনি বসলেন চেয়ারে। কিন্তু সামনের দিকে ঝুঁকে, বেশির ভাগ ভর পায়ের ওপর রেখে – দেহভারটাকে আলতো করে যেন স্থাপন করলেন চেয়ার নামক হাত-অলা বস্তুটির ওপরে। তাঁর এই আড়ষ্ট ভঙ্গিটি কিছুতেই কাটানো গেল না – সব নির্দেশই পালন করলেন তিনি, কিন্তু সে যেন দারুণ কষ্টে। বুঝতে কষ্ট হলো না। চেয়ারে বসে তিনি যেন মহা অন্যায় করেছেন। কিন্তু ও কথা তিনি সকলকে কী করে বোঝাবেন? পিঁড়িতে

তিনি বসেছেন, জলচৌকিতে তিনি বসেছেন, টুলে বসেছেন, বেঞ্চিতে বসেছেন —তা'হলে চেয়ার কী ক্ষতি করেছে? হ্যাঁ, তিনি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন রাখেন। খানিক পরে জবাবও পান নিজেই। চেয়ার। একটি বিশেষ আকৃতির। একটি বিশেষ মর্যাদার আসনের প্রতীক। ওই প্রতীকের জন্যই মরাকাঠ জীবন্ত হয়ে যায়, হয়ে গিযে জীবনের দাম বাডায। সেই জীবন—যে জীবনে সরোজিনীর, সরোজিনীদের ঠাঁই নেই।

ছবির পাঠ শেষ হযে গেছে কবে। মেয়েদের সেই পত্রিকাও নাকি ছাপাখানায ছাপা হচ্ছে। এসব খবরের আর দরকার পড়বে না সরোজিনীর। আগের মতোই তিনি আসা যাওয়া করেন। আগের মতোই তিনি সকলের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি জানেন না, পত্রিকা এলেও তিনি তার কপি পাবেন না। পাবেন না, মানে তাঁকে দেযাব কথা কারও মনেই হবে না। অবশ্যই তাঁকে দিযে ঐ পত্রিকা ছাত্রীদের মধ্যে বিলি করা হবে—পাঠানো হবে কাছে পিঠের প্রতিষ্ঠানগুলোতে। তিনি জানবেনও না ঐ পত্রিকায তাঁর ছবিটি একটি পাতাজুড়ে কী পরিমাণ অর্ধ-শতাব্দীকালের সাক্ষী হযে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে তিনি যেন সচেতন মানুষ নন, দাবী পূরণ কবছেন অচেতন এন্টিক্‌সের।

তা এন্টিক্‌সেরও মাঝে মাঝে প্রাণস্পন্দন ওঠে। অন্ততঃ সরোজিনীব মতোন এন্টিক্‌সের। তাই দেখা যায হাজারো কাজের ফাঁকেও আজকাল তাঁর মনে বিশেষ স্মৃতি ভিড করছে। কোন্ এক শীতেব অপরাহ্ণে এক তরুণ ফটোগ্রাফার তাঁকে এনে বসিযেছিল চেয়ারে, সম্বোধন করেছিল 'আপনি' বলে, বৃদ্ধা সরোজিনীর তা-ই যেন খামোখাই মনে পড়ে। সেই অতি প্রত্যূষকালের আলো-আঁধারির ক্ষণে যখন তিনি বুড়িগঙ্গায খেযা পারাপার হন, যখন রাতেব কালে পা টিপে টিপে ঘরের দোরে পৌছান, আচমকা মনে পড়ে সোনালি সরু ফ্রেমের চশমা পরা ফর্সা কোঁকডা চুলের একটি হাস্যোজ্জ্বল চেহারাকে। যে চেহারাটি হয়তো পঁচিশ বছর আগেও হামা দিযে ঘুরে বেডিযেছে। কী নাম তাব? না, তিনি জানেন না। সর্বনাশ, তেমন জিজ্ঞাসাও তাঁকে মানায় না। তাঁর কৌতূহল উল্টে সকলের কৌতূহল বাডাবে। তাঁর নিরুত্তাপ ভাব ও নির্বিকার চেহারাই সকলে মেনে নেয়, তাঁর আগ্রহকে না। তাই তিনি জানতে চাননি—বলতে পারেননি ছেলেটিকে কাছে ডেকে, 'বাছা, কি নাম তোমার মা রেখেছে?' নাম যাই হোক—কেন ছেলেটি তাঁকে অমন সমীহ করলো? অত শ্রদ্ধা দেখালো? কেন তিনি চেয়ার টানতে গেলে বাধা দিল? বললো 'আপনি

রাখুন তো, অন্য কেউ এসে নেবে।'

তবে কি তাঁর কপালের রেখা দেখে ছেলেটি তাঁকে সম্মান দেখিয়েছে? কিন্তু সে কি দেখেনি তাঁর পায়ে কাদার ছোপ, হাতে ময়লার দাগ, নখগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া—যার কাছে বয়স তুচ্ছ হয়ে পড়ে? 'আহা বড় বোকা ছেলে। যার ছেলেই হোক, বেঁচে থাক্। বেঁচে থাক্। মায়ের বুক জুড়ে থাক্'—সরোজিনী আশীর্বাদ করেন তাকে মনে মনে।

কিন্তু কা হবে তাঁর? কে নেবে তাঁর শত অন্যায়ের ভার?

ঐ যে একদিনের জন্য হলেও তিনি বসেছিলেন চেয়ারে? যে চেয়ারকেই তাঁর সমীহ করার কথা—তাঁর জীবিকা যে উচ্চাসনের কৃপার দৌলতে? সরোজিনীর বুক সর্বক্ষণ দুরুদুরু কাঁপে।

একদিন মরিয়া হয়ে ছুটে এলেন বড় আপার ঘরের সামনের সিঁড়িতে, যখন দেখলেন সেই কাঁধে ব্যাগঝোলানো ছবি তোলা ছেলেটি ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে যাচ্ছে। তাঁকে দেখে ছেলেটি হাসি মুখে থমকে দাঁড়ালো, জানতে চাইলো—

: কেমন আছেন?

: বালাই। আফনে?

: ভালো। ছবি দেখেছেন? চমৎকার এসেছে। খামোখাই আপনি ঘাবড়ে গেছলেন।

: ঐ ছেয়ার? ছেয়ারের ছবিছাও উঠছে?

: না, এসেছে কেবল আপনার মুখটা। ইচ্ছে করেই আপনার চেহারাটিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ছবিতে। দেখবেন। কেমন? চলি। দেখা হবে।

: আইয়েন বাবা, শত বছর বাইচ্চা থাকেন।

সরোজিনী অস্ফুটে বলেন।

উঃ। কী করবেন তিনি? কোথায় রাখবেন এতো আনন্দ? এ আনন্দ তাঁর অনাস্বাদিত মুক্তির। তাঁর ছবিতে তিনিই আছেন—সেই চেয়ারটা না। রক্ষা রক্ষা। সরোজিনী দুটি হাত শূন্যে তুলে কপালে ঠেকান, বলেন বিড় বিড় করে যেন কোন মহাশক্তির উদ্দেশ্যে, 'তুমিই বাঁছাইলা আমারে ঠাকুর, আমার ছেহারার লগে ছেয়ারের ছবি ওডাও নাই। উডাইলে এ পাপ আমি ঢাকতাম ক্যামনে?'